আরব জাতির ইতিহাস

মূল : ফিলিপ কে. হিট্টি
অনুবাদ : প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

আরব জাতির ইতিহাস

আরব জাতির ইতিহাস

মূল : ফিলিপ কে. হিট্টি

অনুবাদ :
প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুন-২০১৭

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১০

প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, মোবা. ০১৭১১০৫৭৮৭২, ০১৯৬৩-৩৩১৩৪৯

অক্ষর বিন্যাস
আর. ডি. কম্পিউটার
১৬৪ আর., এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি. কে. দাস রোড, ঢাকা-১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
২০০ টাকা US $ 7.00

Arab Jatir Etihash Writing By Philip K. Hitti
Translate By Principal Ebrahim Khan
Published by Mohamad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/2-Ka, Banglabazar
Dhaka-1100. Mobile : 01711057872
ISBN : 984-8747-63-x

ভূমিকা

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, প্রাচ্য ভাষা ও ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত স্যার ফিলিপ কে হিট্টি (১৮৮৬–১৯৭৮)-র মশহুর গ্রন্থ History of the Arabs। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে হিট্টির এই বৃহৎ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত (Abridged) সংস্করণ 'দ্য আরবস : এ শর্ট হিস্ট্রি' শিরোনামে প্রকাশিত হয় নিউ ইয়র্ক থেকে। প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮) সেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির বাংলা অনুবাদ করেন 'আরব জাতির ইতিকথা' শিরোনামে। ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্সের সহযোগিতায় ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত এবং মৎসম্পাদিত 'ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে অনুবাদগ্রন্থটি সংস্থিত হয়। প্রকাশনা সংস্থা 'জ্ঞান বিতরণী' আরব জাতির ইতিকথা'কে 'আরব জাতির ইতিহাস' শিরোনামে পুণঃমূদ্রণের উদ্যোগ নেয়ায় এবং তার ভূমিকা লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ রাখায় বিশেষ সাধুবাদ আর ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থের মূল লেখক এবং অনুবাদককেও এ সুবাদে সর্বাগ্রে স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধায় , মাগফিরাত কামনা করি তাঁদের বিদেহী আত্মার। তাঁদের পরিশ্রম আর আন্তরিকতার একান্ত ফসল ভাবীকালের পাঠকেরা যুগ যুগান্তরে উপভোগ করে চলেছেন ও চলবেনও। অগণিত পাঠকের করকমলে এই অমর সৃষ্টি পৌঁছানোর যে কোন উদ্যোগ একই সাথে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকল।

স্যার ফিলিপ খূরী হিট্টি (**Sir Philip Khuri Hitti**) অটোমান সিরিয়া (বর্তমান লেবানন)-র শিমলানে ম্যারোনাইট খ্রীস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৬ সালে। তিনি লেবাননের সাক আল গারব এলাকার আমেরিকান প্রেবিটারিয়ান মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং ১৯০৮ সালে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুতেই কিছুদিন অধ্যাপনার পর তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান , সেখানে সিমেটিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভসহ ১৯১৫ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে হিট্টি আবার বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় কাটান। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে প্রিন্সটন

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ চেয়ার দেয়া হয় এবং ১৯৫৪ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি হার্ভার্ড-এ অতি সম্মানজনক পদে এবং ইউটা ও ওয়াশিংটন ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামার স্কুলে অধ্যাপনা করেন। এ সময় ইউনিভার্সিটি অব মিনোসোটাতে গবেষণা পর্ষদেও সংযুক্ত হন। সমগ্র মার্কিন মুলুকে হিট্টি একক হাতে আরবী ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার প্রবর্তন ঘটান। ('Philip Hitti almost single handedly created the discipline of Arabic Studies in the United States.' Wikipedia) ১৯৪৫ সালে সান ফ্রানসিসকোতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতিসংঘের জন্ম হয় সেই সম্মেলনে হিট্টি আরব প্রতিনিধিদলের উপদেষ্টা ছিলেন। ম্যাগনাম অপাস 'হিস্ট্রি অব দ্য আরবস' ছাড়াও তাঁর অন্যান্য প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে– The Syrians in America (1924) ; The Origins of the Druze People and Religion : with extracts from their sacred writings (1928) ; An Arab-Syrian Gentlemen in the Period of the Crusades : Memoirs of Usamah ibn-Munqidh (1929); History of Syria : Including Lebanon and Palestine (1957); The Arabs (1960); Lebanon in History (1967) ; Makers of Arab History (1968) ; The Near East in History (1961); Islam and the West (1962); Islam : A Way of Life (1970); Capital Cities of Arab Islam (1973).

মূল 'হিস্ট্রি অব দ্য আরবস' রচনায় হিট্টি দশ দশটি বছর সময় নেন। ১৯৩৭ সালে প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান কর্তৃক লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক থেকে এটি একযোগে প্রথম প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে যায়। বলাবাহুল্য, হিট্টির এই আকর গ্রন্থটির মাধ্যমে আরব জাতি, তাদের জীবন সাধনা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহির্বিশ্বের অবগতির অবয়ব বৃদ্ধি পায়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে বইটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হলে বহু ইউরোপীয় ও এশীয় ভাষায় এর অনুবাদে ধুম পড়ে যায়। ইবরাহীম খাঁ-র বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রাক্কালে ১ এপ্রিল ১৯৫৭ তারিখে হিট্টি নিজে 'গভীর আনন্দ প্রকাশ করে' লিখেন যে, 'এ বইয়ের একটা বাংলা সংস্করণও এখন আত্মপ্রকাশ করছে। বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপুঞ্জের ইন্দো আর্য উপ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত দূর প্রাচ্যের ভাষা সমষ্টির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভাষা। ধর্মীয় ও সাহিত্যিক চিন্তাধারার বাহন হিসেবে এ ভাষার সুদীর্ঘ ও মহত্তম ঐতিহ্য রয়েছে।'

আরব জাতির ইতিহাস-এর প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে আরব উপদ্বীপের কোলে লালিত ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, কালদীয়, আর্মেনীয় এবং ফিনিশীয় জাতিনিচয়ের ইতিহাস ঐতিহ্য কালের করাল গ্রাসে বিলিন হওয়ার বয়ান দিয়ে। 'এরা সবাই এক কালে ছিল আজ আর নাই। আরবেরা ছিল আজো তারা আছে।' আরব জাতি, মুসলিম ও সিমাইট – জাতি সম্প্রদায় আর তাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে। আদিম আরব বেদুইনদের জাত্যাভিমান, তাদের অন্তর্লীন ভাবনা ও জীব বৈশিষ্ট্যকে কাব্যিক ভাবধারায় তুলে আনা হয়েছে। রাসূল (দঃ)-এর অধ্যায়টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিচার বিশ্লেষণে নির্মোহ দৃষ্টিতে রাহমাতুল্লিল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব জাতির ত্রাতা হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা উঠে এসেছে। কিতাব ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানে হিট্টি সংশ্লিষ্ট গোত্র বা সম্প্রদায়ের জীবনাচার ও সংস্কৃতির সাযুজ্য সাধনে আসমানী কিতাবসমূহের অবিসংবাদিত ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। অভিযান পথে ইসলাম শীর্ষক অধ্যায়ে হিট্টি তুলে ধরেছেন কিভাবে অসি নয় মশির জোরে, সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সূত্রে ইসলাম সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছিল। মুসলিম শাসনে খেলাফতের বৈশিষ্ট্য এবং ক্রমাবনতি ও পুনরুত্থানের পথ পরিক্রমা নির্দেশ করা হয়েছে খেলাফত অধ্যায়ে। মুসলমানদের স্পেন বিজয়কে ইসলামের ইতিহাসের অতি গৌরবময় অধ্যায় বলে সনাক্ত করেছেন হিট্টি। কেননা স্পেন বিজয়ের মাধ্যমেই ইউরোপে ইসলামের ঝাণ্ডা ওড়ে, ইসলামের সুশীতল ছায়ায় ইউরোপের অবগাহনের অভিষেক ঘটে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সামাজিক ও তামদ্দুনিক জীবনের আরম্ভ, গৌরব যুগে বাগদাদ, জাতির জীবন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, চারু শিল্প প্রভৃতিতে ইসলামের অবদানকে হাই লাইট করা হয়েছে। জগতমনি কর্ডোভাকে বিশ্ব সভ্যতা বিকাশে ইসলামের অনন্য অবদানের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে হিট্টি পাশ্চাত্য জগতে আরবের অবদানের সালতামামী কষেছেন। এর পরে ক্রুসেড সংক্রান্ত পর পর দুটি লেখায় বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছেন কিভাবে ইসলামের গৌরব প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আর অনৈক্যের অতলে তলিয়ে গিয়েছে। শেষ শাসক বংশ আর বর্তমানের আধুনিক আরব বিশ্ব শীর্ষক দুটি অধ্যায়ে ক্ষয়িষ্ণু শাসন আমল আর মুসলিম বিশ্বের হাল হকিকত তুলে ধরে হিট্টি এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার আর নিস্বার্থবোধ ও অয়োময় প্রত্যয়দীপ্ত ঐক্য চেতনা আরব তথা মুসলিম দেশ ও জাতির সার্বিক ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম উপায়।

হিট্টির ইতিহাস অনেকটা কাব্যিক ও প্রত্নতাত্তিক ভাষায় লিখিত। ইবরাহীম খাঁ অনুবাদে সে মেজাজ অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার এ দেশীয় স্বল্প শিক্ষিত মুসলমান পাঠকের বোধগম্যকরণের দিকেও ছিল তাঁর সচেতন দৃষ্টি । ফলে এটি একটি অনবদ্য অনুবাদে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশের পর সমকালীন পত্র পত্রিকায় এই অনুবাদ কর্মটির বিশেষ প্রশংসাসূচক মূল্যায়ন প্রকাশিত হয় এবং এর বিভিন্ন অধ্যায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়। উচ্চতর পর্যায়ে এটি সহায়ক পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয় । যেহেতু এটি মূল History of the Arabs-এর অনুবাদ ছিল না, এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সরল অথচ ভাবানুবাদ প্রকৃতির সেহেতু ইবরাহীম খাঁ 'আরব জাতির ইতিকথা' শিরোনাম ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন প্রতীয়মান হয়। তখনকার সময় সাধারণ পাঠক সমাজে ইতিহাসের চেয়ে ইতিকথার সমাদর ছিল যেন বেশী। ইতিহাস পাঠ ও পঠন সে যুগে তখনো ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি যতটা হয়েছে ইদানিংকালে। সেকালে পাঠক ইতিকথাকে কৌতূহল উদ্দীপক বিষয় মানত, ইতিহাসের ভারিক্কির মধ্যে মাথা ঢোকানোটা সহজ ও জনপ্রিয় কাজ মনে করত না। পুনর্মুদ্রণ কালে প্রকাশক মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম তাঁর 'জ্ঞান বিতরণী' মিশনের অংশ হিসেবে, যুগের রুচি ও বোধ-বুদ্ধির বিকাশ বিবেচনায় এনে 'ইতিকথা'য় ইতি টেনে 'ইতিহাস'করণের যে আইডিয়া মাথায় এনেছেন তা আমার কাছে অসঙ্গত মনে হয়নি। তবে অনুবাদকের অনুমতি নিতে পারলে বেহেতর হত। ইবরাহীম খাঁ ছিলেন দরাজদিল ব্যক্তি, ষাড়ে ষোলআনা শিক্ষাবিদ, রসে টইটম্বুর লেখক এবং অনুপম অনুবাদক। আমার বিশ্বাস তিনি দ্বিমত করতেন না; কিন্তু সেই ইবরাহীম খাঁ সাহেবকে পাই কোথায়? তিনি তো আমাদের সকল ধরা ছোঁয়ার উর্দ্ধে। মূল লেখক স্যার ফিলিপ কে হিট্টি আর অনুবাদক ইব্রাহিম খাঁ তাঁরা উভয়ে ১৯৭৮ সালে পরপারে পাড়ি জমান। আমরা তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

বাংলো ৪৩,
মিন্টু রোড, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

২৫ জুন, ২০০৯

বাংলা সংস্করণ সম্পর্কে

এ বইয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আরবী ভাষা-ভাষী মানুষদের কাহিনী ও তাদের মহান সংস্কৃতির গৌরবময় অবদানের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আরবদের বিচিত্র জীবনালেখ্য ও তাদের বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আজ আমাদের সামনে ইতিহাসের একটি মহিমোজ্জ্বল ও দিক-নির্দেশক যুগ-পরিক্রমার তোরণ-দ্বার খুলে দিয়েছে। লেখকের 'হিট্টি অব্ দি এ্যারাব্স' নামক বৃহদায়তনের বই হতে এ বইয়ের তথ্যাবলী সংযোজিত হয়েছে। প্রথমে গ্রন্থ-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক হ'তে মূল বইটি প্রকাশ করেন। সংক্ষিপ্ত আকারের বইটি ('দি এ্যারাব্স ঃ এ শর্ট হিস্ট্রি') প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হওয়ার পর বহু সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর বহু ইউরোপীয় ও এশীয় ভাষায় এর অনেকগুলো অনূদিত সংস্করণ বেরিয়েছে। এ ভাষাগুলোর মধ্যে ফরাসী, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আরবী, উর্দু ও ইন্দোনেশীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য।

গভীর আনন্দের কথা যে, এ বইয়ের একটা বাংলা সংস্করণও এখন আত্মপ্রকাশ করছে। বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপুঞ্জের ইন্দো-আর্য উপ-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত দূর প্রাচ্যের ভাষা সমষ্টির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভাষা। ধর্মীয় ও সাহিত্যিক চিন্তাধারার বাহন হিসেবে এ ভাষার সুদীর্ঘ ও মহত্তম ঐতিহ্য রয়েছে।

১লা এপ্রিল
১৯৫৭ ॥

ফিলিপ কে. হিট্টি

গ্রন্থকার-পরিচিতি

ইতিহাস-বেত্তা হিসেবে ডক্টর ফিলিপ কে. হিট্টি আজ বিশ্ব-বিশ্রুত। আরব জাতির ইতিহাস সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা এবং বিশ্ব-সভ্যতায় আরবদের যুগান্তকারী অবদান আর তাদের উত্থান-পতনের বৈচিত্র্যময় জীবনালেখ্যের ওপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোকপাত করে এই শক্তিমান জাতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর কাছে তিনি নব পরিচয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন। শুধু তাই নয়, আরব জাতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং সুদূর অতীতের বেলাভূমিতে তাদের পূর্বপুরুষদের বলিষ্ঠ পদ-চিহ্ন খুঁজতে যেয়ে ইতিহাসের যে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় হিট্টি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন আজ ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে তা একটি নব জাগ্রত চেতনার সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে হিট্টি অবসরগ্রহণ করেন। গত তিন দশক থেকে আরবী এবং ইসলামী ভাষা ও সভ্যতার গবেষণায় তিনি আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম মনীষীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁর মহত্তর প্রচেষ্টার ফলেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় আজ আরবী পাণ্ডুলিপির একটি অমূল্য সংগ্রহ-ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ দিক থেকে প্রিন্সটন সমগ্র আমেরিকায় শ্রেষ্ঠতম গৌরবের অধিকারী। ১৯৫২ সালে তাঁরই উদ্যোগে প্রিন্সটন ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বৃহৎ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। ডক্টর হিট্টির ব্যাপক প্রভাব এবং পথ-নির্দেশের ফলে আমেরিকার বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে (কমপক্ষে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি) আরবী ভাষা, নিকট প্রাচ্য ও আরব ভূমির ইতিবৃত্ত, ইসলামী ইতিহাস, দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতা সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়েছে।

১৮৮৬ সালের ২৪ জুন লেবাননে হিট্টির জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৩ সলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং ১৯২০ সালে

নিয়মিতভাবে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৯ হতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে কাজ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিটিক সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হন।

বর্তমানে তিনি ইরানী শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত আমেরিকান ইন্সটিটিউটের জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য, সমাজ-বিজ্ঞান বিশ্বকোষের সম্পাদনা বিভাগের উপদেষ্টা, 'বাইজেনটিয়ন'-এর সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য। লেবানন সরকার তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৬ সালে "লা মেডেইলে দ্য' অনার দু' মেরিটে লিবানাইজ ইন ভারমেইল, অফিসার দ্য ওয়ান; অর্ডার দু সেডরে" নামক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ মর্যাদার পদক দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯৪০ সালে আমেরিকান বিশ্ব প্রদর্শনীতে আমেরিকায় নাগরিকত্ব প্রাপ্ত প্রখ্যাত মনীষীদের নামের সাথে তাঁর নাম প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়। শিলা-গাত্রে কীর্তিমান এই মনীষীদের প্রতিভার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর অঙ্কিত করে লেখা হয় 'যাঁরা আমাদের জাগ্রত ও ক্রমপ্রসারণশীল গণতন্ত্রকে অক্ষয় অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন।'

ডক্টর হিট্টির 'আরব জাতির ইতিকথা' বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহের অন্যতম। লন্ডন ও নিউইয়র্ক হতে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বহু প্রভাবশালী ভাষায় অনুবাদ সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু মূল ইংরাজী সংস্করণেরই লক্ষাধিক কপি বিক্রয় হয়েছে।

বর্তমানে ডক্টর হিট্টি তাঁর পত্নী ও কন্যাসহ প্রিন্সটনে বাস করছেন।

অগ্র-লেখা

মুসলমানদের গৌরবের স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত একশো' বছরকে বলা হয়, তরজমার যুগ। এ সময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব জাগ্রত মুসলিম মনীষীগণ গ্রীক, ল্যাটিন, পাক-ভারতীয় প্রভৃতি ভাষার বহু মূল্যবান জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থের তরজমা করেন। তাঁদের এই মহত্তর প্রচেষ্টার ফলে আরবী সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্রতর সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই অগ্রগতির ক্ষেত্রে জ্ঞানসাধক খলিফাগণ ও তাঁদের ওমরাহ্‌দের অবদানও অনেকখানি। এঁদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে মুসলিম মনীষীদের সাধনার পথ সুগম হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সাথে মুসলমানদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। সে সময় এঁদের প্রচেষ্টায় উন্নত ধরনের যে সব বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, যে সব মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়—আর যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তা' চিরকালই মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করবে এবং মানব জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি হয়ে বেঁচে থাকবে।

মুসলমানদের অভ্যুত্থান ও অভূতপূর্ব অগ্রগমন পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিপ্লব—একটা বিস্ময়। কেবল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামরিক শৌর্য ও নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেই নয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তাদের দান অতুলনীয়। আমাদের এই গরীয়ান পূর্বপুরুষদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আর এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এ সম্পর্কীয় অধিকাংশ বই-ই আরবী-ফারসী ভাষায় লিখিত। এ বিষয়ে আমাদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা অতিনগণ্য। আজ আমাদের জাতীয় ক্রম-বিকাশের তাগিদে এ সম্পর্কে অধিক সংখ্যক নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ বইয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গৌরবদীপ্ত আমাদের জাতির এই ইতিহাসের সাথে নিবিড় সংযোগ ও পরিচয় ঘটলে নিশ্চিতভাবে আমরা নব প্রেরণা লাভ করবো এবং এর ফলে আমাদের অগ্রগতিও অনেকখানি ত্বরান্বিত হবে।

এ দিক দিয়ে ঢাকার ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশান্সের উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় খ্যাতনামা ইতিহাস-বেত্তা ফিলিপ কে. হিট্টির প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'দি হিস্ট্রি অব এ্যারাবস'-এর বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। আরব জাতির আবদান সম্পর্কে গবেষণামূলক তথ্য-চিত্র এবং তাদের জীবনালেখ্য হিসেবে বইখানি বিশ্বের সুধী সমাজের বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কৃতীয় সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ জনাব ইব্রাহীম খাঁ বইখানি তরজমা করেছেন। এ দিক দিয়ে ফ্রাঙ্কলিন উপযুক্ত লোকই বেছে নিয়েছেন—বলা চলে।

এ পর্যন্ত লিখিত অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় কমই পাওয়া গেছে। এর মূলে হয়তো রয়েছে, ইতিহাসের পটভূমি সম্পর্কে যথার্থ তথ্যানুসন্ধানে ব্যর্থতা অথবা ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি সম্পর্কে ইতিহাসকারের অনুদার মনোভাব বা এক দেশদর্শিতা। মুসলমানদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণ মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে, তাদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। এ দিক দিয়ে হিট্টির ইতিহাসকে অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ মনে করা হয়। তা' সত্ত্বেও তাঁর ইতিহাসের সব কিছুই যে নির্ভুল ও নিখুঁত, এ কথা জোরের সাথে বলা চলে না। এ বিষয়ের প্রতি আমাদের ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আলোচ্য গ্রন্থের তথ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করানো হলে, আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে কর্তৃপক্ষ তা' সংযোজন করার ব্যবস্থা করবেন।

'*আরব জাতির ইতিকথা*' প্রকাশিত হওয়ার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর হয়েছে। আশাকরি, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন পূর্ব-পাকিস্তানের পাঠক সমাজে বইখানি ব্যাপক সমাদর লাভ করবে।

মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঃ (মওলানা) মুস্তাফিজুর রহ্‌মান

ঢাকা ঃ ১৫ই ডিসেম্বর,

১৯৫৮।

সূচিপত্র

আরব-জাতি, মুসলিম ও সিমাইট

হযরত মুহম্মদের (সঃ) ইন্তিকালের একশ' বছর পর তাঁর অনুগামীরা এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। রোম যখন তার উন্নতির শীর্ষদেশে অবস্থিত, তার তখনকার সাম্রাজ্যের চেয়েও এ আরব সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তর। বিস্কে উপসাগর হতে সিন্দু-নদ এবং চীনের সীমান্ত ও আরব সাগর হতে নীলনদের নিম্নভাগের জলপ্রপাত পর্যন্ত ছিল এ বিরাট সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার হাজার হাজার মিনার হতে আরবের পয়গম্বরের নাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রোজ পাঁচবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এই অপূর্ব বিস্তারের যুগে মুসলিম-আরব তার ধর্মে, তার ভাষায়, এমনকি তার শেকেল-সুরতে এত অধিক পরিমাণে বাইরের জাতিকে আত্মস্থ্ করেছিল, যার নজীর আগের ইতিহাসেও নাই, পরের ইতিহাসেও নাই। গ্রীক, রোমক, অ্যাংলো-স্যাকসন অথবা রাশিয়ানরাও এ প্রভাবের বাইরে রয় নাই।

ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, কালদীয়, আর্মেনীয় এবং ফিনিশীয় জাতি—এদের সবারই পূর্বপুরুষের এই আরব উপ-দ্বীপের কোলে লালিত হয়েছিল। এরা সবাই এককালে ছিল, আজ আর নাই। আরবেরা ছিল, আজো তারা আছে। তারা বিশ্ব-বাণিজ্যের একটি বিরাট চলাচল পথের মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে তখনো ছিল, এখনো আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতে ক্রমবর্ধমানভাবে এ জাতি তাদের অতিত উত্তরাধিকার এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত আরব জাহানের সমস্ত পূর্ব-ভাগ তুর্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ শক্তির আওতায় অছি রাজ্য হিসেবে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করার পর ইরাক আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার রাজা একজন আরব, তার রাজধানী বাগদাদ—এককালে আরব্য-উপন্যাস খ্যাত হারুনর রশীদের শাসনাবাস। ফিনিশীয় যুগ হতে লেবানন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য অভিমুখী; আজ খৃষ্টানরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। লেবানন ফরাসীদের অছি-রাজ্য থাকাকালেই নিজেকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করেছে। এর রাজধানী বৈরুত এখন এশিয়ার সব চেয়ে আধুনিক ও সব চেয়ে কর্মব্যস্ত নগরসমূহের অন্যতম। লেবাননের প্রতিবেশী সিরিয়া। সিরিয়াও ফরাসীদের মুরুব্বিয়ানা হতে অব্যাহতি

পেয়ে এক আযাদ রিপাবলিক। উমাইয়া খলীফাদের সেকালের গৌরবময়ী রাজধানী দামেস্ক বর্তমান রিপাবলিকেরও রাজধানী। কিছুকাল বৃটিশ অছি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার পর জর্দান এখন মহানবীর জনৈক বংশধরের অধীনে হাশেমী রাজ্যরূপে গড়ে উঠেছে। আধুনিক আরবের লৌহ-মানব ইবনে সউদ মধ্য, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব আরব নিয়ে একটা মস্ত সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তুলেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর আরবে আর অমন রাজ্যের উদ্ভব হয় নাই। বহুকাল পর্যন্ত বৃটিশ অধিকার ও প্রভাবে থাকার পর মিসর ষোলআনা আযাদী অর্জন করেছে, তার দেড় শতাব্দীকাল স্থায়ী রাজবংশের শাসন কর্তৃত্ব বর্জন করেছে এবং তার আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য বৈপ্লবিক পরিকল্পনাা গ্রহণ করেছে। মিসরের প্রতিবেশী সুদান, লিবীয়া, তিউনিসিয়া এবং মরক্কোও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। পশ্চিমে আলজেরীয়া আরব জাতীয়তার অপূর্ব স্পন্দনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

হুমা আরবের নব-জীবনের পাখী। সেই হুমা আবার জেগে উঠছে। তার পাখা শক্তিমান। হযরত মুহম্মদের (সঃ) প্রবর্তিত ইসলামের ছায়াতলে আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বজাতির অন্তর্গত কমপক্ষে ত্রিশ কোটি মানুষ আশ্রয় লাভ করে আছে। তারা মুসলিম। মুহম্মদী নামে পরিচিত হওয়ার চেয়ে এই নামে পরিচিত হতে তারা ভালবাসে। আমাদের বর্তমান জগতের প্রত্যেক সপ্তম মানুষ মহানবীর অনুগামী এবং মুসলমানের আযান প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পৃথিবীর সর্বত্র শোনা যায়।

আরব জাতি কেবল একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে নাই, তারা একটা তমদ্দুনও গড়ে তুলেছিল। যে প্রাচীন সভ্যতা তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতীসের তীর ভূমিতে, নীল-নদের উপত্যকায় এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে বিকাশ লাভ করেছিল, আরবেরা উত্তরাধিকারসূত্রে তা পেয়েছিল; উপরন্তু তারা গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্টগুলি আহরণ ও আত্মস্থ করেছিল এবং পরবর্তীকালে যে জ্ঞানের প্রভাব পাশ্চাত্য জগতকে জাগ্রত করে বর্তমান রেনেসাঁর পথে তুলে দেয়, মধ্যযুগে আরব-জাতি মাধ্যম হিসেবে সে জ্ঞান ইউরোপের বুকে সঞ্চারিত করে।

আরব- জাতি বলতে আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাদের সহ আরব-ভাষাভাষী সমস্ত জাতিকে আমরা বুঝব। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে এই আরব জাতি মানব-সভ্যতার প্রগতির ক্ষেত্রে যে অপূর্ব দান করেছে, অমন আর কোন জাতিই করে নাই। শার্লেমেন ও তাঁর লর্ডরা যখন নাম দস্তখত করতে শিখছিলেন বলে কথিত হয়, তখন আরব পণ্ডিতেরা আরাস্তুর গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। কর্ডোভার বিজ্ঞানীরা সতরটি বিরাট লাইব্রেরী নিয়ে গবেষণা করতেন। তার একটি লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা ছিল ৪,০০,০০০। আর সে পণ্ডিতেরা যখন পরম

আরামদায়ক গোসলখানা ব্যবহার করতেন, তখন অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্গ প্রক্ষালনকে এক ভয়ঙ্কর অনাচার বলে বিবেচনা করা হত।

আরব-জাতির কাহিনী যে আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, সে কাহিনীর মূলে আছে এমন এক মহান ধর্ম-প্রবর্তকের সাধনার কথা যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনজন একেশ্বরবাদী ধর্ম সংস্থাপকের মধ্যে তৃতীয় ও আধুনিকতম এবং যাঁর ধর্ম ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

আরব অভিযান কখনো বিজয় লাভ করেছে, কখনো বা পরাজয় বরণ করেছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌র যে মহান ধর্মমত—একমাত্র আল্লাহ'র উপর ইমান—সে ধর্মমত বার বার তুর্ক ও মোগলদের উপর বিজয় লাভ করেছে, যদিও দৈহিক শক্তিতে এ দুই জাতিই আরব-জাতিকে পরাজিত করেছে। এইতো সে দিন—১৯৪৭ খৃস্টাব্দে নতুন ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান জন্ম লাভ করল; বাসিন্দা সংখ্যা এর সাত কোটি। বর্তমান জগতে এ গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে যে, মরক্কো হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলাম আজো জীবন্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ইসলামের বিধি-নিষেধ অনুসারে তাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আজ আরবী ভাষা প্রায় পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে তাদের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। মধ্যযুগে বহু শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত সভ্য জগতব্যাপী আরবী ছিল জ্ঞান, তমদ্দুন ও প্রগতিমুখী চিন্তার ভাষা। খৃস্টীয় নবম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে আরবী ভাষায় দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূগোল সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তত আর কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই। ইউরোপীয় ভাষাসমূহের শব্দাবলীর মধ্যে আজো সে প্রভাবের চিহ্ন বর্তমান! ল্যাটিন হরফের পর আরবী হরফই জগতের সব চেয়ে প্রচলিত হরফ।

সিমাইট জাতির দুইটি প্রতিনিধি এখন বর্তমান—আরব ও ইহুদী। এদের মধ্যে আরবরাই তাদের জাতির দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক গতিভঙ্গী অধিকতর রূপে রক্ষা করে এসেছে। তাদের ভাষা সিমাইট ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়ে সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু তথাপি এ ভাষা হিব্রু ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহের মধ্যে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে আদি সিমাইট ভাষার শব্দ-রূপসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। ইসলামের যে আদি রূপ, তাতে তাকে সিমাইট ধর্মের অনিবার্য পরিণতি বলেই মনে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় 'সিমাইট' বলতে ইহুদীদের বুঝায়। কিন্তু তাদের দেহের সেমিটিক বৈশিষ্ট্য (উন্নত নাসিকাসহ) আদতে মোটেই সেমিটিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ওই বৈশিষ্টগুলিই প্রমাণ করে যে, ইহুদীরা খাঁটি সিমাইট নয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেকালে হিট্টাইট-হুররিয়ান ও হিব্রুদের মধ্যে যে বিয়ে-শাদী হয়েছিল, এ বৈশিষ্ট্যগুলি তারই অবদান।

দেহ, মন, সমাজ ও ভাষার দিক দিয়ে আরবদেশীয় আরব—বিশেষ করে বেদুঈনরাই সেমিটিক-গোষ্ঠীর সব চেয়ে খাঁটি প্রতিনিধি। এর কারণ, তারা বাকি দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্নভাবে মরুর বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করে। বাস্তবিক, গোষ্ঠীগত পবিত্রতা রক্ষা একমাত্র নিরনন্দ বিচ্ছিন্ন পরিবেশই সম্ভব। মধ্য-আরব এই-ই জীবনের পরিবেশ। মাটির সঙ্গে মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের নজীর এক আরব উপদ্বীপেই পাওয়া যায়। ভারত. গ্রীস. ইতালী, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কত দেশ হতে কত মানুষের ধারাই না এসে মিশেছে! কিন্তু আরবে অমন কখনো ঘটেছে কিনা ইতিহাসে তার কোন প্রমাণ নাই। আমরা এমন কোন আক্রমণকারীর কথাও অবগত নই যিনি বালির বাধা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে তথায় আসন গেড়ে বসেছেন। ইতিহাস যতকালের খবর রাখে, ততকালের মধ্যে আরবদের বাসিন্দারা—বিশেষ করে তার বেদুঈনেরা মোটামুটি একই রয়ে গেছে। আর ব্যাবিলোনিয়ান, আসিরিয়ান, হিব্রু, আরব এবং আবিসিনীয়ান প্রভৃতি সেমিটিক জাতিসমূহের পূর্বপুরুষেরা এই আরবেই আদিম বাসিন্দা ছিল। কোন এককালে এই অঞ্চলে তারা এক জাতি হিসেবে বসবাস করত।

ইরাক ও বৃহত্তর সিরিয়াসহ পারস্য উপসাগর হতে সিনাই পর্যন্ত ভূখণ্ডকে 'উর্বর হেলাল' বলা হয়। আরব যেমন সেমিটিক জাতিসমূহকে দিয়েছিল তাদের আদিম বাসভূমি, উর্বর হেলাল তেমনি তাদের দিয়েছিল তাদের প্রাথমিক সভ্যতার সূতিকাগার। সেমিটিক-জাতিরা খৃস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ইউফ্রেতীস নদীর উপত্যকায় চলে আসে এবং এইখানেই ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ ঘটে। এই সংস্কৃতির অবদান হিসেবেই আমরা পেয়েছি ওজন ও সময় পরিমাপক বিদ্যা। এর এক হাজার বছর পর আমোরাইট্‌রা উত্তর সিরিয়ায় চলে যায়। এদেরই একাংশের নাম ছিল ক্যানানাইট। গ্রীকরা ক্যানানাইটদের বলত ফিনিশীয়ান। এরা লেবাননের উপকূল-ভূমিতে বাস করত। পরে এরাই হয়ে ওঠে জগতের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী ও প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। যদি এরা জগতকে কেবল মাত্র হরফ দিয়ে থাকে, তবে শুধু সেই জন্যেই এদের মানব জাতির মহত্তম বন্ধুদের মধ্যে গণ্য করতে হবে।

আরবের মুসলমানের তাদের বিস্ময়কর বিজয়ের ফলস্বরূপ আরমিনীয়দের (সিরিয়ান) মারফত এই প্রাচীন সেমিটিক জাতিসমূহের উত্তরাধিকার লাভ করে। দক্ষিণ আরবের সংস্কৃতিও তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। ইয়েমনে মিনিয়ান, সেবীয়ান ও হিমারাইট গোষ্ঠির মানুষেরা ঐশ্বর্যশালী রাজ্যের পত্তন করে এবং খৃস্ট-পূর্ব ১২০০ সাল হতে খৃস্ট-পরবর্তী ৫২৫ সাল পর্যন্ত এ সব রাজ্য স্থায়ী থাকে। নামেই বোঝা যায়, শেবার রাণীর আদি বাসভূমি ছিল দক্ষিণ-আরব।

আদিম আরব বেদুঈন

এ-পুস্তকে আরবী ভাষাভাষী সমস্ত জাতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়—কেবল আরবের বাসিন্দা নয়—সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, ট্রান্স জর্দান, ইরাক, ইরান, মিসর, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যযুগীয় সিসিলী ও স্পেন সহ বহু দেশের লোক। তথাপি আদিম আরব বেদুঈনের উপর আমাদের প্রথম আলোক সম্পাতের প্রয়োজন।

জিপ্‌সীরা কেবল বেড়ানোর জন্যই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। বেদুঈন সে ধরনের জিপ্‌সী নয়। মরুভূমির অবস্থার সঙ্গে মানুষের জীবনকে কি করে সব চেয়ে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, বেদুঈন তার প্রকৃষ্ট আদর্শ। যেখানে ঘাস জন্মে, বেদুঈন তার উট, ঘোড়া, দুম্বা, বকরীর খাদ্যের খোঁজে সেখানেই চলে যায়। ডেট্রয়েট অথবা ম্যানচেস্টারে শিল্প ব্যবসায়ের মত নফুদ্'য়ে যাযাবর-বৃত্তি জীবনযাত্রার এক বিজ্ঞান-সম্মত পথ। বেদুঈনকে তার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে একটা সুসঙ্গত এবং কঠোর সামঞ্জস্য সাধন করে চলতে হয়। কারণ, আরবের প্রায় সর্বাংশেই মরুভূমি; বাস-উপযোগী কেবল একটি মরু-ভূখণ্ড তার চারদিকে ঘিরে আছে। আরবরা তাদের দেশকে দ্বীপ বলে। প্রকৃতপক্ষে আরব একটি দ্বীপ। তার তিন দিকে পানি আর চতুর্থ দিকে বালির দরিয়া।

আরব পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় উপদ্বীপ। এত বড় আয়তন সত্ত্বেও এর বাসিন্দা সংখ্যা সত্তর-আশী লাখের বেশি নয়। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন যে, আরব দেশ এককালে সাহারা মরুভূমির এক স্বাভাবিক সংযুক্ত অংশ ছিল; এক্ষণে লোহিত সাগর একে আলাদা করে রেখেছে। কেবল তাই নয়; যে বালুকাময় ভূখণ্ড মধ্য-ইরান ও গোবী মরুভূমির ভিতর দিয়ে এশিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে, আরব দেশ তার সঙ্গেও যুক্ত ছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ দেশসমূহের মধ্যে আরব অন্যতম। যদিও এর পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র বর্তমান, কিন্তু সে সমুদ্রের পরিসর অত্যন্ত অল্প। এশিয়া-আফ্রিকার বিরাট বৃষ্টিহীন ভূখণ্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে এর আবহাওয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত। পূর্ব-পশ্চিমের ক্ষুদ্র পরিসর সমুদ্রের পানি সে আবহাওয়াকে মোলায়েম করতে পারে

না। দক্ষিণের সমুদ্র হতে কিছু বৃষ্টি আসে, সন্দেহ নাই; কিন্তু মৌসুমী হাওয়া মাঝে মাঝে দেশের উপর প্রবাহিত হলেও দেশের ভিতরের অংশের জন্য তার বুকে বিশেষ কোন বাষ্প অবশিষ্ট থাকে না। স্বাস্থ্যপ্রদ স্নিগ্ধ পুবালী বাতাস বরাবরই কেন আরব কবিগণের রচনার বিষয় হয়েছে, তা বোঝা কঠিন নয়।

বেদুঈন তার পিতৃ-পিতামহের মত এখনো ছাগল ও উটের পশমের তাঁবুতে বাস করে এবং সেই প্রাচীন চারণভূমিতে তার ভেড়া ও বকরী চরায়। ভেড়া, উট ও ঘোড়া পালন, শিকার ও লুণ্ঠন—এই হল বেদুঈনের নিয়মিত পেশা; আর তার বিবেচনায় মরদের পক্ষে এই-ই ইয্যতের পেশা। তার দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষি এবং সর্বপ্রকার শিল্প ও ব্যবসায় তার মর্যাদার অনুপযোগী। আসলে আবাদযোগ্য জমিনের পরিমাণও নগণ্য। সামান্য গমের আবাদ হয়। বেদুঈনের পক্ষে রুটি বিলাসের খাদ্য। সামান্য কিছু গাছপালা আছে—খেজুর গাছ। আর আছে সেই গুল্ম যা থেকে দক্ষিণ-আরবের বিখ্যাত কফী তৈরি হয়। (১৪শ শতাব্দীর আগে এর চল হয় নাই) মরূদ্যানে জন্মে নানা রকম ফল, বাদাম, আখ ও তরমুজ। দক্ষিণ-আরবের সেকালের বাণিজ্য-জীবনে গুগ্‌গুলের মস্ত গুরুত্ব ছিল। সে গুগ্‌গুল আজো প্রচুর জন্মে।

আরব শুষ্ক নিষ্করুণ দেশ ঃ বাতাস শুকনা, জমি লবণাক্ত। বারো মাস প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র গিয়ে পড়েছে, এমন একটি নদীও নাই। ছোট ছোট নদী যা আছে, তার একটিও জাহাজ কিংবা নৌকা চালাচলের উপযোগী নয়। নদী-নালার জায়গায় আছে অনেকগুলি ওয়াদী। কখনো বান প্লাবন এলো এই ওয়াদী পথে তো চলে যায়। এসব ওয়াদীতে আরো একটি কাজ হয়: হজ্‌যাত্রীদের এবং সাধারণ কাফেলার পথ নির্ণয় এরাই করে। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় হতে হজ্‌ই আরবের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগসূত্র স্থাপন করে এসেছে।

উর্বর হেলালে সাম্রাজ্যের উথান হয়েছে—পতন হয়েছে; কিন্তু ঊষর মরুভূমিতে বেদুঈন বরাবর একই রয়ে গেছে। বেদুঈন, উট আর খেজুর গাছ—মরুভূমিতে এদেরই প্রকৃত প্রভুত্ব। বালুকার সঙ্গে একত্র হয়ে এরা চারজনই এ মঞ্চের অভিনেতা। যেখানে আর কিছুই টিকতে পারে না, সেখানে দৃঢ়তা ও সহনশক্তির জোরে বেদুঈন বেঁচে থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তার চিত্তে এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে আছে যে, তার মধ্যে কখনো সামাজিক সচেতনতা বিকাশ লাভ করে নাই। নিজের কওমের বাইরে সে পর হিতৈষণার কথা ভাবতে পারে না। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা-রক্ষা ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য—এ সব তার আদর্শের অন্তর্গত নয়।

সেমিটিক ধর্মের অঙ্কুর প্রথম পাতা মেলে মরূধ্যানে—বালুময় ভূমিতে নয়। পাথর ও ফোয়ারাকে কেন্দ্র করে এ ধর্ম গড়ে উঠ্‌তে থাকে। এর থেকেই এসেছে ইসলামে 'হাজরুল আসোয়াদ' ও জম্‌জম্‌ এবং ওলড্‌টেস্টামেন্টে বেথেল।

বেদুঈনের মরু-গৃহের বৈচিত্র্যহীনতা ও অনুর্বরতা তার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির উপর যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। সে কতকগুলি হাড্‌ডি ও শিরা-উপশিরার বোঝা। খেজুর ও দুধ তার খানার প্রধান দফা। খেজুর আর উটের গোশত্‌ই তার অতরল খাদ্য। খেজুর গাঁজিয়ে সে তার প্রিয় শরবত তৈরি করে। খেজুরের বিচি ভেঙ্গে সে রোজ তার উটকে খাওয়ায়। পানি আর খেজুর—মরুভূমির এই দুটি মূল্যবান সম্পদের মালিক হওয়া বেদুঈনের দিনের ধ্যান, রাতের স্বপ্ন।

বেদুঈনের খাদ্যের মত তার কাপড়-চোপড়ও নিতান্ত অল্প। কটিবন্ধযুক্ত একটি লম্বা কামিজ এবং তার উপর একটি দোলায়মান দীর্ঘ জামা। মাথায় দড়িতে বাঁধা একটি চাদর। পাজামা তারা পরে না; পাদুকা দুষ্প্রাপ্য।

আরবের জীব-জানোয়ারের মধ্যে দুটি প্রধান—উট আর ঘোড়া। উট বাদ দিলে মরুভূমিতে বাস করা কল্পনার অতীত। উট বেদুঈনের খাদ্য, তার বাহন, তার মুদ্রা। কনের মোহর, 'রক্তের দাম, জুয়ার লাভ, শেখের ঐশ্বর্য—সবেরই পরিমাণ উটের সংখ্যা দিয়ে ঠিক করা হয়। উট বেদুঈনের নিত্য সঙ্গী, পোষক-পিতা, দ্বিতীয় সত্তা। সে পানির বদলে উটের দুধ খায়—পানি রেখে দেয় সে উট, ভেড়া, বকরীর জন্য। সে উটের গোশত্‌ দিয়ে ভোজের আয়োজন করে, সে উটের চামড়া গায় দেয়—সে উটের পশম দিয়ে তাঁবু তৈরি করে। সে উটের বিষ্ঠা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে, তার পেশাব দিয়ে চুলের টনিক ও দাওয়াই তৈরি করে। মাথা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করলে এতে চুলে এক রকম খোশ্‌বু পয়দা হয় এবং মুখমণ্ডলের উপর তেলের মত লেগে থাকে, যার ফলে মশা মাছি কামড়ায় না। বেদুঈনের কাছে উট কেবল জাহাজ নয়—উট আল্লার খাস নেয়ামত।

আজকের বেদুঈনরাও গর্বের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় দেয়—'আমরা উটের দেশের মানুষ।' মুসিল রুওয়ালাহ্‌ বেদুঈনদের সম্পর্কে তাঁর লিখিত গ্রন্থে বলেন : 'সে কওমে এমন একটি লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, সে কোন না কোন সময় উটের পেটের পানি না খেয়েছে।' জরুরী অবস্থায় হয় কোন বুড়ো উটকে জবে করা হয়, না হয় ওকে দিয়ে পানি বমি করার জন্য ওর গলার ভিতর একটা লম্বা কাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উট দুই-একদিন আগে পানি খেয়ে থাকলে তা' মোটামুটি পানের উপযোগী থাকে।

পৃথিবীত আরবই উট পালনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কাজে কাজেই উট-শিল্প এখনে আয়ের একটি বড় উৎস। আরবের অর্থনৈতিক জীবনে উটের স্থান যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা এ' থেকেই বোজা যায় যে, উটের বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন রং, বিভিন্ন অবস্থা এবং বিভিন্ন বয়স সম্বন্ধে নাকি আরবী ভাষায় এক হাজার শব্দ আছে। এক তলোয়ার ছাড়া আর কোন কিছুর জন্য ও' ভাষায় এত প্রতিশব্দ নাই।

অন্যপক্ষে, ঘোড়া বিলাসের সামগ্রী। ঘোড়ার খাদ্য জোটানো ও যত্ন নেওয়া মরুবাসীর পক্ষে এক সমস্যা। ঘোড়া থাকলেই বুঝতে হবে যে, তার মালিক ধনবান ব্যক্তি। মুসলিম-সাহিত্যে আরবের ঘোড়া অপরূপ খ্যাতি লাভ কলেও প্রাচীন আরবে ঘোড়ার আমদানী হয়েছিল অনেক পরে। খৃস্ট-জন্মের পূর্বে ঘোড়া আরবে আসে। কিন্তু এবার এখানে এসে যাওয়ার পর সে তার রক্তকে সম্পূর্ণ অবিমিশ্র রাখার পুরোপুরি সুযোগ পেয়ে গেল। দৈহিক সৌন্দর্য, সহনশীলতা, বুদ্ধি ও মনিবের প্রতি অগাধ ভালবাসার জন্য আরবের তাজী বিশ্ববিখ্যাত। এইরূপ সদ্বংজাত তাজী হতেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ উচ্চবংশীয় ঘোড়া পালনের আইডিয়া ও আদর্শ গ্রহণ করেছে। খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা স্পেনের মারফত ইউরোপে ঘোড়া সরবরাহ করে। বার্বারী ও আন্দালুসীয়ান ঘোড়ার মধ্যে সেই ঘোড়ারই নির্দশন স্থায়ী হয়ে আছে। ক্রুসেডের আমলে বিলাতী ঘোড়া আরব ঘোড়ার সংশ্রব হতে নতুন রক্ত সঞ্চয় করে।

বেদুঈনের কাছে ঘোড়ার প্রধান মূল্য এই যে, অতর্কিত আক্রমণের সময় ঘোড়ার দ্রুত-গতি তারপক্ষে বিশেষ সহায়ক। খেলা-ধুলা, দৌড় এবং শিকারেও ঘোড়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকের কোন আরব তাঁবুতে পানির অভাব হলে শিশুরা পিয়াসে আর্তনাদ করতে পারে, কিন্তু তাঁবুর কর্তা সে আর্তনাদে বিচলিত না হয়ে পানির শেষ ফোটাটি পর্যন্ত ঢেলে নিয়ে তার ঘোড়ার সামনে ধরবে।

অতর্কিত আক্রমণকে বেদুঈন ভাষায় গোজ্‌ওয়া বলে। গোজ্‌ওয়ারে এক হিসেবে লুণ্ঠনাত্মক আক্রমণ বলা যেতে পারে। কিন্তু মরুভূমির আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা গোজ্‌ওয়াকে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। বেদুঈনের এই যে পশু পালন-প্রধান সামাজিক জীবন এর থেকেই গোজ্‌ওয়ার উদ্ভব। মরু-জীবনে যুদ্ধের জোশ মানুষের মনে নিত্য-জাগ্রত। কাজেই গোজ্‌ওয়া সে জীবনে একটি বীরোচিত পেশা। খৃস্টান কওমেরাও এ' পেশা অবলম্বন করত। সেকালের একজন কবি এমন জীবনের নীতি সম্বন্ধে দুই লাইনে সুন্দর বলেছেন :'দুশমনের উপর গোজওয়া করা আমাদের পেশা। দুশমন না পেলে আমরা প্রতিবেশীর উপর হামলা চালাই; প্রতিবেশীও না মিল্‌লে অগত্যা আমরা ভাইকে আক্রমণ করি।'

গোজ্‌ওয়া একরকম জাতীয় ক্রীড়া। এই ক্রীড়ার বিধান অনুসারে একান্ত প্রয়োজন না হলে রক্তপাত নিষিদ্ধ। পরিবারে খানেওয়ালার সংখ্যা কমিয়ে রাখার কাজে গোজ্‌ওয়া খানিকটা সাহায্য করে। তবে এতে খাদ্যবস্তুর মোট পরিমাণ বাড়ে না। দুর্বল কওম অথবা স্থায়ী-বসুয়া কওম অনেক সময় প্রবল প্রতিবেশী কওমকে খাজনা দিয়ে নিরাপত্তা খরিদ করে।

গোজ্‌ওয়ার অপকারিতা খানিটা প্রশমিত হয় আতিথেয়তার নীতি দ্বারা। দুশমন হিসেবে বেদুঈন যত নির্মমই হোক না কেন, তার বন্ধুত্বের নিয়মের মধ্যে সে একান্ত বিশ্বস্ত ও পরম উদার। প্রাক-ইসলামী যুগে কবিরাই ছিল বড় সাংবাদিক। তারা মেহ্‌মানদারীর প্রশংসা কীর্তনে কখনো ক্লান্ত হয় নাই। তারা বলত : 'মেহ্‌মানদারী, ধৈর্য ও মরদামী—এই-ই তো জাতির শ্রেষ্ঠ গুণ।' পানি ও ঘাসের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার ফলেই কওমেরা পরস্পর দুশমন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দুর্দমনীয় হিংস্র মরু-প্রকৃতির সামনে মানুষ যে কত অসহায়, এরই উপলব্ধি হতে উদ্ভূত হয় এক পবিত্র কর্তব্য-জ্ঞান—মেহ্‌মানদারীর মহান দায়িত্ব। মরুভূমিতে সরাইখানা নাই, হোটেল নাই। সেখানে কোন মুসাফিরকে আশ্রয়দানে অস্বীকার কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি ও ইজ্জতের হানিকর—স্বয়ং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধ কাজ। কারণ, তিনি সকল আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয়দাতা।

কওমী সংগঠন হচ্ছে বেদুঈন সমাজের বুনিয়াদ। একটি তাঁবু মানে একটি পরিবার। একসঙ্গে যতগুলি তাঁবু থাকে, তা নিয় হয় একটি কওম। কয়েকটি আত্মীয় কওম নিয়ে হয় একটি সম্প্রদায়। এক কওমের লোক প্রত্যেক প্রত্যেককে এক রক্তের ভাই বলে মনে করে, এক শেখের আনুগত্য স্বীকার করে এবং এক যুদ্ধ-ধ্বনি করে। কওমের বয়োজ্যেষ্ঠ জনকেই সাধারণত কওমের শেখ বা সর্দার করা হয়। গোত্রীয় সংগঠনে রক্তের সম্বন্ধ পরস্পরকে একত্রে বেঁধে রাখে। কোন কওমের এক ব্যক্তির কয়েক ফোটা রক্ত চুষে খেলেই সে কওমে দাখিল হওয়া চলে।

তাঁবু এবং তাঁবুর ভিতর গিরস্থালীর জিনিষ-পাতি যা থাকে, তা তাঁবুপতির নিজ সম্পত্তি। কিন্তু পানি, ঘাস ও আবাদযোগ্য ভূমি কওমের সাধারণ সম্পত্তি।

কোন কওমে লোক যদি নিজ কওমের কোন লোককে খুন করে, তবে কেউ তার পক্ষে দাঁড়াবে না। যদি সে কওম ছেড়ে চলে যায়, তবে সে আইন বা সমাজ বিরোধী হয়ে পড়ে। যদি কওমের বাইরের কোন লোককে খুন করা হয়, তবে খুনের বদলা দিতে হয়। কওমের যে কোন লোককে নিজ জান দিয়ে সে বদলা দিতে হতে পারে।

মরুভূমির আদিম আইন অনুসারে রক্তের বদলা দিতে রক্ত চাই। প্রতিহিংসা সাধন ছাড়া আর কোন শাস্তিই পর্যাপ্ত নয়। রক্তের কলহ চল্লিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ীও হতে পারে। প্রাক-ইসলামী যুগে কওমে কওমে যত লড়াই হয়েছে, তৎকালীন ঐতিহাসিকেরা রক্তের ঋণকে তার আসল কারণরূপে বর্ণনা করেছেন, যদিও অর্থনৈতিক বিবেচনাও নিঃসন্দেহভাবে অনেক লড়াই'র কারণ ছিল।

নিজ কওমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ বেদুঈনের জীবনে আর নাই। কারণ, কওমহীন মানুষ কার্যতঃ অসহায় হয়ে পড়ে। তার অবস্থা আইনের আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তির অবস্থার মতো—সে আশ্রয় ও নিরাপত্তার সীমার বাইরে চলে যায়।

কওমী জীবন চায় সহযোগী কওমী মানুষের প্রতি শর্তহীন অসীম বিশ্বস্ততা। সে আনুগত্য দানের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নেয় যে, তার কওম এক স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ইউনিট। সে বিশ্বাস করে, অন্য প্রত্যেক কওমকে তার লুণ্ঠন ও হত্যা করার সঙ্গত অধিকার আছে। সামরিক ব্যাপারে ইসলাম এ-সব কওমের শক্তি ও দলীয় ঐক্যবোধের সদ্ব্যবহার করেছিল। ইসলাম তার সৈন্যদলকে কওমে কওমে বিভক্ত করত—বিজিত দেশে কওমী ভিত্তিতে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করত এবং পরাজিত জাতিসমূহের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করত, তাদের আশ্রিত বলে গণ্য করত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আরব-চরিত্রের ব্যাপক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধিত হয়েছিল। কিন্তু সে চরিত্র এই কওমী মেজাজ এবং আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সমাজবিরোধী বৈশিষ্ট্যসমূহকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারে নাই এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের অবনতি ও পতনের এই-ই কারণ ছিল।

কওমের সর্দারকে বলা হয় শেখ। শেখই কওমের প্রতিনিধি। শেখ কওমের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্ব নির্ভর করে সংযত বিচার-বুদ্ধি, উদারতা ও সাহসিকতার উপর। বিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং জনসাধরণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে শেখ সর্বময় কর্তা নন—কওমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের নিয়ে গঠিত পরামর্শ-সভার সঙ্গে তাঁকে আলোচনা করতে হয়। শেখের পদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কওমের সদিচ্ছার উপর।

আরব—বিশেষ করে বেদুঈন, জন্ম-গণতন্ত্রী। সে সমান স্তরে দাঁড়িয়ে শেখের সঙ্গে কথা কয়। যে সমাজে তার বাস, সে সমাজ প্রত্যেককে সমান স্তরে নামিয়ে আনে। বর্তমান কালের আগে বিদেশী শাসকদের ছাড়া আর কাউকে আরবরা কখনো মালিক বলে সম্বোধন করে নাই। কিন্তু আরব যেমন গণতন্ত্রী

তেমনি আবার আভিজাত্য-প্রিয়। সে নিজকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত জীব বলে মনে করে। তার কাছে আরব জাতির মত মহৎ জাতি এ' দুনিয়ায় আর নাই। বেদুঈন পরম গর্বের সঙ্গে বিশ্বাস করে যে, সভ্য মানুষ কম সুখী ও অতি নিকৃষ্ট। তার রক্তের পরিবত্রতায়, বাগ্মীতায় এবং কবিত্বে, তার ঘোড়া ও তলোয়ারে—সর্বোপরি তার মহান বংশ-মর্যাদায় আরবের গর্বের অন্ত নাই। সে সুদীর্ঘ বংশ-তালিকার কথা আওড়াতে ভালোবাসে এবং অনেক সময়, তার পূর্বপুরুষদের আদম পর্যন্ত নিয়ে ঠেকায়।

ইসলামের আগের জামানা হতে এ-যাবত কাল পর্যন্ত বেদুঈন রমনী যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে, তা তার স্থায়ী বসুয়া বোনের ভাগ্যে ঘটে নাই। সত্য বটে, সে বহু-বিবাহ প্রধান পরিবারে বাস করে আসছে; কিন্তু তবু সে স্বাধীনভাবে স্বামী গ্রহণ করতে পারে এবং সদ্ব্যবহার না পেলে স্বাধীনভাবে স্বামী বর্জন করতে পারে।

সুযোগ পেলে মরু সন্তানেরা অন্য তমদ্দুনও অনায়াসে আত্মস্থ করতে পারে। বহুকালের ঘুমন্ত বৃত্তি উপযুক্ত সাড়া পেয়ে সহসা জেগে ওঠে এদের মাঝে এবং বিপুল শক্তিতে পরিণতি লাভ করে সৃজনশীল অর্ধচন্দ্র এই সুযোগের ক্ষেত্র। এরই প্রভাবে কোন হাম্মুরাবী ব্যাবিলনে আবির্ভূত হয়, কোন মুসাকে (আঃ) পাওয়া যায় সিনাইয়ে, কোন জেনোবীয়ার উত্থান হয় পামীরায়, কোন আরব ফিলীপ দেখা দেয় রোমে, কোন হারুনর-রশীদ জেগে ওঠে বাগদাদে। আর পেট্রার মত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। আজো সে স্মৃতিস্তম্ভ বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তার যে অভূতপূর্ব সাফল্য, তার এক মস্ত কারণ ছিল বেদুঈনদের এই ঘুমন্ত শক্তি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে

'দ্বীপ' হলেও আরব বহির্জগতের নজর হতে রেহাই পায় নাই। আসীরিয়ার রাজা তৃতীয় শাল্‌মেনেসের কর্তৃক উৎকীর্ণ একটি লিপিতে আরবদের সম্বন্ধে প্রথম নির্ভুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি খৃষ্ট-পূর্ব ৮৫৪ অব্দে দামেস্কের রাজা ও তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে এক অভিযান করেন। এই মিত্রদের মধ্যে এক আরব শেখ ছিলেন। উৎকীর্ণ লিপির ভাষা তৎকালীন যুগ ধর্মেরই অনুরূপ ঃ 'কর্কর তার রাজধানী। আমি ধ্বংস করলাম। চূরমার করলাম। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেল্লাম। আরাম (দামেস্ক) অধিপতি হাদাদ-এজারের ১২০০ রথ, ১২০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ সৈন্য ... আরব শেখ গিনদিবুর ১০০০ উট।' এ-কথা লক্ষণীয় যে, আরববাসী সম্বন্ধে প্রথম যে ঐতিহাসিক দলীল আমরা পাই, তাতে তার সঙ্গে উটের সম্বন্ধ একান্ত ঘনিষ্ঠ।

আমরা এ যাবত আরব শব্দটি আরব-উপদ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা সম্বন্ধেই ব্যবহার করে এসেছি—ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য কোন তারতম্য করি নাই। কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর-আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে যে পার্থক্য, সে দিকে আমাদের নজর দিতেই হবে। মধ্য আরবের নজ্‌দীগণ উত্তর-আরবের অন্তর্ভুক্ত। পথঘাটহীন মরুভূমি আরবকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। দুই ভাগের বাসিন্দাদের উপর তার প্রভাব পড়েছে।

উত্তর-আরবের বাসিন্দাদের জাত-গত ঘনিষ্ঠতা ভূমধ্যসাগরীয় জাতিদের সঙ্গে; আর দক্ষিণ-আরবের জাত-গত সম্বন্ধ অ্যালপাইন জাতীয় আরমেনয়েড, হিট্টাইট বা হিব্রুদের সঙ্গে। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ চওড়া চোয়াল, বাঁকা নাক, চ্যাপ্টা গাল ও ঘন চুল। দক্ষিণ-আরবের লোকেরাই প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং এক নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তোলে। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে উত্তর আরবের বাসিন্দারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় নাই। এ পার্থক্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন; কারণ, ইসলাম দৃশ্যত সমগ্র আরবকে একীভূত করলেও প্রকৃতপক্ষে উত্তর-দক্ষিণের মাঝখানের বিভেদ রেখা কখনো বিলুপ্ত হয় নাই। পরবর্তীকালে এর ফল বিষময় হয়েছিল এবং আরব সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

একটা বিশাল কীলকের মত আরব উপদ্বীপ পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি সংস্কৃতির বাসভূমির ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ঃ একটি মিসর, অন্যটি ব্যাবিলনীয়া। আরব এদের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নাই। আফ্রিকা সিনাই উপদ্বীপের কাছে এসে আরবের সঙ্গে মিশেছে। এই সিনাই উপদ্বীপেই অবস্থিত বাইবেল-খ্যাত সিনাই পর্বত। এখান হতে একটি স্থলপথ নেমে এসেছে। আর একটি এবং সেইটিই বড় রাস্তা—নীলনদের কিনারা দিয়ে চলতে চলতে থিবীসের কাছে বাঁকা হয়ে লোহিত সাগরের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়েছে। দ্বাদশ মিসরীয় বংশের আমলে খৃস্ট-পূর্ব প্রায় ২,০০০ অব্দে একটি খাল (সুয়েজের পূর্বগামী) নীলনদের পূর্ব বাহুকে লোহিত সাগরের মাথার সঙ্গে সংযুক্ত করে। প্রথমে টলেমীরা এবং পরে খলীফারা এ খালের সংস্কার করেন এবং ১৪৯৭–৯৮ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌঁছার পথ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ খাল ব্যবহৃত হতে থাকে। দক্ষিণে মাত্র ১৫ মাইল বিস্তৃত সমুদ্র অঞ্চল আফ্রিকাকে উপদ্বীপ হতে আলাদা করে রেখেছে।

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবরা সামরিক জাতি ছিল না। তাদের ইতিহাস ছিল একটি ব্যবসায়ী জাতির ইতিহাস। দক্ষিণ-আরবে একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যিক সভ্যতা বর্তমান ছিল। এই সভ্যতা আফ্রিকা আর ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। উত্তর-আরব বিখ্যাত ছিল পেট্রা ও পামিলা নামক দুটি শহরের জন্য। এই দুটি বিরাট নগর সওদাগরী রাস্তার উপর নির্মিত হয়। কালক্রমে দুটিই বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণ হয় এবং দুটিই এখন বিরাট ধ্বসং-স্তূপে পরিণত। পেট্রা শহরটি নিরেট পাহাড় কেটে তার মধ্যে হতে গড়ে তোলা হয় এবং রোমকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি ঐশ্বর্য ও উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। রোমক পার্থিয়ান—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে সিরিয়ার মরুভূমিতে পামীরা শহর অবস্থিত ছিল। পামীরার উচ্চাভিলাসিনী অনিন্দসুন্দরী শাসনকর্মী জেনোবীয়ার কথা দুনিয়া আজো ভোলে নাই। তিনি নিজে নিজেই 'প্রাচ্যের রাণী' উপাধী গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাতে মিসর ও এশিয়া-মাইনরের এক বিরাট অংশ শামিল করে নিয়েছিলেন। ২৭২ খৃস্টাব্দে যখন সম্রাট আরেলীয়ান জেনোবীয়ার সেনাপতিগণকে পরাজিত করলেন, তখন রাণী এক দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে পালিয়ে মরুভূমিতে চলে গেলেন। কিন্তু রোমের বিপুল শক্তির সামনে তিনি মরুভূমিতেও নিরাপদ রইলেন না। সেকালের রীতি অনুসারে তাঁকে এই সম্মান করা হল, বিজয়ী বীর যখন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের ভিতর দিয়ে রোমে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে সোনার শিকলে বিজয়ীর রথের সামনে বেঁধে নেওয়া হল।

এখন আমরা আরব-উপদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসের আর একটি ঘটনার কথা বলব। এ ঘটনা অমন চমকপ্রদ নয়; কিন্তু এর ফল ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। খৃষ্ট-পূর্ব ১২২৫ অব্দে মিসর হতে ফিলিস্তিন যাওয়ার পথে হিব্রু কওমেরা সিনাই এবং নুফুদে চল্লিশ বছরকাল অবস্থান করে। সিনাইয়ের দক্ষিণ অংশের নাম মিদিয়ান। এই মিদিয়ানে স্বর্গীয় চুক্তি (কওভনেন্ট) সম্পাদিত হয়। এই কওমদের নেতা ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। মূসা এখানে একটি আরব রমণীকে বিবাহ করেন। কনে একজন মিদিয়ানী পুরুহিতের কন্যা ছিলেন (একসোডাস ৩ ঃ ১; ১৮ ঃ ১০—১২)। এই বিবাহ হতে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার সূচনা হয়। মূসার বিবি ইয়াহু নামক একটি দেবতার পূজা করতেন। এই ইয়াহুই পরে জেহোভা নামে অভিহিত হয়। ইয়াহু মরুর দেবতা ঃ অনাড়ম্বর, কঠোর। তার অধিষ্ঠান-স্থান ছিল একটি তাঁবু। আচার-অনুষ্ঠান ছিল সংক্ষিপ্ত ঃ মরুর খানাপিনা, বলি এবং পোড়া নৈবেদ্য। মিদিয়ানী পুরুহিতের কন্যা মূসাকে এই ধর্মে শিক্ষা দিলেন। কি বিরাট ঘটনাবলীই না এর থেকেই উদগত হল!

মরুভূমিতেই যে হিব্রুদের উৎপত্তি, ওল্ড টেস্টামেন্টে তার অনেক পরিচয় আছে। পয়গম্বর জেরেমিয়ার উল্লিখিত 'রাজারা' খুব সম্ভব উত্তর-আরব ও সিরীয় মরুভূমির শেখ ছিলেন। সোলায়মানের 'সঙ্গীত' বলে যা কথিত হয়, তার বর্ণনায় শুনামাইত্ সুন্দরীর রূপ অমর হয়ে আছে। শুনামাইত সম্ভবতঃ কেদার কওমের এক আরব ললনা ছিলেন। প্রাচীন সেমিটিক জগতের কবিতার মধ্যে আয়ুবের রচিত কবিতা সব চেয়ে সুন্দর। এ আয়ুব ইহুদী ছিলেন না, আরব ছিলেন। যে 'পূর্বদেশ আগত জ্ঞানী ব্যক্তিরা' তারার গতি অনুসরণ করে জেরুজালেম এসে হাজির হয়েছিলেন, মনে হয় তাঁরা ইরানের ম্যাগী ছিলেন না, উত্তর-আরবের মরুভূমিবাসী বেদুঈন ছিলেন। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ইহুদীরা আরবদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল; জ্ঞাতিত্বের দিক দিয়েও তারা একান্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। বাইবেলের সঙ্গে এমনি সম্পর্কের তালিকা অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে যাওয়া চলে।

কিন্তু ইসলামের অভ্যুত্থান নিয়েই আমাদের আসল কথা। ইসলাম আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম। এখানে এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, দক্ষিণ-আরবে সেকালে যে জাতীয় জীবনের বিকাশ ঘটেছিল, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে তা খান-খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল; রাজ্য জুড়ে চলছিল অন্তহীন অরাজকতা। বহুকাল হতে আরবে মূর্তি-পূজা প্রচলিত ছিল। বেদুঈনেরা প্রধানতঃ একটি চন্দ্র-দেবতাকে কেন্দ্র করে তাদের পূজা-অর্চনা করত। আর তাদের মত গরম দেশের পশু-পালকদের পক্ষে এই-ই স্বাভাকি ছিল বলে মনে

হয়; কারণ, রাতের স্নিগ্ধতা তাদের কাছে প্রতিভাত হত বন্ধুরূপে, আর দিনের সূর্য প্রতিভাত হত শত্রুরূপে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই মূর্তি-পূজা হয়ে পড়ে ছিল সেকেলে; মানুষের আধ্যাত্মিক-তৃষা আর এ ধর্ম দ্বারা পরিতৃপ্ত হচ্ছিল না। দেশে কতকগুলি অস্পষ্ট একেশ্বরবাদমূলক ধারণা আগেই আবির্ভূত হয়ে ধর্মরূপে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। দক্ষিণ-আরব ও নাজরানে খৃস্টান ও ইহুদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইয়াথ্রিব (পরে মদীনা) অঞ্চলে ইহুদী কওমেরা বেশ উন্নত ছিল। সিরিয়া ও আবিসিনীয়া হতে মক্কার বাজারে খৃস্টান ব্যবসায়ী ও গোলাম আসত। খৃস্টানদের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলছিল; যদিও খৃস্টান ধর্ম-মত আরবদের চিত্তকে কখনো আকর্ষণ করতে পারে নাই। কিন্তু মঞ্চ তৈয়ার হয়ে গিয়েছিল এবং একটি মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের সময় এসে পড়েছিল।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) আবির্ভাবের আগের যুগকে মুসলমানেরা বলে 'জাহেলীয়ার যুগ'। জাহেলীয়া-যুগের মানে অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ। মহানবীর আবির্ভাবের প্রায় আগ পর্যন্ত উত্তর-আরবে যদিও কোন লিখন প্রণালী বিকাশ লাভ করে নাই, তথাপি দক্ষিণ-আরবে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তাকেও বর্বরতার যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হলে অবিচার করা হয়। জাহেলীয়ার যুগে আরবে কোন প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাব ছিল না—কোন প্রবুদ্ধ পয়গম্বর ছিলেন না।

দুনিয়ার আর কোন জাতিই আরবদের মত সাহিত্যিক-ভাষার এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে না—আর কোন জাতি তাদের মত লিখিত বা কথিত কথা দ্বারা এত অভিভূত হয় না। আরবী ভাষার মত কোন ভাষাই বোধহয় সে ভাষাভাষীর মনের উপর এমন বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হয়তো একটি কবিতার মর্মকথা তারা স্পষ্টভাবে বোঝেই না, হয়তো মার্জিত ভাষায় রচিত একটি বক্তৃতার অনেক কথাই তাদের বোধগম্য নয় তথাপি সেই বক্তৃতা বা সেই কবিতা আবৃত্তি করে আজও বাগদাদ, দামেস্ক এবং কায়রোর শ্রোতৃমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তোলা চলে। ভাষার ছন্দ ও ঝঙ্কার তাদের মনে যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার নাম দিয়েছে তারা 'আইন-সঙ্গত যাদু।'

খাঁটি সিমাইট অর্থাৎ আরবরা কোন বড় আর্টের জন্মদান বা বিকাশ সাধন করে নাই। তাদের সৌন্দর্য-পিপাসা ভাষার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রীকরা তাদের মূর্তি ও ভাস্কর্যের গর্ব করত; কিন্তু আরবরা তাদের গীতি কবিতায় এবং ইহুদীরা তাদের ধর্ম-সঙ্গীতে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করত, তার পদ্ধতি নিঃসন্দেহ রকমে উন্নততর। আরবীতে প্রবাদ আছে ঃ 'মানুষের বাগ্মীতার মধ্যেই

তার সৌন্দর্য'। পরবর্তী যুগের প্রবাদ বলে ঃ 'জ্ঞান তিন চীজের উপর অবতীর্ণ হয়েছে ঃ ফিরিঙ্গীর মগজ, চীনাদের হাত আর আরবদের জিভ'। পদ্যে হোক আর গদ্যেই হোক, শক্তিমান ভাষায় সুন্দরভাবে নিজ কথা বলতে পারাকে আরবরা বাগ্মীতা বলে। আইয়ামে জাহেলীয়ার যুগে পূর্ণ-মানুষ হতে তিনটি মৌলিক গুণের প্রয়োজন ছিল ঃ বাগ্মীতা, তিরন্দাজী ও অশ্ব-চালনায় দক্ষতা। আরবী ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্য হেতু এ ভাষায় অল্প কথায় বড় ভাব প্রকাশ করা চলে। ইসলাম ভাষার এই বৈশিষ্ট্য এবং জাতির এই মনোভাবের ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করেছে। এই জন্যই মুসলমানেরা বলে, ইসলাম যে খাঁটি ধর্ম তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, কোরআনের ভাষার অলৌকিক সৌন্দর্য ও রচনা-দক্ষতা। ইসলামের বিজয় কতকাংশে ছিল একটি ভাষার বিজয়—বিশেষ করে একটি গ্রন্থের ভাষার বিজয়।

আইয়ামে জাহেলীয়ার যুগে কেবল এই কবিত্বময় প্রকাশ-ভঙ্গীতেই আরবরা দক্ষতা অর্জন করেছিল। কবিতা-প্রিয়তাই ছিল বেদুঈনের একমাত্র সাংস্কৃতিক সম্পদ।

কবির মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকগুলি কাজ জুটে যায়। লড়াই'র ময়দানে তার কওমের সাহসিকতার মত তার জিহ্বাও কার্যকরী ছিল। শান্তির সময় কবি তার অগ্নিময়ী বক্তৃতা দ্বারা শান্তি ভঙ্গের কারণ হয়ে উঠতে পারতেন। বর্তমান রাজনৈতিক অভিযানে কোন তুখোড় বক্তা যেমন প্রতিপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করে কলহের সূত্রপাত করতে পারে, তেমনি আরবের কবি তার কবিতা দিয়ে কোন কওমকে উত্তেজিত করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে পারেন। সেকালে কবিই ছিলেন মরু-সমাজের প্রেস এজেন্ট ও সাংবাদিক। কাজেই অনেক সময় বহু অর্থ দিয়ে তাঁকে তুষ্ট রাখা হত। তাঁর কবিতা লোকে মুখস্থ করত। তারপর সে-কবিতা একজনের নিকট হতে অন্যজনে শিখে নিত। এমনিভাবে সে কবিতা প্রচারণার এক মস্ত যন্ত্র হয়ে পড়ত। কবিরা জনসাধারণের অভিমতও গঠন করতেন। প্রাচীনকাল হতে 'কবির জিভ কেটে ফেলা' মানে ছিল কবিকে পয়সা-কড়ি দিয়ে তার বিদ্রূপাত্মক কবিতা হতে রেহাই পাওয়া।

কবি, তাঁর সমাজের কেবল যে দৈব-বাণী দাতা, পথ-প্রদর্শক, বাগ্মী ও মুখপাত্র ছিলেন এমন নয়, তিনি তাঁর সমাজের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকও ছিলেন—অবশ্য সেকালে যতখানি বৈজ্ঞানিক হওয়া সম্ভব ছিল। বেদুঈনেরা কবিতা দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করত। এক কবি দাবী করেছেন ঃ 'আমার কওমের সঙ্গে যুঝতে আসবে, এমন দুঃসাহস কার?'....

ঘোড়-সওয়ার, কবি ও জন-বল এমন আর কার আছে? কওমের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এই তিন চীজে ঃ সামরিক শক্তি, বুদ্ধি ও জনবল।

কাব্যগত মূল্য ও সৌন্দর্য সুষমা ছাড়াও প্রাচীন আরবী কবিতার আরো একটি দাম আছে ঃ যে যুগে এই সব কবিতা রচিত হয়েছিল সে যুগের ঐতিহাসিক উপকরণ হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে এই-ই আমাদের আধ-সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাল-মসলা। এর থেকে প্রাক-ইসলামী সমাজের সর্বাবস্থা সম্বন্ধেই আলোক পাওয়া যায়। এই জন্য আরবে প্রবাদ আছে 'কবিতা আরবের পাবলিক রেজিস্টার।'

আইয়ামে জাহেলীয়ার বেদুঈনদের কবিতা দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, হযরত মুহম্মদের (সঃ) আগে বেদুঈনদের যদি কোন ধর্ম থেকে থাকে তা সামান্যই ছিল। ঐতিহ্যের প্রতি বেদুঈনের সনাতন শ্রদ্ধাই ছিল তার ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের মূল উৎস। কোন খানেই সেকালের কোন দেব-দেবীর প্রতি প্রকৃত ভক্তির কোন পরিচয় আমরা পাই না। বেদুঈন বিশ্বাস করত, মরুভূমিতে জীন নামক কতকগুলি পশু-প্রকৃতির জীব বাস করে। দেব-দেবীর সঙ্গে জীনদের একমাত্র এই তফাৎ ছিল যে, দেব-দেবীরা মোটের উপর মানুষের হিতৈষী আর জীনেরা মানুষের দুশমন। বাস্তবিক, মরুর অজানিত বিভীষিকা ও বন্য জীব-জন্তুর আতঙ্ককেই কাল্পনিক রূপ দিয়ে এই সব জীন পয়দা করা হয়েছিল। ইসলামের পরও জীন সম্বন্ধীয় ধারণা মরে যায় নাই; বরং জীনের সংখ্যা বেড়ে যায়। কারণ পৌত্তলিক যুগের দেব-দেবীকে স্থানচ্যুত করে জীনে পরিণত করা হয়।

হেজাজ প্রদেশ নজদের উচ্চভূমি ও সমুদ্র উপকূলের নিম্নভূমিকে আলাদা করে রেখেছে। এই অনুর্বর প্রদেশে অবস্থিত মক্কা নগর। মক্কা নগরে একটি (একমাত্র নয়) উপাস্য দেবতা ছিল, নাম আল্লাহ্। অতি পুরাতন এ নাম। মক্কার বাসিন্দারা বিশ্বাস করত, আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং বিপদে ত্রাণকর্তা। এক্ষণে অনতিকাল মধ্যে এই মক্কার একটি মানুষের মুখ হতে ধ্বনিত হল আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম শব্দ, —যে জীবনময়ী বিপুল ধ্বনি মরুবাসীদের তাদের সংকীর্ন দ্বীপাবাস হতে তৎকালীন ধরণীর প্রায় শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে পৌছিয়ে ছিল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্!' আল্লাহ্ ছাড়া আর উপাস্য নাই।

মুহম্মদ-রসূলুল্লাহ্ (সঃ)

তখন মক্কার অন্তর্গত কাবা ছিল বহু রকম দেব-দেবীর মন্দির এবং মক্কা ছিল তীর্থের এক মস্ত কেন্দ্র। কোরায়েশ কওম এই কাবার রক্ষক ও সেবায়েত ছিল। অভিজাত কওম হিসেবে কোরায়েশের ইজ্জতের অন্ত ছিল না। ৫৭১ খৃষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে এই কোরায়েশ কওমে একটি শিশুর জন্ম হয়।

সূতিকা-গৃহেই তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল মুহম্মদ—স্পষ্টতঃই সম্মান-বাচক উপাধি। কোরআনে তাঁর নাম দেখতে পাই মুহম্মদ (সঃ) এবং একবার আহ্‌মদ। এ নামের মানে 'বিশেষ প্রশংসিত।' দুনিয়ায় এ নামে যত শিশু-পুত্র আছে, অন্য কোন নামে তেমন নাই। তাঁর কওম তাঁর নাম দিয়েছিল আল-আমিন (বিশ্বস্ত)। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর সেই সময় তাঁর মাতাও ইন্তিকাল করেন।

বিশ্ব-নবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইতিহাসের পূর্ণ আলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। পঁচিশ বছর বয়সে ধনবতী ও উচ্চমনা বিধবা খাদীজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খাদীজা বয়সে তাঁর চেয়ে পনর বছর বড় ছিলেন। এই সময় হতেই হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইতিহাসের স্পষ্ট মঞ্চে এসে হাজির হলেন। খাদীজা কোরায়েশ খান্দানের রমনী ছিলেন। তিনি এক ধনী সওদাগরের বিধবা পত্নী ছিলেন এবং স্বাধীনভাবে তাঁর কারবার পরিচালনা করে আসছিলেন। যুবক হযরত মুহম্মদকে (সঃ) তিনি তাঁর কাজে নিযুক্ত করেন। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহীয়সী নারী জীবিত ছিলেন, ততদিন হযরত মুহম্মদ (সঃ) অন্য বিয়ের কথা চিন্তা করেন নাই।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) এখন ফুরসত পেলেন এবং নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রতী হলেন। অনেক সময় দেখা যেত, তিনি নিরালায় চিন্তা করছেন অথবা মক্কার বাইরের একটি পাহাড়ের গুহায় ধ্যান-মগ্ন আছেন। একদা এইরূপ ধ্যানস্থ অবস্থায় যখন তাঁর চিত্ত সংশয় ও সত্যের আকুল সন্ধানে উদ্বেলিত ছিল সেই সময় তিনি শুনলেন, কে তাঁকে আদেশ করছে ঃ

'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নামে আবৃত্তি কর' (কোরআন ৯৬ ঃ ১)। মহানবী তাঁর আহ্বান পেয়েছেন। কিছুদিন চলে গেল। তিনি তাঁর দ্বিতীয় আহ্বান পেলেন।

বিপুল আবেগ ভারে পীড়িত হয়ে তিনি সভয়ে সত্বর গৃহে চলে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বল্লেন—'আমাকে ঢেকে দাও—আমাকে ঢেকে দাও।' তখন অবতীর্ণ হল এই ওহীঃ 'হে বস্ত্রাবৃত পুরুষ! ওঠ এবং হুঁশিয়ার কর' (কোরআন ৭৪ ঃ ১)। আহ্বানের আওয়াজ একরকম ছিল না, কখনো ঘণ্টা-ধ্বনির মত কানে আসত। পরে সমস্ত আওয়াজ এক কণ্ঠস্বরে পরিণত হল ঃ জিবরাইলের কণ্ঠস্বর।

আরবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) বাণী আর ওলড্ টেস্টামেন্টের হিব্রু পয়গম্বরদের বাণী একইরকম ছিল ঃ আল্লাহ্ এক। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা। বিচারের দিন আছে। যারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করে তাদের জন্য বেহেস্তে বেশুমার পুরস্কার—যারা সে আদেশ লঙ্ঘন করে তাদের জন্য দোজখে ভয়াবহ শাস্তি। তাঁর প্রথম দিকের বাণীর এই-ই সংক্ষিপ্ত-সার। হযরত মুহম্মদ (সঃ) মনে করলেন, তিনি এক পবিত্র ব্রত সাধনে আদিষ্ট হয়েছেন। তিনি অনুভব করলেন, আল্লাহ্র পয়গম্বর হিসেবে তাঁকে এ মহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। অপার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর আপন লোকদের কাছে গিয়ে তাঁর নতুন বাণী প্রচার শুরু করলেন। তারা তাঁকে বিদ্রূপের হাসিতে উড়িয়ে দিল। তিনি তাদের সাবধান করতে লাগলেন ঃ বিচার দিনের কথা বলতে লাগলেন, বেহেস্তের সুখের এবং দোজখের দুঃখের জ্বলন্ত রোমাঞ্চকর বর্ণনা দ্বারা তাদের মন জয় করতে চেষ্টা করতে লাগলেন; এমন কি আসন্ন গজবের ভয়ও দেখাতে শুরু করলেন। তাঁর বর্ণিত প্রাথমিক ওহীগুলি সংক্ষিপ্ত, সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। কিন্তু অতিঅল্প লোকই তাঁর ধর্ম-মত গ্রহণ করতে এল। তাঁর স্ত্রী খাদীজা, তাঁর চাচাতো ভাই আলী এবং তাঁর জ্ঞাতি আবুবকর তাঁর মতে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু কোরায়েশদের আভিজাত্য-অভিমানী প্রভাবশালী শাখা অটল রয়ে গেল। তবে আস্তে আস্তে প্রধানতঃ গোলাম এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্য হতে লোক এসে বিশ্বাসীদের দল ভারী করতে লাগল। কোরায়েশরা দেখল, এতকাল তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করেছে, তা কার্যকরী হয় নাই। কাজেই দস্তুরমত যুলুম করার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। এই অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মক্কার এগারটি নব দীক্ষিত পরিবার আবিসিনীয়ায় হিযরত করতে বাধ্য হল। ৬১৫ খৃস্টাব্দে আরো তিরিশজন তাদের পথ অনুসরণ করল। আবিসিনীয়ার খৃস্টান রাজা নাজ্জাসী মুহাজিরদের তাঁর পক্ষপুট-তলে আশ্রয় দিলেন। কোরায়েশ অত্যাচারীরা তাদের হাতে মুহাজিরদের ফেরত দেওয়ার জন্য নাজ্জাসীকে অনুরোধ করে পাঠাল। কিন্তু নাজ্জাসী তাঁর আশ্রিতদের দুশমনের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলেন। এতগুলি অনুগামীকে হারিয়েও হযরত মুহম্মদ (সঃ)

বিচলিত হলেন না। তিনি নির্ভীকভাবে প্রচার করে চল্লেন এবং বুঝিয়ে সুঝিয়ে বহু দেবতার পূজা হতে তাদের নিবৃত্ত করে এক আল্লাহ্‌র এবাদতে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ওহী অবতীর্ণ হতে লাগল।

অল্পকাল মধ্যেই ওমর-ইবনুল-খাত্তাব এসে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে ইনি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে কি বিপুল দানই না করেছিলেন! এই সময়ের মধ্যেই ঘটে এক রোমাঞ্চকর নৈশ-ভ্রমণ। কথিত আছে ঃ হযরত মুহম্মদ (সঃ) চোখের পলকে গেলেন বায়তুল মোকাদ্দেস এবং সেখান হতে তিনি গেলেন সপ্তম আসমানে। বায়তুল মোকাদ্দেস (জেরুমালেম) আগে হতেই ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট পবিত্র স্থান ছিল। যেহেতু এই নৈশ-ভ্রমণ কালে এস্থান হতে মহানবী আসমানে গমন করেন, এই জন্য মুসলমানদের চোখে মক্কা-মদীনার পরই আজো বায়তুল মোকাদ্দেস সবচেয়ে পবিত্র স্থান। এই অলৌকিক ভ্রমণ-কাহিনীতে পরবর্তীকালে অনেক নতুন কথা যোগ করা হয়েছে এবং এই পরিবর্ধিত আকারে ইহা আজো পারস্য ও তুরস্কের মরমী-মহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। একজন স্পেনীয় পণ্ডিত বলেন, এই কাহিনীই দান্তের 'ডিভাইন কমেডী'র মূল উৎস। ফিলিস্তিনে ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়, তা থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলামে এ ভ্রমণের স্মৃতি আজো কত জীবন্ত ও শক্তিশালী। ইহুদীদের 'ক্রন্দনমান দেয়াল'-কে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গা বেঁধে ওঠে। কেউ কেউ মেনে করে, যে বোর্‌রাকে সওয়ার হয়ে মহানবী উক্ত নৈশ-ভ্রমণ করেন, সে অপরূপ ঘোড়া এইখানে কিছুকাল অবস্থান করেছিল।

এই অলৌকিক ভ্রমণের দুইবছর পর প্রায় পঁচাত্তরজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মদীনায় গিয়ে বাস করতে দাওয়াত করে। মদীনার ইহুদীরা একজন 'মসিহ্‌'-এর জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং তাদের প্রতিমা-পূজক প্রতিবেশীদের মনকে অমন একজন ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাবের জন্য তৈরি করে রেখেছিল। মদীনা ছিল হযরত মুহম্মদের (সঃ) মায়ের শহর। তিনি তাঁর দুইশ' অনুগামীকে কোরায়েশদের নজর এড়িয়ে চুপচাপ মদীনায় চলে যেতে অনুমতি দিলেন। তিনি নিজে সেখানে ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর গিয়ে হাজির হলেন। এই-ই ছিল বিখ্যাত হিযরত । হিযরত পুরোপুরি পলায়ন ছিল না। এ ছিল দুই বছরের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। যে চান্দ্র বছরে এই হিযরত ঘটে সতর বছর পরে খলীফা ওমরের নির্দেশমত সেই বছর হতে মুসলমানদের সরকারী অব্দ গণা শুরু হয়।

এই হিযরত হতেই হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কার জীবনের অবসান এবং মদীনার জীবনের আরম্ভ। আর এখানেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

অবজ্ঞাত পয়গম্বর হিসেবে তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগ করে সম্মানিত নেতা হিসেবে তিনি তাঁর নব আবাস-নগরে প্রবেশ করেন। তাঁর ভিতরের দ্রষ্টা জীবনের পার্শ্বে জেগে ওঠে—আর জেগে ওঠে তার সাথে জ্ঞান গরীয়ান এক কর্মী পুরুষ।

এই সময় একটি গ্রীষ্মকালীন সওদাগরী কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কায় ফিরে আসছিল। মদীনার উপকণ্ঠে মুসলমানদের দ্বারা এই কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার গুজব রটে। মক্কা ছিল তাদের বাণিজ্যিক রাজধানী। সুতরাং এই আক্রমণ সে রাজধানীর বাণিজ্যিক জীবনের মর্মমূলে নিদারুণ আঘাত হানে। কাফেলার সর্দার এ আক্রমণ-অভিসন্ধির কথা আগেই জানতে পেরে মক্কার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল। ফলে যে যুদ্ধ হয়, তাতে তিনশ' মুসলমান তাদের পয়গম্বরের অনুপ্রেরণাময় নেতৃত্বে এক হাজার মক্কাবাসীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। সামরিক ব্যাপার হিসেবে এ যুদ্ধ যতই নগণ্য হোক না কেন, এই-ই হয়ে পড়ল হযরত মুহম্মদের (সঃ) পার্থিব ক্ষমতার বুনিয়াদ। প্রকাশ্য যুদ্ধে ইসলাম এই তার প্রথম এবং নিশ্চিত বিজয় লাভ করল। তারা ভাবল, ইসলাম যে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম, এ বিজয় তারই প্রমাণ।

এ যুদ্ধে মুসলমানেরা নিয়মের প্রতি যে নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি যে অবজ্ঞার পরিচয় দিল, পরবর্তী এবং বৃহত্তর বিজয়কালে এই-ই হয়ে উঠেছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। সত্য বটে, পর বছর মক্কীরা এসে তাদের প্রতিহিংসা সাধন করে গেল, পয়গম্বর স্বয়ং আহত হলেন; কিন্তু তাদের এ বিজয় স্থায়ী হল না। ইসলাম তার শক্তি পুনরুদ্ধার করে নিল এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের আসরে নেমে এল। তার প্রচার অনিরুদ্ধভাবে এগিয়ে চলল। এ-যাবতকাল পর্যন্ত ইসলাম রাষ্ট্রের ভিতরের ধর্ম ছিল। মদীনায় ইসলাম রাষ্ট্র-ধর্মের সীমা অতিক্রম করে চলে গেল ঃ ইসলাম এখন নিজেই রাষ্ট্র হয়ে বসল। এই সময় হতে জগত ইসলামকে এই নবরূপেই চিনে আসছে ঃ একটি রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা।

ইহুদীরা মুসলমানদের দুশমনগণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, এই জন্য অতঃপর হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। তাদের নেতৃস্থানীয় কওমের ছয়শ' লোক নিহত হল; বাকী সবাইকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল। এর ফলে যে সব খেজুর বাগান মালিকহীন হয়ে পড়ল, সেখানে মুহাজিরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল। ইসলামের দুশমনদের মধ্যে এই-ই হল প্রথম কওম, যাদের সম্পর্কে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

এই মদীনা-যুগে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইসলামকে আরবের জাতীয় ধর্মে পরিণত করলেন। তিনি ইহুদী ও খৃস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। 'সাব্‌বাথে'র বদলে শুক্রবারকে মনোনীত করা হল। ঘণ্টাধ্বনি ও তূর্যনাদের

পরিবর্তে মিনার হতে আযান দেওয়ার ব্যবস্থা হল। রমযান মাসকে রোজার মাস গণ্য করা হল। নামাজের জন্য কিব্‌লা বায়তুল মোকাদ্দেস হতে কাবার দিকে পরির্তন করা হল; মক্কায় তীর্থ গমন সিদ্ধ করা হল এবং প্রাক-ইসলামী যুগের পূজ্য 'কালো-পাথর'কে চুমা দেওয়া জায়েজ করা হল।

৬২৮ সালে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ১৪০০ মুমিন নিয়ে মক্কায় হাজির হন এবং একটি সন্ধি-পত্র আদায় করেন। এতে মক্কী ও মুসলমানদের প্রতি সমান ব্যবহারের শর্ত লিপিবদ্ধ হয়। এই সন্ধি দ্বারা হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর আপনজন কোরায়েশদের ভিতরের দ্বন্দ্বের কার্যতঃ অবসান ঘটে। এই সময় খালিদ-ইবনুল-ওলীদ এবং আমর-ইবনুল-আস ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালের অভিযানে এঁরা দুজনেই হয়ে ওঠেন ইসলামের দুর্জয় তরবারি। এর দুই বছর পর ৬৩০ সালের জানুয়ারীর শেষ ভাগে (৮ম হিজরী) মক্কা বিজয় পরিপূর্ণ হয়। শোনা যায়, এ সময় কাবা ঘরে তিনশ' ষাটটি প্রতিমা ছিল। হযরত মুহম্মদ (সঃ) তার অনেকগুলি ভেঙ্গে ফেলেন এবং ঘোষণা করেন : "সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।" মক্কাবাসীদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি মহানুভবতার এক অপূর্ব আদর্শ দেখালেন—প্রাচীন জগতের ইতিহাসে এমন বিজয়-প্রবেশের তুলনা নাই বল্লেই চলে।

সম্ভবতঃ এই সময়ই হযরত মুহম্মদ (সঃ) কাবার চারপাশের স্থানকে নিষিদ্ধ ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেন। এ সম্বন্ধে একটি ওহীও নাজেল হয়। পরবর্তীকালে এই ওহীর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয় যে, অমুসলমানের পক্ষে কাবার এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্পষ্টই মনে হয়, এ আয়াতে হজের সময় পৌত্তলিকদের কাবার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়; কিন্তু আয়াতটির পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা আজো মেনে চলা হয়। এ পর্যন্ত পনরজনের মত ইউরোপীয়-খৃষ্টান মক্কা-মদীনা দেখে কোনরকমে জান নিয়ে ফিরে এসেছে। প্রথম জন ছিলেন বলোগনার লুডোভিসো-ডি-বার্থেমা, (১৫০৩); সর্বশেষদের মধ্যে ছিলেন এলডন রাটার নাম ইংরেজ। অবশ্য স্যার রিচার্ড বার্টানের বর্ণনাই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

৯ম হিজরীতে আকাবার খৃস্টান-প্রধান এবং মাক্‌না, আদরু ও জারবা মরূদ্যানের ইহুদী কওমদের সাথে হযরত মুহম্মদ (সঃ) সন্ধি স্থাপন করেন। দেশীয় খৃস্টান ও ইহুদীগণকে জিম্মীরূপে আশ্রয় দেওয়া হয়; বদলে তারা জিজীয়া দিতে রাজী হয়। জমি ও মাথা উভয়ের খাজনাই জিজীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নজীর পরবর্তীকালে অনেক সুদূর-প্রসারী ফল প্রসব করে।

এই ৯ম হিজরীকে বলা হয় 'প্রতিনিধি-দলের বছর'। এই বছর নিকট ও দূরের বহু প্রতিনিধি-দল শাসক পয়গাম্বরের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে

আসে। কওমের পর কওম মহানবীর সঙ্গে যোগ দেয়—ধর্ম বিশ্বাসের জন্য না হলেও অন্ততঃ সুযোগ সুবিধার জন্য। সামান্য খাজনা ও ইসলামের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করেই মুসলিম কর্তৃপক্ষ তুষ্ট ছিলেন। ইয়ামন, হাদ্রামাউত ও ওমানের মত দূরবর্তী স্থান হতেও দলে দলে লোক এসে হাজির হয়। যারা কোনদিনই কোন একজন মানুষের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই, আরবের সেই সব সম্ভ্রান্ত কওম ও শেখ হযরত মুহম্মদের (সঃ) কর্তৃত্ব মেনে নিতে এবং তাঁর পরিকল্পনায় শরীক হতে রাজী হল। এক মহত্তর ধর্ম ও উন্নততর নীতির নিকট প্রতিমা পূজা নতি স্বীকার করতে লাগল।

হিজরী দশম অব্দে মহাসমারোহের সঙ্গে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর নতুন ধর্মীয় রাজধানী মক্কায় হজ করতে গেলেন। মক্কায় এই-ই ছিল তাঁর শেষ গমন; এবং একেই বলা হয় 'হজ্জতুল বেদা'—বিদায় হজ্! মক্কা হতে ফিরে আসার তিনমাস পর ৬৩২ সালের ৮ জুন মহানবী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহ্...)।

মহানবীর মদীনার জীবন-কালে অনেকগুলি দীর্ঘ ওহী নাজেল হয়। এসব বাণীতে নামাজ, রোজা, হজ্, জাকাত প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনা ছাড়াও বিয়ে-তালাক, গোলাম-বাঁদী, যুদ্ধ-বন্দী ও শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ক অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে কথা আছে। মহানবী নিজে শৈশবে এতিম ছিলেন। গোলাম, এতিম, দুর্বল ও মযলুমদের সম্বন্ধে তিনি যে আইন করেছেন, তা নিতান্ত উদার।

হজরত মুহম্মদকে (সঃ) কেউ যখন জানত না, তখন তিনি যেমন অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন, আর গৌরবের শিখরে অবস্থানকালেও তিনি তেমনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। আজও আরব ও সিরিয়ায় যেমন ছোট ছোট কাদার ঘর আছে, মহানবী তেমনি একটি কাদার ঘরে বাস করতেন। সে ঘরে মাত্র কয়েকটি কোঠা ছিল; ঘরের সামনে ছিল একটি আঙ্গিনা। এই আঙ্গিনা পার হয়ে ঘরে যেতে হত। অনেক সময় তাঁকে তাঁর নিজ ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে দেখা যেত এবং যে কোন সময় যে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত। হোগার্থ বলেন ঃ 'তাঁর ছোট বড় সমস্ত দৈনন্দিন ব্যবহারই এক রকম আইনে পরিণত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক জেনে শুনে তাঁর অনুকরণ করে থাকে। যাঁদের কেউ কেউ 'পূর্ণ মানুষ বলে বিশ্বাস করে, তাঁদের কারো ব্যবহারই এমন ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় নাই।'

তাঁর যে সামান্য সম্পত্তি ছিল, তাকে তিনি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে মনে করতেন। তিনি প্রায় বারোটি বিয়ে করেন — কোন কোন বিয়ে ভালো-বাসার

জন্যে, আর কোন কোন বিয়ে রাজনৈতিক কারণে। তাঁদের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিলেন আবুবকরের কন্যা তরুণী আয়েশা। খাদীজার গর্ভে তাঁর কয়েকটি সন্তান জন্মে ছিল; কিন্তু এক ফাতিমা ছাড়া তাঁর জীবদ্দশাতেই বাকী সকলের মৃত্যু হয়। এই ফাতিমাই আলীর বিখ্যাত সধর্মিনী ছিলেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) মরিয়ম নাম্নী কিপ্তী-খৃস্টান স্ত্রীর গর্ভে ইব্রাহিম নামে একটি ছেলের জন্ম হয় এবং শৈশবেই তার পরলোক গমন ঘটে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এ' পুত্রের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেন।

মদীনার ধর্ম-সমাজ হতেই পরবর্তীকালে মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। মুহাজির ও আনসারের এই মিলিত সমাজ ধর্মের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ্‌র জামাত বলে গণ্য হয়। আরবের ইতিহাসে রক্তের বুনিয়াদের উপর না করে ধর্মের বুনিয়াদের উপর সমাজ গঠনের চেষ্টা এই-ই প্রথম। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহান শক্তির মূর্তিমান বিকাশ। মহানবী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা এবং দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর ধর্ম-ঘটিত কর্তব্য ছাড়াও দুনিয়ার যে কোন রাজা-বাদশাহ্‌র মত রাষ্ট্রের কাজ করতেন। এই সমাজের সকল মানুষ তাদের কওম ও পূর্ব আনুগত্য নির্বিশেষে এখন পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেল ঃ (অন্তত নীতিগতভাবে)। বিদায় হজে রসূলুল্লাহ্ যে মহান খোতবা দিলেন, নিম্ন কথাগুলি তারই অংশ ঃ

'হে জনমণ্ডলি! আমার কথা মন দিয়ে শোন এবং তা হৃদয়ে গেঁথে নাও। জেনে রাখ, প্রত্যেক মুসলমান অন্য প্রত্যেক মুসলমানের ভাই ঃ এখন তোমরা সকলে মিলে এক ভ্রাতৃসংঘ। যদি ইচ্ছা করে না দেয়, তবে তোমাদের এক ভাইয়ের কোন চীজ অন্য ভাইয়ের আত্মসাৎ করা বৈধ নয়।'

এতকাল পর্যন্ত আরব সমাজের বুনিয়াদ ছিল কওমী জ্ঞাতিত্ব। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এমনিভাবে এক আঘাতে তার পরিবর্তন করে ধর্মের বন্ধনকে করলেন নব সমাজের বুনিয়াদ। হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৌলিকতার এ একটি প্রধান দাবী। নতুন সমাজে কোন পাদ্রী পুরুহিতের স্থান রইল না। এর মসজিদ হল —জনসভার স্থান, সামরিক ড্রিলের ময়দান, এবং জামাতবদ্ধ নামাজের জায়গা। নামাজের ইমাম হলেন ময়দানে সেই মুমিনদের সেনাপতি যাঁরা সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে পরস্পর আত্মরক্ষার জন্য আদিষ্ট। আরবে এর পরেও যারা পৌত্তলিক রয়ে গেল, তারা রইল এ সমাজের বাইরে—প্রায় যেন আইনের রক্ষণেরও বাইরে। ইসলাম সমস্ত

অতীতকে নাকচ করে দিল। আরবের নিকট নারীর পরই প্রিয় ছিল মদ আর জুয়া। এক আয়াত এসব বন্ধ করেছিল। প্রায় অনুরূপ আকর্ষণের বস্তু ছিল সঙ্গীত : তার উপরও বিরূপ কটাক্ষ হানা হল।

মদীনা হতে ইসলামের ধর্মরাজ্য প্রথমে সমগ্র আরবে এবং পরে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার সমাজ ছিল পরবর্তী মুসলিম সমাজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এতকাল পর্যন্ত যে আরব দেশ ছিল মাত্র একটি ভৌগোলিক বাক্য, যে আরব-সমাজের লোকেরা কোন দিনই ঐক্যবদ্ধ হয় নাই, সেই আরব দেশে এবং সেই আরব-সমাজে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর এক নশ্বর জীবনে গড়ে তুললেন একটি জাতি— প্রবর্তন করলেন এমন একটি ধর্ম যা খৃস্টান, ইহুদী প্রত্যেক ধর্মের চেয়ে বেশি স্থান অধিকার করে আছে এবং দুনিয়ার মানুষের এক বিপুল অংশ যে ধর্ম মেনে চলে এবং এমন একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন যা অনতিবিলম্বে তৎকালীন সভ্যজগতের সুন্দরতম অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তিনি কখনো কোন বিদ্যালয়ে যান নাই; তবু তিনি এমন একটি গ্রন্থ রেখে গেলেন, যে গ্রন্থকে দুনিয়ার সাত ভাগের এক ভাগ মানুষ আজো সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিজ্ঞান এবং সমস্ত ধর্ম-তত্ত্বের আধার বলে মনে করে।

কিতাব ও ধর্ম

কোন মুসলমান পথে এক টুক্‌রা কাগজ পড়ে আছে দেখলে তা তখনি কুড়িয়ে নিয়ে পাশের দেয়ালের কোন গর্তে সযত্নে রেখে দেয়; কারণ, কি জানি ওতে যদি আল্লাহ্‌র নাম থেকে থাকে!—এ দৃশ্য আজো বিরল নয়। কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব ঃ মুসলমান এ কিতাবকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এ যে আল্লাহ্‌র কথা ঃ জিব্‌রাইল হযরত মুহম্মদের (সঃ) কাছে বহন করে এনেছেন। 'যারা পাক-সাফ নয়, এমন কেউ যেন এ কিতাব না ছোঁয়'(৫৬ ঃ ৭৮)।

দুনিয়ায় খৃষ্টানদের সংখ্যা মুসলমানদের মোটামুটি দ্বিগুণ। তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, কোরআন যত লোক পড়ে, অত লোকে আর কোন কিতাবই পড়ে না। নামাযের সময় কোরআনের সূরা তো ব্যবহার করা হয়ই, তাছাড়া কোরআন পাঠ্য-বই এবং এ বই হতে কার্যতঃ প্রত্যেক মুসলমানই আরবী পড়তে শিখে। তুর্কীতে কোরআনের একটি সরকারী অনুবাদ হয়েছে। তাছাড়া. আর কোন ভাষায় এর সরকার অনুমোদিত অনুবাদ হয় নাই। তবে বিনা অনুমোদনে প্রায় চল্লিশ ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। রডওয়েল-কর্তৃক অনুবাদ এভরীম্যানস্ লাইব্রেরীতে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। কোরআনের প্রথম অনুবাদ হয় ল্যাটিন ভাষায়। ক্লুনীর এবট মহামান্য পিটার দ্বাদশ শতাব্দীতে এর অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর মতলব ছিল ইসলামের মতবাদকে খণ্ডন ও ইসলামের প্রবর্তককে হেয়-প্রতিপন্ন করা। ১৬৪৯ সালে প্রথম ইংরেজী অনুবাদ দেখা দেয়।

বাইবেলের তুলনায় কোরআনে পাঠ-ঘটিত অনিশ্চয়তা নাই বল্লেই চলে। হযরত মুহম্মদের (সঃ) ইন্তেকালের (ঊনিশ বছর) পর পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করে কোরআনকে প্রথম, শেষ এবং একমাত্র অনুমোদিত গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। কারণ, তখন নানাযুদ্ধ-বিগ্রহে কোরআনের হাফিজের সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এর আগে বে-সরকারীভাবে খেজুরের পাতা, সাদা পাথরের ফলক ও 'মানুষের বুক' হতে একটি কোরআন সংগৃহীত হয়েছিল। অতঃপর অনুমোদিত সংস্করণ ছাড়া কোরআনের আর সব সংগ্রহ নষ্ট করে ফেলা হল। এর

৬,২৩৯টি আয়ত, ৭৭,৯৩৪টি শব্দ, এমন কি এর ৩,২৩,৬২১টি হরফ যত্নের সঙ্গে গণে রাখা হয়েছে। অবশ্য সব হিসেবে সংখ্যা সর্বাংশে মিলে না। কোরআন কেবল একটি ধর্মের প্রাণ নয়, কেবল বেহেস্তের কুঞ্জী নয়—কোরআন বিজ্ঞান এবং রাজনৈতিক দলীলের সংক্ষিপ্ত সারও বটে। এ দুনিয়ার রাজ্য চালনার আইন-কানুনও এতে আছে। কোরআন এবং ওল্ড্ টেস্টামেন্টের মধ্যে সাদৃশ্য বহু এবং বিস্ময়কর। কোরআনে যেসব ঐতিহাসিক কাহিনী আছে, তার প্রায় সবগুলিরই অনুরূপ কাহিনী বাইবেলে আছে। ওল্ড্ টেস্টামেন্টে বর্ণিতদের মধ্যে কোরআনে আছে আদম, নূহ্, ইব্রাহীম (প্রায় ৭০ বার উল্লিখিত), ইসমাইল, লুত, ইউসুফ, মুসা (৩৪টি সুরায় এর নাম আছে), সল, সোলায়মান, দাউদ, ইলিয়াস, আয়ুব এবং ইউনুস। সৃষ্টি ও আদমের পতনের কাহিনী পাঁচ বার বলা হয়েছে, মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে আটবার, সোডমের কথাও আটবার। নিউ টেস্টামেন্ট বর্ণিতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছেন জাকারীয়া, জন-দি-ব্যাপটিস্ট, ইসা এবং মরীয়ম। হিব্রু ও আরবী ভাষার অনেক প্রবাদ-বাক্য ওল্ড্ টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ও কোরআনে একইরকম-ভাবে পাওয়া যায়; যেমন—'চোখের বদলে চোখ', 'বালির উপর তৈরী বাড়ী','উট ও সূচের চোখ' এবং 'প্রত্যেকের জন্য মউতের পেয়ালা।'কোরআনে ইসার শৈশবকালে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয়েছে ঃ যেমন—দোলনায় শুয়ে কথাবার্তা এবং কাদা দিয়ে পাখী তৈরী। প্রক্ষিপ্ত-অংশ-যুক্ত(এপোক্রিফাল)'গস্পেলে' অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়।

নিউ টেস্টামেন্টের খৃস্টান ধর্ম ওল্ড্ টেস্টামেন্টের ইহুদী ধর্মের যত কাছে, কোরআনের ধর্ম তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে। তবে খৃস্টান ও ইহুদী উভয় ধর্মের সঙ্গে ইসলামের সাদৃশ্য এত বেশি যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় একে স্বতন্ত্র ধর্ম মনে না করে কেউ কেউ নিশ্চয় একে খৃস্টান ধর্মেরই একটি বিরুদ্ধ মতবাদ বলে মনে করেছেন।

কোরআনে সূরাসমূহ তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজানো হয়েছে। প্রথম দিকের সূরাগুলি (হিজরতের পূর্বের) সংখ্যায় প্রায় নব্বই এবং প্রাথমিক যুগের কৃচ্ছ্র-সাধনার কালে অবতীর্ণ। এ সূরাগুলি প্রায়ই ছোট, তীক্ষ্ণ, জলন্ত, উত্তেজনাময় এবং পয়গম্বর-জনোচিত অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। এসব সূরায় প্রধানতঃ বলা হয়েছে আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলী মানুষের নৈতিক কর্তব্য এবং আসন্ন শাস্তির কথা। মদনী সূরাগুলি সংখ্যায় চব্বিশ—কোরআনের প্রায় এক তৃতীয়ংশ—অবতীর্ণ হয়েছিল (হিজরতের পরে অবতীর্ণ) বিজয়ের যুগে। এগুলি প্রায়ই দীর্ঘ, বাগ-

বহুল, এবং আইনের মাল-মসলায় সমৃদ্ধ। এসব সূরায় ধর্মের আকিদা এবং জামাতে নামায, রোজা, হজ্ এবং পবিত্র মাসসমূহ সম্পর্কিত বিধান বিবৃত হয়েছে। এতে আছে : মদ, শুকরমাংস ও জুয়া খেলার নিষেধমূলক আইন, জাকাত, ও জেহাদ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও সামরিক আইন : হত্যা, প্রতিশোধ, চুরি, সুদ, বিয়ে, তালাক, ব্যভিচার, ওয়ারিসী-স্বত্ব এবং গোলাম-আযাদ বিষয়ক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন। ইসলাম সম্পর্কে বহু বিবাহের কথা অনেক সময় উল্লেখ করা হয়; কিন্তু ইসলামের বহু বিবাহ-ঘটিত আইন বহু বিবাহের প্রবর্তন করে নাই—বহু বিবাহকে সীমাবদ্ধ করেছে। অমুসলমান সমালোচকদের মতে তালাক সম্পর্কিত বিধানগুলি (৪ : ২৪, ৩৩ : ৪৮, ২ : ২২৯) সবচেয়ে আপত্তিজনক এবং গোলাম, এতিম ও মুসাফিরের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত বিধানগুলি সবচেয়ে উদার। গোলাম-আযাদ করাকে এই বলে উৎসাহ দেওয়া হয় যে, এ কাজে আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং এতে বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

কোরআনের শব্দগত মানে আবৃত্তি, বক্তৃতা, আলোচনা। কোরআন একটি প্রবল জীবন্ত শক্তি। কোরআন আবৃত্তি করতে হয় এবং এর প্রকৃত গুণ বিচার করতে হলে মূল ভাষায় শুনতে হয়। এর শক্তির অনেকখানি নির্ভর করে এর অপূর্ব ছন্দোময়ী ওজস্বিনী ভাষা-সম্পদের উপর। অনুবাদে এ সৌন্দর্য ও শক্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। দৈর্ঘ্যে কোরআন নিউ টেস্টামেন্টের আরবী অনুবাদের চার-পঞ্চমাংশ। মুসলমানেরা ধর্ম-বিজ্ঞান, আইন-বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানকে একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ বলে মনে করে। সে হিসাবে কোরআন তাদের কাছে বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় বিষয়ের উপযুক্ত পাঠ্য বই। আল-আজাহার আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কোরআনের প্রভাব আজো অব্যাহত; আজো কোরআন এর শিক্ষা-সূচীর বুনিয়াদ। রোমান্স ভাষাগুলি আলাদা হয়ে গেছে; কিন্তু কোরআনের ভাষার এমনি বিপুল প্রভাব যে, কেবল তারই জন্য আরবী ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতির আঞ্চলিক ভাষাগুলি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠে নাই। আজকের দিনে একজন ইরাকির পক্ষে মরক্কোর কথ্য ভাষা বুঝতে একটু বেগ পেতে হতে পারে, কিন্তু মরক্কোর লিখিত ভাষা বুঝতে তাকে কোন বেগ পেতে হবে না। কারণ, ইরাক, মরক্কো, সিরিয়া, আরব, মিসর—এর সর্বত্র কোরআনের আদর্শ মোতাবেক যে সাধু ভাষা, তা-ই অনুসরণ করা হয়। হযরত মুহম্মদের (সঃ) আমলে আরবে অন্যকোন প্রথম-শ্রেণীর গদ্য-গ্রন্থ ছিল না। সুতরাং কেবলমাত্র কোরআনই এমন প্রথম গদ্য-গ্রন্থ ছিল এবং

আজো আদর্শ গদ্য-গ্রন্থের আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোরআনের ভাষা পদ্য নয়—কিন্তু অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণ এবং ছন্দোময় গদ্য। রক্ষণশীল আরবী লেখকদের অনেকেই আজো এই ছন্দোময় গদ্যের অনুসরণ করে থাকেন।

নিকোল্‌সন তাঁর 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে 'সূরা ফাতেহার' নিম্নরূপ অনুবাদে মূলের সৌন্দর্যের খানিকটা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন ঃ

In the name of God, the merciful, who Forgiveth aye!

Praise to God, the Lord of all that be,

The merciful, who forgiveth aye,

The King of judgment day!

thee we worship and for thine aid we pray.

Lead us in the right way,

The way of those to whom thou hast been gracious, aganinst whom thou hast not waxed wroth, and who go not astray!

মুসলিম ধর্মবিদরা ইসলামের মূল-বিষয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্তব্য।

ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম ইমান। ইমান মানে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস, তাঁর ফেরেস্তায় বিশ্বাস, তাঁর কিতাবে বিশ্বাস, তাঁর পয়গম্বরে বিশ্বাস এবং কিয়ামতে বিশ্বাস। ইমানের মূল কথা হচ্ছে : 'ল-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্‌'। আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর মাবুদ নাই। ইমানে আল্লাহ্‌ বিষয়ক ধারণা স্থান সর্বোচ্চ। বাস্তবিক মুসলিম ধর্ম-শাস্ত্রের শতকরা ৯০ ভাগ স্থানই দখল করে আছে আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ই একমাত্র প্রকৃত উপাস্য। আল্লাহ্‌ই চরম সত্য—অনাদি, স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, স্ব-নির্ভরশীল। তাঁর ৯৯ নাম এবং ৯৯ গুণ। মুসলমানের পুরা তসবীহ্‌-তে ৯৯ গোটা—ঐ ৯৯ নাম মোতাবেক। তাঁর দয়া, গুণ—তাঁর শক্তি ও মহিমার পেছনে পড়ে গেছে। ইসলাম আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম। ইব্রাহিম আত্মসমর্পণের এ মহাপরীক্ষায় নিজ পুত্রকে কোরবান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর এই কাজকে 'আস্‌লামা' এই ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে (৩৭ ঃ ১০৩)। মনে হয়, এই শব্দ হতেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর ধর্মের নাম দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের এই যে আপোষহীন একেশ্বরবাদিতা, এক মহান প্রভুর মহোচ্চ-শাসনে এই যে সরল প্রাণময় বিশ্বাস—ধর্ম হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠ শক্তি এরই মধ্যে নিহিত। মুসলমানের মধ্যে যে সন্তোষ ও আত্ম-সমর্পণের ভাব দেখা যায়, তা অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। মুসলিম দেশে আত্মহত্যা বিরল।

ইমানের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঃ হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, তাঁর পয়গম্বর, মানবের ধর্মোপদেশদাতা এবং সমস্ত পয়গম্বরের শেষ পয়গম্বর। তিনি তাঁদের 'মোহর'—সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ। কোরআনে বর্ণিত ধর্ম-তত্ত্বে হযরত মুহম্মদ (সঃ) একজন মানুষ মাত্র। তাঁর একমাত্র মোজেজা হচ্ছে' কোরআনের অনুপম ভাষা। কিন্তু ঐতিহ্য, লোক-কাহিনী ও জনসাধারণের বিশ্বাস—এ তিনে মিলে তাঁর উপর খানিকটা ঐশীগুণ আরোপ করেছে। তাঁর ধর্ম একান্ত ব্যবহারিক ধর্ম—তাঁর প্রবর্তকের ব্যবহারিক এবং শক্তিশলী মনের পরিচায়ক। এ ধর্ম কোন অলভ্য আদর্শের কথা বলেন না; এতে বিশেষ শাস্ত্রীয় জটিলতা নাই, কোন গূঢ়-তত্ত্বের হেঁয়ালী নাই, কোন পাদ্রী-পুরোহিতের স্থান নাই—একের পর এক গদীনশীন হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কোন খাস বান্দা নাই।

কোরআন আল্লাহ্‌র কথা। কোরআনই আল্লাহ্‌র শেষ প্রত্যাদেশ। কোরআন হতে কিছু উদ্ধৃত করতে গেলেই মুসলমানেরা বলে ঃ 'আল্লাহ বলেন।' সমস্ত মোজেজার মধ্যে কোরআন শ্রেষ্ঠতম মোজেজা। সমস্ত মানুষ এবং জীন মিলিতভাবে চেষ্টা করেও এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে পারত না।

ইসলামের মতে ফেরেস্তাদের মধ্যে জিব্‌রাইলের স্থানই সবার উপরে। তিনিই ওহী বহন করে আনতেন। তিনি রুহুল কুদ্দুস এবং রুহুল আমিন (পবিত্র আত্মা—বিশ্বস্ত আত্মা)। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সংবাদবাহী হিসেবে জিবৃরাইল গ্রীক পৌরাণিক-কাহিনীর হারমিস-এর মত।

পাপ দুই রকমের হতে পারে—নৈতিক ও আনুষ্ঠানিক। সব চেয়ে খারাপ এবং অমার্জনীয় পাপ হচ্ছে শির্ক—কাউকে আল্লাহ্‌র শরীক বানানো। আল্লাহ্ এক নয়, বহু—এমন মতবাদকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন। মদনী সূরাগুলির মধ্যে একাদিক্রমে মুশরিক বা বহু-ঈশ্বর-বাদীদের শেষ বিচারের ভয় দেখানো হয়েছে। মনে হয়, হযরত মুহম্মদ (সঃ) 'কিতাবী লোকদের' অর্থাৎ খৃস্টান ও ইহুদীদের মুশরিক মনে করতেন না; যদিও মুফাসৃসির বা ভাষ্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ অন্য রকম মত পোষণ করে থাকেন।

কোরআনের সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী অংশে আলোচিত হচ্ছে ভবিষৎ জীবনের কথা। 'বিচারের দিন'—'পুনরুত্থানের দিন'—'মহাদিন'—'মহাক্ষণ'—'সেই অনিবার্য প্রভৃতি কথা মারফত ভবিষ্যৎ জীবনের বাস্তবতার উপর বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। কোরআনে ভবিষ্যৎ জীবন যেভাবে চিত্রিত হয়েছে—এর দৈহিক যাতনা, এর শারীরিক ভোগ—তাতে দেহের পুনরুত্থানেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

মুসলমানের ইবাদাতের কাজ বা তার ধর্মীয় কর্তব্যের কেন্দ্র হচ্ছে ইসলামের পঞ্চ-স্তম্ভ বা পাঁচ রোকন।

ইসলামের প্রথম রোকন হচ্ছে, বিশ্বাস ঘোষণা এবং এ বিশ্বাস ঘোষণার সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে, সেই মহান কলেমা : লা–ইলাহা ইল্লাহল্লাহ্ ঃ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্। মুসলমান পরিবারে নবজাত শিশুর কানে প্রথম যে কথা দেওয়া হয়, তা এ-ই; মহাযাত্রার পথেও এই শেষ কথাই তাকে শুনিয়ে দেওয়া হয়। আর, জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানে এরমত আর কোন কথাই সে এমন ঘন ঘন উচ্চারণ করে না। মুয়াজ্জিন দিনে অনেকবার মিনারে দাঁড়িয়ে আজান দেয় এবং প্রত্যেক বারই সে এই কলেমা উচ্চারণ করে। এই কলেমার মৌখিক ঘোষণাতেই মুসলমানেরা সাধারণতঃ খুশী। কোন অমুসলমান এই কলেমা গ্রহণ ও ঘোষণা করলেই সে নামতঃ মুসলমান হয়ে যায়।

মুমিন মুসলমানকে দিনে পাঁচবার—উষা কালে, দ্বিপ্রহরে, মধ্য-অপরাহ্নে, সূর্যাস্তে এবং রাত্রিতে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে হবে—এই তার ধর্মের বিধান। নামায ইসলামের দ্বিতীয় রোকন। নামাযের ওয়াক্তে মুসলিম-জগতের দিকে চাইলে দেখা যাবে, মক্কা হতে শুরু করে পৃথিবীর এক বিপুল এলাকায়—সিয়েরালিয়োঁ হতে ক্যান্টন এবং টোবলস্ক্ হতে কেপটাউন পর্যন্ত মুসলমান ছোট বড় জামাতে নামায-রত আছে।

নামায মুসলমানের আনুষ্ঠানিক ধর্ম। একই নিয়মে, দেহ একই রকমে অবনত করে সবাইকে নামায আদায় করতে হয়। মুসুল্লীকে প্রথমে ওজু করতে হয় এবং তারপর তার মাতৃভাষা যাই হোক না কেন, আরবীর মাধ্যমে ইবাদাত করতে হয়। নামাযের যে বাঁধা-ধরা গতানুগতিক রূপ, তাতে আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন যতখানি তার চেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ। ফাতিহা (প্রারম্ভিক সূরা) সহজ সরল কিন্তু অর্থ ও ভাব-গাম্ভীর্যে গরীয়ান একটি ছোট সূরা। মুমিন মুসলমান এ সূরাটি দিনে প্রায় বিশবার আবৃত্তি করে। রাত্রিতে যে নফল নামায পড়া হয়, তার সওয়াব দ্বিগুণ ঃ কারণ, তা স্বেচ্ছাকৃত অতিরিক্ত উপাসনা।

শুক্রবার দুপুরের নামায জামাতে পড়তে হয় এবং বালেগ সমস্ত পুরুষের জন্যই এ'নামায অবশ্য কর্তব্য। কোন কোন মসজিদে স্ত্রীলোকের জন্য আলাদা জায়গা থাকে। শুক্রবারের নামাযে একটা বৈশিষ্ট্য আছে —এ নামাযে ইমাম খোতবা (বক্তৃতা) দেন এবং খোতবায় রাষ্ট্রের অধিপতির মঙ্গলের জন্য দোওয়া করা হয়। এই নামাযের জামাতের সঙ্গে ইহুদীদের মন্দিরের উপাসনার মিল আছে। খৃষ্টানদের রবিবারের উপাসনা-পদ্ধতি পরবর্তী যুগে মুসলমানদের শুক্রবারের নামায-পদ্ধতিকে খানিকটা প্রভাবিত করে। মর্যাদা, সরলতা ও

শৃঙ্খলায় কোন রকম জামাতী উপাসনাই শুক্রবারের নামাযকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই। যখন মুসুল্লীরা মসজিদে আপনা-আপনি কাতারে কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং পরম ভক্তির সঙ্গে একান্তভাবে ইমামের অনুসরণ করে, তখন সে দেখবার এক দৃশ্য হয়। মরুভূমির গর্বিত অত্মা-সচেতন সন্তানদের উপর জামাতের নামাযের এ নিয়মানুবর্তিতা নিঃসন্দেহ রকমে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল ঃ জামাতের নামায তাদের শিখিয়েছিল সামাজিক সাম্য আর তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল এক মহান ঐক্যভাব। হযরত মুহম্মদ (সঃ) নীতি হিসেবে রক্তের সম্বন্ধের স্থানে মুসলিম-ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধকে স্থাপন করেছিলেন। জামাতী-নামায এই ভ্রাতৃ-ভাবকে কার্যতঃ পুষ্ট করেছে। নামাযের ময়দানই 'ইসলামের প্রথম ড্রিলের ময়দান।'

জাকাত ইসলামের তৃতীয় রোকন। জাকাত প্রথমে ছিল ভালবাসামূলক স্বেচ্ছাকৃত মহাপুণ্যের কাজ। পরে ইহা টাকা, উট, দুম্বা, শস্য, ফল এবং সওদাগরী চীজ প্রভৃতি সম্পত্তির উপর অবশ্য-দেয় কর হিসেবে ধার্য হয়। ইসলামের তরুণ রাষ্ট্রে উপযুক্ত কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে জাকাত আদায় করত। কেন্দ্রীয় খাজনা-খানায় জাকাতের টাকা জমা হত এবং সেখান হতে গরীবের সাহায্য, মসজিদ নির্মাণ এবং সরকার পরিচালন কাজে ব্যয়িত হত। প্লিনী বলেন ঃ দক্ষিণ আরবের সওদাগরগণকে বিক্রির আগে তাদের মশলার এক দশমাংশ তাদের দেবতাদের দিতে হত। জাকাতের মূলনীতি কতকটা ঐ রকম। জাকাতের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল; তবে সাধারণতঃ এর গড় ছিল শতকরা আড়াই। সৈন্যদের পেনশনও জাকাতের দায় হতে মুক্ত ছিল না। পরবর্তীকালে যখন খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবসান ঘটল, তখন জাকাত আদায় আবার মুসলমানদের বিবেকের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। জাকাত ইসলামের চতুর্থ রোকন।

পাপের কাফ্ফারা হিসেবে উপবাসের উল্লেখ কোরআনে অনেক বার আছে। উপবাস হিসেবে রমযানের উল্লেখ আছে মাত্র একবার। রমযান মাসে উষাকাল হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান ও আহার নিষিদ্ধ। রমযানের রোজা ভঙ্গ করার জন্য রাষ্ট্র বা জনসাধারণের পক্ষ হতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এমন নজীরের অভাব নাই। আইয়ামে জাহেলীয়াতে উপবাস করার প্রথা ছিল, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তবে উপবাস প্রথা খৃস্টান ও ইহুদী উভয় ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

হজ্ ইসলামের পঞ্চম এবং সর্বশেষ রোকন। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক সঙ্গতি-সম্পন্ন মুসলমানের পক্ষে জীবনে একবার মক্কায় হজে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। হজের নির্দিষ্ট সময়ের আগে হজযাত্রী সেলাইহীন কাপড় পরে

এহ্রাম বাঁধে। এহ্রামের সময় পবিত্র সময়। রমযানের সময় মুসলমানকে যে-সব কাজ পরহেজ করে চলতে হয়, এহরামের সময় তাছাড়া আরো কয়েকটি পরহেজ করতে হয়—যেমন, রক্তপাত না করা, শিকার না করা, গাছ তুলে না ফেলা এবং স্ত্রী সহবাস না করা। পবিত্র স্থানে তীর্থ করতে যাওয়ার প্রথা বহু প্রাচীনকাল হতে সেমিটিক জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের যুগ পর্যন্ত আমরা তার নজীর পাই। মূলে এর উদ্ভব হয়েছিল হয়তো সূর্য-পূজার পদ্ধতি হতে। শরৎকালে যখন দিন রাত সমান হত, সেই সময় এ পূজার অনুষ্ঠান হত ঃ অগ্নিময় সূর্যের কঠোর শাসনের এ ছিল বিদায় উৎসব, আর উর্বরতার বজ্রদেবতার ছিল এ আগমনী সম্বর্ধনা।

সেনেগাল, লাইবিরীয়া, নাইজিরীয়া হতে দলের পর দল হজ্‌যাত্রী মধ্য-আফ্রিকার বিভিন্ন পথে পূর্বদিকে চলেছে। যতই তারা এগিয়ে চলছে, ততই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে চলেছে হেঁটে, কেউ কেউ চলেছে উটের পিঠে। এদের বেশির ভাগই পুরুষ; কিছুসংখ্যক নারী এবং শিশুও সঙ্গে অছে। পথে পথে তারা বেচা-কিনি করে; ভিখ মাগে; অনেকে পথের ধারে পড়ে মরে—এরা শহীদের দরজা পায়। যারা বেঁচে থাকে, তারা অবশেষে লোহিত সাগরের কোন বন্দরে এসে হাজির হয়। সেখান হতে পার হয়ে এপারে আসে। কিন্তু প্রধান চারটি কাফেলা আসে— ইয়ামন, ইরাক, সিরিয়া ও মিসর হতে। এ চারটি দেশের প্রত্যেক দেশ আগে কাবা ঘরের গেলাফের জন্য মাহ্‌মিল-শরীফ পাঠাত। এ মাহ্‌মিল ছিল এসব দেশের ইজ্জতের পরিচায়ক। অত্যন্ত সুন্দররূপে সজ্জিত হাওদার ভিতর রেখে উটের পিঠে করে মাহ্‌মিল আনা হত। এ উটের পিঠে কেউ চড়ত না—উটকে লাগাম ধরে টেনে আনত। কিছুকাল হতে কেবল মিসর দেশই আগের মত ধুমধামে মাহ্‌মিল পাঠিয়ে আসছে।

গত দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়ে হজযাত্রীর সংখ্যা গড়ে ছিল ১ লাখ ৭২ হাজার। ১৯০৭ সালের তুর্কী সরকারী কাগজে হজযাত্রীর সংখ্যা পাওয়া যায় ২ লাখ ৮০ হাজার। ১৯৫৫ সালে সউদী সরকারের কাগজে এদের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৫০ হাজার। মালয় হতেই সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যাত্রী আসে। এদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। যুগ যুগান্তর হতে এই হজ্‌ প্রতিষ্ঠান মুসলিম-জগতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সবচেয়ে বড় শক্তিরূপে কাজ করে আসছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ্বাসীর মধ্যে এই-ই সাধারণ ঐক্যসূত্র। এই প্রতিষ্ঠান প্রায় প্রত্যেক সুস্থ-দেহ সঙ্গতি-সম্পন্ন মুসলমানকে জীবনে অন্ততঃ একবার দেশ-ভ্রমণ করতে বাধ্য করে। পৃথিবীর চার দিক হতে আগত এই হজ্‌-যাত্রীদের সমাবেশ হতে যে সামাজিকতার উন্মেষ হয়, তার মূল্য বিপুল। নিগ্রো, বার্বার,

চীনা, পারসিক, সিরিয়ান, তুর্ক, আরব — ছোট-বড়, ধনী-গরীব—ধর্মের এই উদার ময়দানে একত্র হয়, কথা-বার্তা বলে, ভ্রাতৃত্বের অনুশীলন করে। সমস্ত বিশ্ব-ধর্মের মধ্যে গোষ্ঠী, বর্ণ ও জাতির বিভেদ বাধা ভাঙ্গতে ইসলামই সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করেছে বলে মনে হয়—অন্ততঃ এর নিজ সমাজের সীমার মধ্যে। বিভেদ রেখা টানা হয়, কেবল মুসলমান ও বাকী বিশ্ববাসীর মধ্যে। হজের এই সব জামাত এ উদ্দেশ্য সাধনে নিঃসন্দেহরকমে সাহায্য করেছে। যেসব দেশে যাতায়াতের আধুনিক পথ-ঘাট কিছুই নাই, সংবাদ-পত্রের প্রভাব যেখানে এখনো অত্যন্ত অল্প, সে-সব দেশের লোকও হজে আসে। হজের এই সুযোগে তাদের মধ্যে মাজহাবী মতবাদ প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে।

মুসলমানদের মধ্যে অন্ততঃ একটি সম্প্রদায়—খারেজীরা—জেহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ রোকনের মর্যাদা দান করেছে। দারুল ইসলাম হতে দারুল-হরবের সীমা রেখাকে দূর হতে দূরতর স্থানে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকা খলীফার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিছুকাল হতে মুসলিম-জগতে জেহাদী জোশ কমে গেছে। ইদানীং কোন কোন অমুসলমান শাসনে ইসলাম যথেষ্ট উন্নতি করেছে—হয় অত্যন্ত প্রবল বলে সে অমুসলমান-শক্তির উৎখাত করা সম্ভব হয় নাই, অথবা সে শক্তি অত্যন্ত উদার বলে তার উৎখাতের চেষ্টা সঙ্গত মনে করা হয় নাই। শেষ জেহাদ ঘোষণা করেন—১৯১৪ সালে—তুর্ক সুলতান খলীফা মুহম্মদ রাশাদ। কিন্তু তাঁর সে আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় নাই। একজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ গ্রন্থকার এই উপলক্ষে 'জার্মানীতে জেহাদ' নামে একখানা বইও লেখেন।

জীবনে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তক্‌দীরের বিশ্বাস (৯ ঃ ৫১ ; ৩ ঃ ১৩৯; ৩৫ : ২) ইসলাম সম্পর্কে অন্যতম বড় কথা। এই বিশ্বাস যুগে যুগে মুসলমানের চিন্তা ও ব্যবহারে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এ জীবনে ভাল মন্দ যা কিছু ঘটে, সবই সম্পূর্ণ রূকমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ঘটে এবং তা আগে হতেই অনিবার্য-রূপে নির্দিষ্ট হয়ে আ ছ। তক্‌দীরে বিশ্বাস ইসলামের এক বড় শক্তি। এই বিশ্বাসই আবার ইসলামের দুর্বলতার এক বড় কারণ।

এই ধর্মীয় কর্তব্যগুলিই ইসলামের মূলকথা। কোরআন কেবল এই কয়টিরই বিধান করেছে, এমন নয়। তবে এইগুলিই ইমানদারের কার্যক্রমের কষ্টি-পাথর।

অভিযান-পথে ইসলাম

মধ্যযুগের প্রথমভাগে দুইটি বিরাট ঘটনা লক্ষীভূত হয়। একটি হচ্ছে, টিউটন জাতির দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র গমন—যার ফলে প্রাচীন রোমক-সাম্রাজ্যে ফাটল ধরে। অন্যটি হচ্ছে, আরব জাতির বিজয় অভিযান। এ অভিযানের ফলে একদিকে পারস্য-সাম্রাজ্য খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, অন্যদিকে বাইজেন্টাইন শক্তির ভিত্তি-মূল পর্যন্ত কেঁপে উঠল। যদি খৃষ্টীয় সপ্তম শব্দাব্দীর প্রথম-তৃতীয়াংশে কোন দুঃসাহসী ভবিষ্যদ্বক্তা ঘোষণা করত যে, অল্লাধিক একযুগ-কাল মধ্যে এতকালের এই অল্প পরিচিত বর্বর আরবের বুক হতে এক অপূর্ব শক্তি উদ্ভূত হয়ে তৎকালীন জগতের দুইটি প্রধান সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠবে এবং পরিণামে সে শক্তি সাসানীয় সাম্রাজ্যের হবে উত্তরাধিকারী আর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য হতে তার শস্য-শ্যামল অঞ্চলগুলি কেড়ে নিবে, তবে নিঃসন্দেহে সবাই তাকে পাগল বলত। অথচ ঠিক এই-ই ঘটেছিল।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) মৃতুর পর যেন কোন যাদু-মন্ত্র বলে উষর আরব হয়ে উঠল — বীরদের সূতিকাগার ঃ সেও এমন বীর—সংখ্যা ও দক্ষতায় যাদের সমকক্ষ অন্যত্র পাওয়া ছিল দুষ্কর। ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরের বুকে খালিদ-বিন-ওয়ালীদ এবং আমর ইব্‌নুল আস যে অসাধারণ রণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজয় অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আলেকজান্ডার, হানিবল বা নেপোলিয়নের রণ-চাতুর্যের তুলনায় তা কোন অংশেই হীন নয়।

বাইজেন্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্য এ সময় সত্যই হীনবল হয়ে পড়েছিল। বহুকাল পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে মত্ত ছিল। যুদ্ধের রসদ জোগানোর জন্যে উভয় রাজ্যেই কর-ভার বৃদ্ধি হয়েছিল। ক্রমবর্ধিত কর-ভারে নিপীড়িত প্রজামণ্ডলীর মনে রাজ-ভক্তি ক্রমে শিথিল হয়ে পড়েছিল। আরব জাতির একাংশ আগেই সিরিয়া ও মেসোপটেমীয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। খৃষ্টান ধর্মে দলাদলির অন্ত ছিল না; ধর্মের নামে অহরহ অত্যাচার হত। এই সব

অবস্থা মিলে আরব জাতির বিজয় অভিযানকে অমন অপূর্ব সাফল্য-মণ্ডিত করেছিল। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সিমাইট ও মিসরের হেমাইট বংশীয় বাসিন্দাগণ তাদের ঘৃণ্য, জালিম পরদেশী প্রভুদের চেয়ে নবাগত আরবগণকে রক্তের দিক দিয়ে নিকটতর জ্ঞাতি মনে করত। বাস্তবিক, মুসলিম-বিজয় দ্বারা প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য তার পূর্ব-প্রভুত্বই পুনরুদ্ধার করেছিল। ইসলামের প্রেরণায় মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল এবং হাজার বছরব্যাপী পাশ্চাত্য অধীনতায় থাকার পর পুনরায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ ছাড়া, তাদের নব বিজেতারা যে খাজনা ধার্য করেছিল, পরিমাণে তা তাদের পূর্ব-প্রভুদের চেয়ে কম ছিল; আর তারা এ নব-বিধানের অধীনে অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ধর্ম ও আচার পালন করতে পারত। আরবগণ নিজেরা এক নব- জীবনের স্পন্দনে উদ্বেলিত ছিল ঃ বিজয় লাভের জন্য তাদের সংকল্প ছিল অটল। আর তাদের নতুন ধর্ম তাদের যে শিক্ষা দিয়েছিল, তার ফলে তারা মৃত্যুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অসম সাহসী হয়ে উঠেছিল।

আরবদের এই যে অত্যদ্ভুত সাফল্য, এর এক মস্ত কারণ ছিল তাদের বিশিষ্ট রণকৌশল। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বৃক্ষহীন সমতল প্রান্তরের জন্য এই রণ-নীতি বিশেষ উপযোগী ছিল। এ রণ-নীতির মূলকথা ছিল, যুদ্ধে অশ্ব-বাহিনী ও উট-বাহিনী ব্যবহার। এ কাজে রোমকরা কোন কালেই দক্ষতা অর্জন করে নাই। সৈন্যদলকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হত কেন্দ্র, দুই বাহু, অগ্ররক্ষী ও পশ্চাৎরক্ষী। অশ্বারোহীরা দাঁড়াত দুই বাহুতে। সৈন্য-সংস্থাপন ব্যাপারে কওমী ঐক্য রক্ষা করা হত। প্রত্যেক কওমের স্বতন্ত্র ঝাণ্ডা ঃ বর্শার আগায় একখণ্ড কাপড়। কওমের যে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা, সে-ই এ পতাকা বহন করত। শোনা যায়, মহানবীর পতাকায় ঈগল-চিহ্ন ছিল। পদাতিকরা প্রধানতঃ তীর, ধনুক ও ফিঙ্গা ব্যবহার করত; কখনো-বা তারা ঢাল-তলোয়ারও ব্যবহার করত। বর্শার ব্যবহার প্রবর্তিত হয় পরে —আবিসিনীয়া হতে। অশ্বারোহীদের প্রধান অস্ত্র ছিল বর্শা; তার সঙ্গে থাকত তীর আর ধনুক ঃ এই মিলে ছিল তাদের জাতীয় অস্ত্র। জেরা ও ঢাল ছিল এদের বর্ম। বাইজেন্টাইনদের বর্মের চেয়ে এ বর্ম ওজনে হালকা ছিল।

প্রাচীনকালের রীতি মোতাবেক ময়দানে সৈন্যরা সারিবদ্ধ অবস্থায় ঘন হয়ে দাঁড়াত। আসল লড়াই শুরু হওয়ার আগে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হত। বিশেষ বিশেষ যোদ্ধারা দল ছেড়ে ময়দানের মাঝখানে এসে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করত। পারসিক বা বাইজেন্টাইন উভয় রাজ্যের যোদ্ধাদের চেয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের মাসোহারার হার উচ্চতর ছিল। এ ছাড়া তারা গণিমতে হিস্যা পেত। লড়াই

আল্লাহ্‌র চোখে মহত্তম পেশা ছিল তো বটেই, তাছাড়া ইহা সবচেয়ে লাভজনক পেশাও ছিল। মুসলিম আরব-বাহিনীর শক্তির উৎস তাদের উন্নততর অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না, দৃঢ়তার সংগঠন প্রণালীও ছিল না; তাদের সে শক্তির উৎসমূলে ছিল তাদের অটল আত্মবিশ্বাস। আর এই আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছিল তাদের দুর্জয় ঈমান। মরু-জীবন সুলভ অপূর্ব সহনশক্তি এবং উটের সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুত চলাচল—এ দুটিও তাদের শক্তির অন্যতম কারণ ছিল।

আরব ঐতিহাসিকেরা ইসলামের অগ্রগমণকে প্রধানতঃ ধর্মীয় ব্যাপার হিসেবেই বিচার করেছেন। এর পেছনে যে-সব অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় ছিল, তার উপর তাঁরা মোটেই জোর দেন নাই। অন্যপক্ষে, অনেক খৃস্টান লেখক এক অবিশ্বাস্য কাহিনী প্রচার করে বলেছেন যে, আরবীয় বিজেতারা বিজিতদের সামনে তুলে ধরতেন দুই বস্তু—হয় কোরআন, না হয় কৃপাণ। আরব উপদ্বীপের বাইরে—বিশেষ করে ইহুদী ও খৃস্টানদের বেলায়, বিজেতাদের পক্ষ হতে আরো একটি লাভজনক পথ খুলে দেবার ছিল এবং সেটি হল—খাজনা। 'যুদ্ধ কর...কিতাবীদের সঙ্গে, যে পর্যন্ত তারা নতমস্তকে স্ব-হস্তে খাজনা দেয় (৯ ঃ ২৯)'। আরব যোদ্ধাদের ইসলাম একটি যুদ্ধ-ধ্বনি দিয়েছিল, এ কথাও সত্য। যে বিচ্ছিন্ন জনগণ ইতিপূর্বে কোন কালে ঐক্যবদ্ধ হয় নাই, ইসলাম তাদের ঐক্য দান করেছিল। তাদের অদ্ভূত প্রাণ–শক্তিও অনেকাংশে ইসলামেরই অবদান ছিল। কিন্তু ইসলামের বিজয়াবলীর কারণ নির্ণয়ের জন্য এসব অবস্থা যথেষ্ট নয়। বিজয়ী-বাহিনীর বেশীর ভাগ সৈন্যই বেদুঈন সমাজ হতে সংগৃহীত হত। বেদুঈনদের আর্থিক দুর্গতির অন্ত ছিল না। কাজেই বেদুঈন যোদ্ধাদল যে দিগ্বিজয়ে বের হত,. তার কারণ ধর্মোন্মত্ততা ছিল না; তার কারণ ছিল, তাদের ঊষর বাসভূমির ওপারের উত্তর অঞ্চলের শস্য-শ্যামলা ভূমি অধিকারের অর্থনৈতিক তাগিদ। বেহেশ্‌তের স্বপ্ন অনেক যোদ্ধাকে নিঃসন্দেহ রকমে অনুপ্রাণিত করেছিল; কিন্তু সভ্যতায় অগ্রসর সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের বিলাস-বৈভবের আকাঙ্ক্ষাও বহুজনকে প্রলুব্ধ করেছিল। যুগ যুদান্তর হতে মরুর ঊষর-বক্ষ নির্গত বুভুক্ষ জনগণ ধীরে ধীরে তাদের পার্শ্বস্থ 'উর্বর-হেলাল' অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইসলামের বিস্তার উপলক্ষে সিমাইটদের দেশান্তর গমনের শেষ পর্যায় এভাবে পূর্ণ হল।

এ আমলের ঐতিহাসিকেরা কেউই ইসলামের বিজয় সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে স্বাধীনভাবে বিচার করেন নাই—তাঁদের পরবর্তী বিকাশের আলোকে বিচার করেছেন। তাঁরা বলতে চান, বিজয়ের অভিযানগুলি খোলাফা-এ রাশেদীন—

বিশেষ করে আবু বকর ও ওমরের সুচিন্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত হয়েছিল। যাঁদের কার্যকালে বিরাট ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, তাঁরা সে ঘটনাবলীর প্রবাহ-পথ পূর্ব হতেই সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, এরূপ নজীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইসলামের প্রভাবে এ সময়ে আরবে অন্তর্বিরোধ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, এই অবরুদ্ধ সংগ্রাম স্পৃহার বহির্পথ হিসেবেই আক্রমণ-অভিযানগুলির প্রথম আরম্ভ হয়। এ সব আক্রমণের উদ্দেশ্য অধিকাংশ স্থলেই ছিল লুণ্ঠন, স্থায়ী রাজ্য স্থাপন নয়। কিন্তু লুণ্ঠনের মতলবে যারা এসব অভিযান শুরু করেছিল, কিছুকাল পর এসব অভিযান তাদের নাগালের বাইরে চলে গেল। যোদ্ধারা বিজয়ের পর বিজয় লাভ করে চল্ল; তাদের অভিযানেরও শক্তি ও মর্যাদা বাড়তে শুরু করল। এই সময় হতে আরম্ভ হল সুসংবদ্ধ বিজয় অভিযান এবং এর অনিবার্য ফল হিসেবে আরব-সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটল। সুতরাং, আরব-সাম্রাজ্য কোন সুপরিকল্পিত বিজয় অভিযানের ফল নয়; ইহা উপস্থিত অবস্থাবলীর কার্য-কারণ ঘটিত অনিবার্য পরিণতি।

ইহুদী ঐতিহাসিকেরা দাবী করেছেন যে, ইহুদীদের শক্তির বিকাশ ও বিস্তার ওল্ড্ টেস্টামেন্টের বাণী মোতাবেকই সংঘটিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় খৃস্টান দার্শনিকেরাও অনুরূপ দাবী করেছেন। ইসলামের শাস্ত্রবিদগণেরও কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার বিধাতার ইচ্ছা অনুসারেই হয়েছে। (এ দাবীর ভিত্তিতে ভাষাগত ভুল আছে)। 'ইসলাম' এই শব্দকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা চলে : মূলতঃ ইসলাম ধর্ম, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র, সবশেষে ইসলামী তমদ্দুন। ইসলাম ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্মের পথে চলে নাই (খৃস্টান ধর্মের মত ইসলাম প্রচারমূলক ধর্ম হয়ে ওঠে)। পরে ইসলাম রাষ্ট্র গড়ে তোলে। যে ইসলাম উত্তর দেশসমূহ জয় করে, সে ইসলাম আসলে ইসলাম ধর্ম নয়, ইসলামী রাষ্ট্র। একটি জাতীয় ধর্ম-রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে আরবরা অতর্কিতভাবে পার্শ্ববর্তী পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা প্রথম যে বিজয় লাভ করে, কারও কারও মতে সে ছিল আরব জাতির বিজয়—ইসলামের বিজয় নয়। ইসলামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর আগে সিরিয়া, মেসোপটেমীয়া ও পারস্যের অধিকাংশ বাসিন্দাই ইসলাম গ্রহণ করে নাই। এসব রাজ্যের সামরিক বিজয়ের অনেককাল পর বাসিন্দারা মুহম্মদের (সঃ) ধর্ম অবলম্বন করে। আর যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তারা ইসলাম ধর্মের মায়ায় যতখানি আকৃষ্ট হল, তার চেয়ে অনেক বেশি আকৃষ্ট হল জিজীয়ার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে শাসক শ্রেণীর গণ্ডীভূত হওয়ার জন্য। তারপর আসছে, তমদ্দুন হিসেবে ইসলামের কথা। সামরিক বিজয়ের পর ধীরে ধীরে ইসলামী তমদ্দুনের

উদ্ভব হয় এবং ইসলামের পূর্বগামী সিরীয়-আরমেনীয়, পারসিক ও গ্রীক তমদ্দুনের আংশিক ভিত্তির উপর এ' নব তমদ্দুন গড়ে ওঠে। ইসলামের সাহায্যে নিকট-প্রাচ্য কেবল যে তার হৃত-রাজনৈতিক শাসনাধিকার ফিরে পেল এমন নয়, তমদ্দুনের ক্ষেত্রেও তার সুমহান প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা পুনঃস্থাপন করল।

কিন্তু বাইরের দেশ জয় করার আগে আরবের নিজস্ব সংহতির প্রয়োজন ছিল। এই ঐক্য-বিধানের পথের সন্ধানকালে উত্থাপিত হল মহানবীর উত্তরাধিকার অর্থাৎ খিলাফত সমস্যা।

মহানবী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি পয়গম্বর, আইনের বিধানকর্তা, ধর্মীয় ইমাম, প্রধান কাজী, সেনাপতি এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু আজ মুহম্মদ (সঃ) বেঁচে নাই। পয়গম্বরীর কাজ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা হবেন? গয়গম্বর হিসেবে তিনি ইসলামের শেষ বাণী দিয়ে গিয়েছেন। কাজেই সে পদে কারো অধিষ্ঠিত হওয়ার কথাই ওঠে না।

মহানবী কোন পুরুষ-সন্তান রেখে যান নাই। তাঁর ওফাতের পর বেঁচেছিলেন তাঁর একমাত্র কন্যা—ফাতিমা। আলীর সহধর্মিণী। কিন্তু আরবে শেখ বা আমীরের পদ বরাবর ঠিক উত্তরাধিকার-সূত্রে পরিচালিত হয় নাই; এ-পদ প্রধানতঃ নির্বাচনের উপর নির্ভর করত এবং কওমের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সাধারণতঃ তাঁরই ইহা প্রাপ্য ছিল। কাজেই মহানবীর পুত্র-সন্তানেরা তাঁর আগে মারা না গেলেও সমস্যার স্বতঃস্ফূর্ত সমাধান হত না। মুহম্মদ (সঃ) নিজে তাঁর উত্তরাধিকারীর কথা কিছুই স্পষ্ট করে বলে যান নাই। কাজেই খিলাফতের সমস্যা মুসলিম-জগতের প্রাচীনতম সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। আজো এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। সুলতানের শাসন-ব্যবস্থা বাতিলের ষোল মাস পর ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কামালপন্থী তুর্করা ওসমানীয় খলীফার পদ তুলে দিল। এ সময় দ্বিতীয় আবদুল মজীদ ইস্তাম্বুলে খলীফার পদে আসীন ছিলেন। এরপর কায়রো ও ইস্তাম্বুলে একাধিক প্যান-ইসলামী সম্মেলন হয়ে গেছে—মহানবীর সত্যিকার উত্তরাধিকারী কে, তার নির্ণয়ের জন্যে কিন্তু কোনও ফায়দা হয় নাই। 'খিলাফতের মত ইসলামের কোন ধর্মীয় সমস্যাই এত রক্তপাত ঘটায় নাই।'

জনসাধারণের নির্ধারণের জন্য কোন গুরুতর সমস্যা তাদের সামনে ছেড়ে দিলে তক্ষুণি কতকগুলি পরস্পর বিরোধীদলের আবির্ভাব ঘটে থাকে। মহানবীর ইন্তিকালের পরও তা-ই ঘটল। মুহাজিররা মিলে এক দল গঠন করল। তারা দাবী পেশ করল যে, তারা মহানবীর কওমের মানুষ এবং তারাই প্রথম ইসলাম কবুল করে। মদীনার আন্‌সারেরা গঠন করল অন্য দল। তারা দাবী পেশ করল

যে, তারা মহানবী ও শিশু ইসলামকে আশ্রয় দিয়েছিল। এরপর এ দুইদল মিলে হল সাহাবীদল। তারপর এল আর এক দল। তারা যুক্তি পেশ করল যে, আল্লাহ ও মহানবী মুসলিম-সমাজকে নির্বাচনের খামখেয়ালীর উপর ছেড়ে দিতে পারেন না; কাজেই মহানবী নিশ্চয় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এ নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করে গেছেন। আর এই মনোনীত উত্তরাধিকারী আলী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। কারণ, আলী মহানবীর আপন চাচাতো ভাই, আর তাঁর একমাত্র জীবিত কন্যার স্বামী এবং সর্বপ্রথম যে দুই বা তিন জন ইসলাম কবুল করেন, তাঁদের অন্যতম। এ দল দাবী করল যে, তাদের শাসন-শক্তি পরিচালনার অধিকার বিধি-দত্ত-নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল নয়। সর্বশেষে দাবী নিয়ে হাজির হল কোরায়েশের অভিজাত দল— উমাইয়ারা। ইসলামের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত আগে এদেরই হাতে ছিল শাসন-কর্তৃত্ব, শক্তি ও সম্পদ। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সবার শেষে; কিন্তু এ মুহূর্তে তারাও মহানবীর উত্তরাধিকার পদ দাবী করে বসল।

প্রথম দলই জয়লাভ করল। হযরত আবুবকর (রাঃ) বয়সে প্রবীণ, স্বভাবে ধর্মনিষ্ঠ, সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারীদের এ জন এবং মহানবীর অন্যতম শ্বশুর—উপস্থিত প্রধানেরা তাঁরই হাত ধরে বয়েত গ্রহণ করল। খোলাফা-এ-রাশেদীনের মধ্যে আবুবকরই সর্বপ্রথম খলীফা। অবশিষ্ট তিন খলীফা হলেন, পর্যায়ক্রমে ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ)। তখনো মহানবীর জীবনের মহান প্রভাব খলীফাদের চিন্তা ও কাজের উপর সক্রিয় ছিল। এ চারজন খলীফাই পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং আত্মীয় ছিলেন। নবীন রাষ্ট্রে নবীন রাজধানী হল মদীনা।

আরব ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেজাজের বাইরের সমস্ত আরব নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বন্ধন হতে সরে পড়ল। প্রকৃত কথা হল এই যে, আরবে রাস্তা-ঘাটের ছিল নিতান্ত অভাব, সুশৃঙ্খলভাবে ধর্ম-প্রচারের কোনই ব্যবস্থা ছিল না—তারপর মহানবী প্রচারের সময়ও পেয়েছিলেন অল্প। ফলে মহানবীর জীবন-কালে আরব উপদ্বীপের এক তৃতীয়াশের বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করে নাই, আর তাঁর শাসন-প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। হেজাজ ছিল তাঁর প্রধান কর্ম-কেন্দ্র। হেজাজের লোকেরাও তাঁর ইন্তিকালের মাত্র এক কি দুই বৎসর আগে ইসলাম কবুল করে।

নতুন রাষ্ট্র হতে যারা সরে পড়েছিল—কয়েকটি ছোট কিন্তু তীব্র যুদ্ধ দ্বারা আবুবকর (রাঃ) তাদের ফিরে আসতে বাধ্য করলেন। খালিদ-বিন-ওলীদ এসব যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ইসলাম সুসংহত হয়ে নব অভিযানের জন্য তৈরি হল।

এ অভিযান পথে প্রথম পড়ল সিরিয়া। বাইজেন্টাইনরা রোমক ও আলেকজান্ডারের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রায় হাজার বছর যাবত এই অঞ্চল শাসন করে আসছিল। আরবরা এই সময় মাঝে মাঝে সিরিয়ার সীমান্ত পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিল। এরা সাময়িক লুণ্ঠনকারী ছাড়া আর কিছু হতে পারে, বাইজেন্টাইন সেনাপতিরা তা' কল্পনাও করে নাই। কিন্তু অচিরেই তারা দেখতে পেল যে, তাদের দুশমনেরা এক নব বলে উদ্দীপ্ত আর তাদের আয়ত্তে রয়েছে এক মারাত্মক অস্ত্র—উন্নততর চলাচল ব্যবস্থা। আরবের উট সামরিক ক্ষেত্রে এক দুর্বার-শক্তিরূপে আবির্ভূত হল। বাইজেন্টাইন সৈন্যরা সিরিয়ায় আরব যোদ্ধাগণকে পিষে মারার উপক্রম করছিল। 'আল্লাহ্‌র তলোয়ার' (সায়ফুল্লাহ্) খালিদের উপর হুকুম হল, এদের সাহায্য করার জন্যে। খালিদ ইরাকের দক্ষিণ ভাগ হতে তক্ষুণি তাঁর সুদক্ষ উট-বাহিনী সহ পথহীন মরুভূমির ভিতর দিয়ে অশ্রান্ত-গতিতে সিরিয়ার দিকে ছুটলেন এবং একান্ত আকস্মিকভাবে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকট আবির্ভূত হলেন। সৈন্যদের জন্য পানি মশকে ভরে সঙ্গে নেওয়া হল। কিন্তু সঙ্গীয় ঘোড়ার জন্য পানির অন্য ব্যবস্থা হল। বুড়ো উটগুলি জবে করে সৈন্যরা তার গোশ্‌ত খেত, আর সে উটের পেটের পানি ঘোড়াকে খেতে দেওয়া হত। এর দুই হফ্‌তা পর সমস্ত আরব বাহিনীকে তাঁর নিজ নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ করে খালিদ দামেস্কের দুয়ারে হাজির হলেন।

অতি প্রাচীনকাল হতে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, দামেস্ক এ-দুনিয়ার সবচেয়ে পুরোনো শহর। এই দামেস্কের দেয়াল হতে সেই স্মরণীয় 'পলায়ন-নিশীথে' পল্‌কে ঝুড়িতে ভরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অল্পকাল মধ্যেই দামেস্কের মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার সময় আসন্ন হয়ে উঠল। ছয় মাস অবরোধের পর দামেস্ক আত্মসমর্পণ করল। বিজয়ীদের দৃপ্ত পদক্ষেপের সম্মুখে অন্যান্য নগরও তাসের ঘরের মত ধসে পড়ল। আর একটি লড়াই তখনো লড়বার বাকী ছিল। পূর্ব-সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হিরাক্লিয়াস আরবদের মোকাবিলার জন্য ৫০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। জর্দানের উপনদী ইয়ারমুকের উপত্যকায় খালিদ ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ৬৩৬ খৃস্টাব্দে ২০ আগস্ট হিরাক্লিয়াসের সৈন্যের সম্মুখীন হলেন। দিনটি ছিল অত্যন্ত গরম আর ভীষণতম দুর্যোগপূর্ণ। ঝাপটা-বাতাস সেই উপত্যকা হতে ধূলি উড়িয়ে নিয়ে আকাশময় ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আরব সেনাপতি নিতান্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই এই দিনটি বেছে নিয়েছিলেন মনে হয়। বাইজেন্টাইন সেনাপতিরা তাঁদের সঙ্গে পাদ্রী-পুরোহিত নিয়ে এসেছিলেন; তাঁরা ক্রুশ উঁচু করে ধরে বাইবেল হতে বাছা বাছা শ্লোক ও মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্দম মরু সন্তানদের নির্মম আক্রমণের সামনে কিছুই

টিকল না; বাইজেন্টাইনরা ভীষণভাবে পরাজিত হল। তাদের আহত ও নিহতরা ময়দানের বুক ছেয়ে ফেলল। অতঃপর আর কোন বাধা-বিপত্তি আরব-বাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হল না। তাদের দুর্নিবার গতি সিরিয়ার উত্তরতম সীমা টরস পর্বতের পাদমূলে গিয়ে প্রহত হল।

তৎকালীন জগতের শ্রেষ্ঠতম শক্তির নিকট হতে এত দ্রুত এবং এত সহজে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি অধিকার করে নেওয়ায় দুনিয়ার চোখে এ নব-গঠিত রাষ্ট্রের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেল। আর তারো চেয়ে বড় কথা এই যে, নবীন রাষ্ট্র তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নির্ভয় হয়ে উঠল। সিরিয়াকে অবলম্বন করে অতঃপর আরমেনীয়া, উত্তর মেসোপটেমীয়া, জর্জীয় ও আজারবাইজানের উপর হামলা করা সম্ভব হয়ে পড়ল। এখান হতেই পরবর্তীকালে এশিয়া মাইনরে বহু অভিযান পরিচালিত হয়।

এরপর আল্লাহর যোদ্ধারা যখন পারস্যের দিকে ফিরে দাঁড়াল, তখন সেই একই দুর্দম-সাহস ও রণ-কৌশল বলে তারা বিজয়ের পর বিজয় লাভ করতে লাগল। ৬৩৭ খৃস্টাব্দে এক বিরাট সাসানীয় সৈন্যদল বালির তুফান দেখে পালিয়ে গেল; ফলে তাইগ্রীস নদীর পশ্চিমদিকস্থ ইরাকে সমগ্র নিম্ন-ভূভাগ আরব-হামলার মুখে এসে পড়ল। তাদের স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে মুসলিম-বাহিনী এগিয়ে চল্ল এবং একটিও সৈন্য-ক্ষয় না করে তারা বন্যা-স্ফীত তাইগ্রীসের এক সুবিধাজনক স্থান দিয়ে পার হয়ে গেল। সিরিয়ার বাসিন্দাদের মত ইরাকের বাসিন্দারাও আক্রমণকারীগণকে সাদর অভ্যর্থনার সঙ্গে গ্রহণ করল। ইরাক, সিরিয়া উভয় দেশের বাসিন্দারাই তাদের শাসক-গোষ্ঠীকে পর মনে করত এবং ঘৃণার চোখে দেখত। গ্রীক ও পারসিক প্রভুরা তাদের তমদ্দুন উপর হতে জোর করে প্রজা-সাধারণের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু দেশের জনসাধারণ কোনদিনই সে সংস্কৃতিকে আপন বলে আত্মস্থ করে নাই। পারস্যের সম্রাট ও তাঁর সৈন্যদল বিনা যুদ্ধে তাদের রাজধানী টিসিফন ছেড়ে পালিয়ে গেল। বিজয় মুসলিম-বাহিনী বিজয়-গৌরবে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে প্রবেশ করল। সম্রাটের পলায়িত অবস্থায় তাঁর শাহী-মুকুটের জহরতের লোভে তাঁর এক প্রজা তাঁকে নিহত করে। বারোশ' বছরকাল পর্যন্ত যে শাহী-বংশ মহাপরাক্রমে পারস্য-সাম্রাজ্য শাসন করে, এইরূপে তার শেষ নরপতি জীবনাবসান ঘটে। পরবর্তী আটশ' বছরের মধ্যে আর এ-সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে নাই।

ঊষর আরবের সন্তানেরা এই প্রথম বিলাস ও আরামের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এল। বিশাল শাহী মন্‌জিল, বিরাট দরবার কক্ষ, অপূর্ব-সুন্দর তোরণ-সমূহ, সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে-ভরা মনোহারী প্রাসাদ-সমূহ আর মনোরম দ্রব্য-সামগ্রী-

আরব উপদ্বীপের কাদার-মাটির কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে কি অচিন্তনীয় পার্থক্য। আরবদের শিক্ষা শুরু হল এবং এমন অবস্থায় অনেক সময় যেমন ঘটে থাকে, এ ক্ষেত্রেও মাঝে-মাঝে তেমনি খানিকটা কৌতুক এবং রস-সৃষ্টি হতে লাগল। কর্পূর এরা আগে কখনো দেখে নাই; দুই-চার জনে রান্নায় কর্পূর ব্যবহার করে বসল। একটি সৈন্যের ভাগে একজন আমীরের কন্যা পড়েছিল। সে কন্যাটিকে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করল। একজন বল্ল—'এত অল্প দামে এই সুন্দরী মেয়েটাকে ছাড়লে? সৈন্যটি বল্ল—'এক হাজারের উপর যে আরো সংখ্যা আছে, তা আমার মোটেই জানা ছিল না।'

ইরাকের সীমা পার হয়ে পারস্যের ভিতরে প্রবেশ করে কিন্তু আরব-বাহিনী অনেক বেশি কঠিন বাধার সম্মুখীন হল এবং বিজয় সম্পূর্ণ করতে তাদের আরো বারো বছরব্যাপী যুদ্ধ করতে হয়েছিল। পারসিক্‌রা সিমাইট নয়—তারা আর্য। তাদের সুসংবদ্ধ সামরিক শক্তি ছিল এবং চারশ' বছর-কাল পর্যন্ত তারা রোমকদের সঙ্গে তলোয়ার-বাজী করেছে। কিন্তু পরিণামে আরব-অভিযানের সম্মুখে এ শক্তিও টিকতে পারল না। ৬৪৩ খৃস্টাব্দে আরবরা পাক-ভারতের সীমান্তে এসে হাজির হল।

প্রাচ্যে যেমন এই বিজয়-বাহিনী দুর্বার-বেগে অগ্রসর হচ্ছিল, প্রতীচ্যেও তেমনি মুসলমানদের বিজয়-তরঙ্গ সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল। সামরিক দিক দিয়ে মিসরে অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিরিয়া ও হেজাজের ছিল এ বিপজ্জনকভাবে নিকটবর্তী। এর ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বরা; ফলে মিসর ছিল কন্সট্যান্‌টিনোপলের (ইস্তাম্বুল) শস্য-ভাণ্ডর। মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া বাইজেন্টাইন নৌ-বাহিনীর এক মস্ত ঘাঁটি ছিল। আর উত্তর আফ্রিকার বাকী অংশের জন্য মিসর ছিল প্রবেশ-দ্বার। এই সব বিবেচনায় নীলনদের উপত্যকার উপর অনেককাল আগেই মুসলমানদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল। সেনাপতি আমর-ইবনুল-আস তাঁর বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী খালিদকে নিজ বিজয় ঝলকে নিষ্প্রভ করে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ৬৩৯ খৃস্টাব্দে ৪ হাজার অশ্বারোহী সহ ফিলিস্তিন হতে সেই বহু-বিশ্রুত পুরাতন উপকূল-পথে যাত্রা করলেন যে পথে তাঁর আগে পদাঙ্ক রেখে গেছেন হযরত ইব্রাহীম, ক্যামবিসেস, আলেকজান্ডার, এন্‌টিওকাস, "পবিত্র পরিবার" এবং তারপরে এ-পথে যাত্রা করেন নেপোলিয়ন ও এলেনবী। এ ছিল প্রাচীন জগতের আন্তর্জাতিক রাজ-পথ।

আবার সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঃ পরাজয়, অবরোধ, বিজয় হুঙ্কার—আল্লাহু আক্‌বর। এইবার মিসরের ব্যাবিলনের পতন ঘটল।

ইতিমধ্যে আরব হতে নতুন নতুন সৈন্য এসে যোগ দিল। একদিন প্রভাতে ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে আমর চেয়ে দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দুর্ভেদ্য দেয়াল ও

প্রাসাদ-বেষ্টিত মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া। তার একদিকে উঠেছে গগণ-স্পর্শী সিরাপিয়াম ঃ এককালে এরই মধ্যে অবস্থিত ছিল সিরাপিস মন্দির আর আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিশাল লাইব্রেরী। অন্যদিকে উঠেছে সেন্টমার্কের সুদৃশ্য গীর্জা ঃ এককালে এই-ই ছিল সেই সিজারীয় মন্দির, রাণী ক্লিওপেট্রা জুলিয়াস সিজারের স্মৃতির সম্মানার্থে যা নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন—আর শেষ করেছিলেন অগাস্টাস। আরো পশ্চিমে দেখা যায় দুটি লোহিত বর্ণের আসোয়ান-পাথরে সূঁচ,—লোকে বলে ক্লিওপেট্রার নির্মিত, কিন্তু আসলে তৃতীয় থাট্‌মোসের কীর্তি (১৪৫০ খৃঃ পূর্ব)। আজ এই দুটি কীর্তি লণ্ডনে টেম্‌স নদীর বাঁধ ও নিউইয়র্কে সেন্ট্রাল পার্কের শোভা বর্ধন করছে। আর সবার পশ্চাতে মাথা উঁচু করে আছে ফ্যারস্‌। দিনের বেলায় এর উপর সূর্য-কিরণ ঝলমল করে, রাত্রিতে এর নিজের আলোই ভাস্বর হয়ে ওঠে। যথার্থই লোকে একে বলে, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। আজকের কোন বিদেশী ভ্রমণকারীর বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে নিউইয়র্কের গগণ-চুম্বী প্রাসাদ-মণ্ডলী যেমন প্রতিভাত হয়, মরুবাসী আরবের চোখেও সেদিন আলেকজান্দ্রিয়ার দৃশ্য নিশ্চয় তেমনিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার কেল্লা। সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। এর পেছনে ছিল বাইজেন্টাইনের সমগ্র নৌ-শক্তি। আক্রমণকারী সৈন্যদল সংখ্যায় ছিল নগণ্য—অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তাদের অনুন্নত ঃ তাদের সঙ্গে ছিল একটি জাহাজ, না ছিল কোন অবরোধ সরঞ্জাম, না ছিল রসদ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা।

প্রায় এক বছর পর খলীফা ওমরের নিকট মদীনায় নিম্নোক্ত ভাষায় সংবাদ গেল ঃ 'আমি এমন একটি শহর দখল করেছি, যার বর্ণনা হতে আমি বিরত রইলাম। এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, আমি যে শহর দখল করেছি, তাতে ৪ হাজার গোসলখানা সহ ৪ হাজার বাগান বাড়ী, ৪০ হাজার জিজিয়া-দানকারী ইহুদী এবং রাজপুরুষদের ব্যবহারের জন্য তৈরি ৪ শত প্রমোদ-উদ্যান রয়েছে।' খলীফা সংবাদবাহীকে রুটি ও খেজুর খেতে দিলেন এবং মসজিদ-এ-নববীতে একটি অনাড়ম্বর কিন্তু সম্ভ্রমমণ্ডিত শুকরীয়া-মজলিস করলেন। আল্লাহু আকবর!

ব্যাবিলনের নিকট যে স্থানে আমর তাঁবু গেড়েছিলেন, 'আল-ফুস্তাত' নামে তা-ই হল নতুন রাজধানী। 'পুরাতন কায়রো' নামে এখনো সে শহর বেঁচে আছে। এখানে মিসর বিজয়ী বীর আমর একটি অনাড়ম্বর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন—সে দেশে এ-ই প্রথম সমজিদ। মেরাত-সাহায্যে মসজিদটি আজো সেখানে বিরাজ করছে।

একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর গ্রন্থরাশি দ্বারা আমর দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত গোসলখানার চুলার আগুন জ্বালিয়েছিলেন। গল্পটি কাহিনী হিসেবে চমৎকার; তবে এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। এই বিরাট টলেমীয় লাইব্রেরীটি খৃস্ট-পূর্ব ৪৮ অব্দে জুলিয়াস সিজার ভস্মসাৎ করেন। এখানে 'দুহিতা লাইব্রেরী' নামে পরে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। তা-ও রোমক-সম্রাট থিউডোসিয়াসের আদেশ মোতাবেক ৩৮৯ খৃস্টাব্দে ধ্বংস করা হয়। সুতরাং, আরবদের বিজয়কালে আলেকজান্দ্রিয়াতে কোন উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী বর্তমান ছিল না এবং সমসাময়িক কোন লেখকই আমর বা ওমরের বিরুদ্ধে এ লাইব্রেরী ধ্বংসের অভিযোগ আনয়ন করেননি।

মিসরের পতনের ফলে বাইজেন্টাইন-সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের অঞ্চলগুলির আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠল। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের পর এর পশ্চাৎ-ভাগ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমর তাঁর স্বাভাবিক তীব্রবেগে একদল অশ্বারোহী-সহ পশ্চিম দিকে এগিয়ে চল্লেন। তাঁর এই অভিযানের ফলে মহানবীর পতাকা উত্তর-আফ্রিকার উপকূল বেয়ে বেয়ে ত্রিপলীর বার্বার-ভূমি পর্যন্ত গিয়ে পৌছল।

খিলাফত

একটা তরুণ অমার্জিত জাতি প্রথমে আপন যৌব-শক্তির প্রচণ্ড অভিঘাতে কোন প্রাচীন সভ্যতাকে পরাজিত করেছে—তারপর সেই বিজিত সভ্যতার সাংস্কৃতিক আনন্দের মায়ার কাছে নিজেরা পরাজয় মেনেছে—এমন ঘটনা ইতিহাসের আলোচনার এক পরম চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু। এক্ষণে আরবদের জীবন-কাহিনীতে এমন ঘটনারই আলোচনা এসে পড়ছে।

আরবরা যখন উর্বর হেলাল, পারস্য ও সিরিয়া অধিকার করল, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দখলে এল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমিসমূহ। চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, দর্শন, চিকিৎসা-বিদ্যা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজ্য-শাসন এসব বিষয়ে আদিম আরবেদের শিক্ষা দিবার ছিল না কিছুই; শিক্ষা করিবার ছিল সবই—আর কি রাক্ষুসে ক্ষুধাই না ছিল এদের পেটে লুকিয়ে। এদের কৌতূহল ছিল সুতীক্ষ্ণ, এদের অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা ছিল বিপুল। এই বিস্ময়কর-সম্পদ তারা নিয়ে তাদের পরাজিত জাতিদের সহযোগে এক্ষণে তাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক-উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করে তা ঢেলে নবরূপে উপস্থাপিত করতে শুরু করল। টিসিফন, দামেস্ক, বায়তুল-মোকাদ্দেস এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে তারা স্থাপত্য-শিল্পী, শ্রম-শিল্পী, জহুরী এবং শিল্প-দ্রব্য উৎপাদকদের কাজ দেখে মুগ্ধ হল এবং সেসবের অনুকরণ করতে লাগল। প্রাচীন সংস্কৃতির এইসব কেন্দ্রে তারা এল—তারা দেখল এবং তারা পরাভূত হল।

আমরা বর্তমানে যাকে আরব-সভ্যতা বলি, তা মৌলিক-গঠন বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য—এর কোন দিক দিয়ে আরবীয় ছিল না। খাঁটি আরবীয় অবদান ছিল ভাষাগত এবং কতকাংশ ধর্মগত। খিলাফত-জামানার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সিরিয়া, পারস্য ও মিসরের বাসিন্দা ও অন্যান্যরা (যেমন নব দীক্ষিতেরা অথবা খৃস্টান ও ইহুদীরা) সভ্যতার পতাকা বহনকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রগামী ছিল—যেমন, বিজিত গ্রীকরা ছিল বিজেতা রোমকদের অধীনে। আরব-ইসলামী সভ্যতার মূলে ছিল গ্রীক প্রভাবপুষ্ট আরামেইক ও ইরানী সভ্যতা। এ-সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিস্তার লাভ করেছিল

আরবী ভাষার মাধ্যমে। অন্য কথায়, 'উর্বর হেলাল-অঞ্চল' যে সেমিটিক সভ্যতা আসিরিয়া-ব্যাবিলোনীয়, ফিনিশীয়, আরামীয় ও ইহুদীদের দ্বারা উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল, আরব-সভ্যতা তারই অনিবার্য পরিণতি। এ-সভ্যতায় পশ্চিম-এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা তার চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

মুসলিম-আরব কি শ্রেণীর মানুষ পয়দা করেছিল, আমরা তার দুটি স্পষ্ট ছবি পাই প্রথম দুই খলীফা—আবুবকর (রাঃ) (৬৩২—৬৩৪) এবং ওমরের (রাঃ) (৬৩৪—৬৪৪) মধ্যে। আবুবকরই প্রকৃতপক্ষে আরব জয় করেন ও আরবে শান্তি স্থাপন করেন। অথচ তিনি প্রাচীন-কালের কওমী সর্দারের মত অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি তাঁর পত্নী বিবি হাবীবার সঙ্গে আল-সুনহ নামক স্থানে একটি ছোট বাড়ীতে বাস করতেন এবং এই স্থান হতে তাঁর শাসন-কালের প্রথম ছয়মাস তিনি রোজ রাজধানী মদীনায় আসতেন। এ-সময় তিনি রাজকোষ হতে কোন বেতন বা ভাতা নিতেন না। (আর আসলে এ সময়ে রাষ্ট্রের তেমন কোন আয়ও ছিল না)। মহানবীর মসজিদের আঙ্গিনায় বসে তিনি যাবতীয় সরকারী কার্য সমাপন করতেন।

তাঁর পরবর্তী খলীফা ওমর (রাঃ) ছিলেন এক প্রতিভাবান অসাধারণ কর্মী পুরুষ। তিনি লম্বা জওয়ান ছিলেন এবং তাঁর দেহে প্রচুর শক্তি ছিল। তিনিও জাঁকজমক-শূন্য সরল জীবনযাপন করতেন এবং খলীফা হওয়ার পর অন্ততঃ কিছুকাল পর্যন্ত তেজারতী দ্বারা নিজ পরিবার পালন করেন। তিনি জীবন-ভর বেদুঈন শেখের মত একান্ত আড়ম্বরহীনভাবে চলেছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবেচনায় প্রাথমিক-যুগে হযরত মুহম্মদের (সঃ) পরই ওমরের স্থান। মুসলমান লেখকগণ তাঁর ধর্ম-প্রাণতা, তাঁর সুবিচার এবং তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রণালীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা মনে করেন, খলীফার যেসব গুণ থাকা দরকার, ওমরের মধ্যে তার সব ছিল। ঐতিহাসিকেরা আরো বলেন, তাঁর মাত্র একটি জামা ও একটি আলখিল্লা ছিল এবং তাতে তালির অভাব ছিল না। তিনি খেজুরপাতার বিছানায় শয়ন করতেন এবং তাঁর একমাত্র ধ্যান ছিল—ধর্মের পবিত্রতা সংরক্ষণ, হক-বিচার কায়েম করা এবং ইসলাম ও আরব-জাতির উন্নতিবিধান। ওমরের কঠোর চরিত্র সম্বন্ধীয় উপাখ্যানে আরবী-সাহিত্য ভরপুর। তিনি তাঁর নিজ পুত্রকে সুরাপান ও ব্যভিচারের জন্য দোর্‌রা মেরে মেরেই ফেলেছিলেন। একদা এক বেদুঈন কোন জালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তাঁর কাছে আসে। তিনি রাগের মাথায় বেদুঈনকে কয়েকটি দোর্‌রা মারেন। এরপরই তাঁর অনুতাপ হয়; তিনি বেদুঈনকে ডেকে তাঁর পিঠে সেই কয়েকটি দোরর মারতে বলেন। বেদুঈন অস্বীকার করে। তখন তিনি আপনা আপনি এই বলতে বলতে চলে যান ঃ

'হে আল-খাত্তাবের পুত্র! তুমি নগণ্য ছিলে, আল্লাহ্ তোমাকে ইজ্জত দিয়েছেন; তুমি পথ-ভ্রান্ত ছিলে, আল্লাহ্ তোমাকে পথ দেখিয়েছেন; তুমি দুর্বল ছিলে, আল্লাহ, তোমাকে সবল করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তোমাকে তোমার জাতির ঘাড়ের উপর শাসক নিযুক্ত করেছেন—তাদেরই একজন তোমার কাছে এল সাহায্য চাইতে – আর তুমি তাকে করলে বেত্রাঘাত! আল্লাহ্র কাছে যখন হাজির হবে, তখন তোমার এ অন্যায়ের কি কৈফিয়ত দিবে?'

এ-কথা লক্ষণীয় যে, ওমর নিহত হন পারস্য-দেশীয় এক খৃস্টান গোলামের ছুরিকাঘাতে।

ওমরের পরবর্তী খলীফা ওস্মান (রাঃ) বারো বছর শাসন করেন এবং এক বিদ্রোহ-কালে মুসলমানদের হাতে নিহত হন। আলী (রাঃ) (৬৫৬—৬৬১) পরবর্তী খলীফা। প্রায় সমস্ত মুসলিম-জগতই তাঁকে স্বীকার করে নেয়; তথাপি একটি বিরুদ্ধ দল শীঘ্র জেগে ওঠে। ফলে শুরু হয় সেই বংশগত লড়াই, যা পরবর্তী-কালে মাঝেমাঝেই মুসলিম-সাম্রাজ্যকে তোলপাড় করেছে এবং কখনো কখনো তার ভিত্তি-মূলকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। পাঁচ বছর পর এক বিষাক্ত চুরির আঘাতে হযরত আলী (রাঃ) নিহত হন।

এখানে একটি সাধারণ ভুল সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হতে হবে ঃ অনেকেই মনে করেন খিলাফত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। রোমক সাম্রাজ্যের এবং ক্যাথলিক চার্চের অধিনায়কের সঙ্গে খলীফাকে এক মনে করা ভুল। খলীফা আমীরুল মুমেনীন ঃ মুমিনদের আদেশদাতা। এ হিসেবে তাঁর পদের সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট। ইমাম হিসেবে তিনি জামাতের ইমামতি ও জুমার নামাজে খোত্বা দিতে পারতেন এবং অনেক সময় বাস্তবিকই খোতবা দিতেন। কিন্তু এ কাজ নিতান্ত নগণ্য মুসলমানকে দিয়েও চলতে পারে। মহানবীর খলীফা হওয়া মানে ছিল, মুসলিম রাষ্ট্রের নায়ক পদে ব্রত হওয়া। পয়গম্বর হিসেবে কারো পক্ষে মুহম্মদের (সঃ) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথাই ওঠে না। খলীফার সঙ্গে ধর্মের শুধু এইটুকু সম্বন্ধ ছিল যে, তিনি ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক ছিলেন। যেকোন ইউরোপীয় সম্রাটের মত খলীফা ধর্মকে বিধর্মীয় আক্রমণ হতে রক্ষা করতেন, ধর্ম-বিরোধী মত দমন করতেন, কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করতেন এবং দারুল-ইসলামের সীমা বর্ধন করতেন এবং এসব কর্তব্য সম্পাদন করতে তিনি তাঁর ঐহিক বাহুবল প্রয়োগ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে ইউরাপে এমন কোন ধারণা বদ্ধমূল হয় নাই যে, মুসলিম-খলীফা খৃস্টান-পোপের মত সমগ্র জগতের মুসলমানদের উপর এক ধর্মীয় আধিপত্যের অধিকারী। সুচতুর দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খৃস্টান-শক্তিপুঞ্জের চোখে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঐ

ধারণার সাহায্যে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, এই সময় খৃষ্টান-শক্তিবর্গ এশিয়া ও আফ্রিকার বেশির ভাগ মুসলিম-রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে প্যান-ইসলামীজম নামে একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে খৃষ্টান-শক্তিকে বাধা দেওয়া। তুরস্ককে এই আন্দোলনের কেন্দ্র করে খিলাফতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আলীর হাত হতে যিনি খিলাফত কেড়ে নেন, তিনি ছিলেন আলীরই এক দূরসম্পর্কীয় চাচাতো ভাই ঃ ধূর্ত মুয়াবীয়া—সিরিয়ার শাসনকর্তা। তাঁর আমল হতে ইসলামের সার্বভৌম ক্ষমতায় এক নব-নীতির প্রবর্তন হয় ঃ খিলাফত বংশগত হয়ে পড়ে। নির্বাচন-প্রথা বিলুপ্ত হয়। আমাদের আলোচ্য যুগে তিনটি বংশের কথা আসবে। উমাইয়া বংশ ঃ ৬৬১ সালে দামেস্কে মুয়াবীয়া -এর শাসন-আমলের পত্তন করেন; বাগদাদের আব্বাসীয় বংশ (৭৫০—১২৫৮) এবং কায়রোর ফাতেমীয় বংশ (৯০৯—১১৭১)। উমাইয়া খলীফাদের এক সুবিখ্যাত শাখা স্পেনে কর্দোভা নগরকে রাজধানী করে ৯২৯ হতে ১০৩১ পর্যন্ত স্পেন শাসন করেন। এই খলীফাদের মধ্যে একমাত্র ফাতেমীয় খলীফারা আলীর বংশধর বলে দাবী করতেন। বংশগত উত্তরাধিকারের নীতি রাজনৈতিক ব্যাপারে খানিকটা স্থায়িত্ব আনয়ন করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু রক্তাক্ত আত্মকলহ ইসলামকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে নাই, এমন কোন দীর্ঘযুগ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন-কোন সময় খলীফা নামে সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও কার্যত ঃ নিজ রাজধানীতেও তাঁর ষোলআনা কর্তৃত্ব থাকত না।

মুয়াবীয়ার অভ্যুদয় উপলক্ষে এই সময় ইসলামের রাজনীতিতে আর এক নতুন সুর বেজে ওঠে। পরবর্তী যুগে মুসলিম-জগতে বহুবার এইসব ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ইরাকের অধিবাসীরা আলীর পুত্র ইমাম হাসানকে খলীফা বলে ঘোষণা করল। তারা বল্ল—'হাসান আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মহানবীর কন্যা ফাতিমার গর্ভজাত। সুতরাং, যুক্তি অনুসারে তিনিই খিলাফতের অধিকারী।

মুয়াবীয়া অসাধারণ শাসন-কুশলী ব্যক্তি ছিলেন। বিশৃঙ্খলতার ভিতর হতে তিনি একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলেন। মুসলিম যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে তাঁরই ছিল প্রথম সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল সৈন্য-বাহিনী। মুসলিম ঐতিহাসিকরা আরো বলেন যে, ইসলামের তিনিই প্রথম রেজেস্ট্রী দফ্‌তর স্থাপন করেন এবং তিনিই প্রথম পোস্টঅফিস স্থাপন করেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠান অনতিকাল মধ্যে বিকাশ লাভ করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে সুসংবদ্ধ করে।

মুয়াবীয়ার মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান যে পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছিল, তেমন বোধহয় কোন খলীফার মধ্যে বিকাশ লাভ করে নাই। আরব জীবনী-লেখকদের বিবেচনায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল 'হিল্ম'। হিল্মকে বুদ্ধির কলা-কৌশল বলে অনুবাদ করা যেতে পারে। হিল্ম সেই অসাধারণ শক্তি যার বলে মানুষ কেবল তখনি বল প্রয়োগ করে যখন বল প্রয়োগ ছাড়া আর কোন পথই খোলা থাকে না; অন্যান্য সর্বপ্রকার অবস্থায় শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন করে। মুয়াবীয়া পরম বিচক্ষণতার সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আপন করতে চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর ক্রোধ দমন করে চলতেন কোন অবস্থাতেই তিনি আত্মসংযম হারাতেন না; ফলে যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর কর্তৃত্ব বহাল থাকত। তিনি বলেছেন ঃ 'যেখানে আমার চাবুক যথেষ্ট, সেখানে আমি তলোয়ার ধরি না; যেখানে আমার জিভ যথেষ্ট, সেখানে আমি চাবুক হাতে নেই না। আর একটি চুলও যদি আমাকে আমার দেশের ভাইয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে, তবে আমি তা ছিঁড়ি না। যখন তারা টানে আমি ঢিলা দেই, আর যদি তারা ঢিলা দেয়, আমি টানি।' কথিত আছে, তিনি ইমাম হাসানকে তাঁর খিলাফত দাবী পরিত্যাগ উপলক্ষে এই মর্মে পত্র লেখেন ঃ 'আমি স্বীকার করি, রক্তের সম্বন্ধ হিসেবে এ মহান পদের জন্য আপনার দাবীই অগ্রগণ্য। এ পদের গুরুদায়িত্ব পালনে আপনি শ্রেষ্ঠতম ক্ষমতার অধিকারী—এ বিষয়ে নিশ্চিত হলে আমি অসঙ্কোচে আপনার হাতে বয়েত হতাম। এখন তা হলে ঠিক করুন, আপনি কি করবেন।' এই পত্রের সঙ্গে মুয়াবীয়ার দস্তখত-সহ একখণ্ড সাদা কাগজ ছিল—ইমাম হাসানের পূরণের জন্য। প্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হাসান এ-পত্র পেয়ে স্বভাবতঃই মুগ্ধ হলেন।

পরবর্তী খলীফাদের মত মুয়াবীয়া বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে বাহু-বল পরীক্ষা করেন এবং দুই দুইবার তাঁর সবল বাহু কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। যখন তিনি সিরিয়ার গভর্নর, তখন মুসলিম নৌ-বাহিনী এশিয়া মাইনরের নিকটস্থ লিসীয়ার উপকূলের অদূরে বাইজেন্টাইন নৌ-বাহিনীর সঙ্গে এক রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে জয়লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে এই-ই প্রথম উল্লেখযোগ্য নৌ-বিজয়। কনস্টান্টিনোপল তুর্কদের আগ পর্যন্ত দুর্ভেদ্যই রয়ে যায়। এশিয়া মাইনরেও আরবরা কখনো স্থায়ী প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে নাই, কিংবা হেলেস্পন্ট পার হতে পারে নাই। তাদের প্রদান শক্তি নিয়োজিত হয়, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে। মুয়াবীয়ার আমলে আবার তারা অভিযান পথে বের হয়।

স্পেন বিজয়

সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও মিসর অধিকার ইসলামের বিজয়-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় সূচনা করে। এরপর কিছুকাল আত্মকলহে কেটে যায়। তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় অধ্যায়।

দুর্নিবার ঘূর্ণিবার্তার মত এক প্রচণ্ড অভিযান মহানবীর পতাকাকে অক্সাস নদীর ওপার বহন করে নিয়ে যায়। এই অক্সাসই ছিল পারস্যভাষী ও তুর্কীভাষী দেশসমূহের মধ্যে সনাতন সীমারেখা। ক্রমে ইসলামের বিজয়-কেতন বহির্মঙ্গোলীয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বোখারা, তাশকন্দ, সমরকন্দ, — সমস্ত মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে আত্মসমর্পণ করে। মধ্য-এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য এমন দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হয় যে, চীন জাতিও হস্তক্ষেপ করতে বিরত হয়। আর একটি পূর্ব-গামী বাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং যাকে এখন আমরা বলি বেলুচিস্তান, তারই ভিতর দিয়ে গিয়ে ৭১২ সালে সিন্ধু দেশ অধিকার করে। দক্ষিণ পাঞ্জাবস্থিত মুলতানে তখন এক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির ছিল। মুসলিম-বিজয় ক্রমে এই মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং ভারতের সীমান্ত প্রদেশসমূহে ইসলাম চিরতরে শিকড় গেড়ে বসে। (এইসব বিজয় মাত্র কয়েক বছর আগে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে) এখানে ইসলাম এক নব সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে— বৌদ্ধ সংস্কৃতি।

উত্তর কেন্দ্রীয় সীমান্তে আরব বিজয়-তরঙ্গ কনস্টান্টিনোপলের দুর্গ-মূলে প্রহত হয়ে ফিরে আসে। তবে এই যুগে আরবরা যে কনস্টান্টিনোপল বছর-কাল পর্যন্ত (৭১৬'র আগস্ট হতে ৭১৭'র সেপ্টেম্বর) অবরোধ করে রাখে, তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। গোল্ডেন হর্নের মুখে একটি বিরাট শিকল টানিয়ে আরব নৌ-বাহিনীর প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিমদিকের অভিযানেই মুসলমানেরা সবচেয়ে বিস্ময়কর বিজয় লাভ করে। তারা আগেই উত্তর আফ্রিকায় প্রাচীন কার্থেজের সীমা পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তার করেছিল। তখন উত্তর আফ্রিকার একাংশের বাসিন্দা ছিল বার্বার

জাতি। এরা শ্বেতাঙ্গ জাতিদের এক হেমিটিক শাখা ছিল। ইতিহাস-পূর্ব যুগে হয়তো এরা সিমাইটদের সঙ্গে একই মূল জাতি হতে উদ্ভূত হয়েছিল। উপকূল ভাগের বেশীর ভাগ বার্বাররাই খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল। টার্টুলিয়ান, সেন্টসাইপ্রিয়ান, সর্বোপরি সেন্ট অগস্টাইন—এরা প্রাথমিক খৃস্টান পুরোহিত সমাজে দিক্‌পাল ছিলেন এবং এঁদের প্রত্যেকেই এই বার্বারদের মধ্য হতে উদ্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু উপকূল হতে ভিতরের অংশের বাসিন্দারা রোমক বা বাইজেন্টাইন সভ্যতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই। আসলে উত্তর আফ্রিকার এ যাযাবর এবং অর্ধ-যাযাবর জাতি-সমূহের মনোবৃত্তির কাছে রোমক ও বাইজেন্টাইন সভ্যতা কখনো আপন বলে অনুভূত হয় নাই। ইসলামের একজন মহাশক্তিশালী সেনাপতি—মুসা-ইবনে— নুসাইয়ার এই বার্বারদের মধ্য দিয়ে তাঁর বিজয়-রথ চালিয়ে যান।

বার্বাররা তখন সভ্যতার যে স্তরে অবস্থিত, সে স্তরের লোকের কাছে ইসলামের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কাজেই সেমিটিক আরবরা সহজেই তাদের হেমিটিক জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পেতে বসল। ইসলাম আবার এক মহাআশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করল ঃ অর্ধসভ্য যাযাবর জাতিদের ভাষায় ছিল তারা আরবী, আর ধর্মে ছিল তারা ইসলাম। বিজেতাদের রক্ত নতুন রক্তের সহযোগে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। আরবী ভাষা নিজ বিজয়ের জন্য পেল এক বিরাট ক্ষেত্র— আর উদীয়মান ইসলাম তার বিশ্ব-প্রভুত্ব স্থাপনের আরোহণ-পথে পেল, পা রাখার নতুন স্থান।

আরবরা যে দ্রুতগতিতে এবং যেমন সম্পূর্ণভাবে স্পেন অধিকার করে, তা মধ্যযুগীয় সামরিক ইতিহাসে এক অতুলনীয় স্থান অধিকার করে আছে। ৭১০ সালে প্রথম পরীক্ষামূলক অভিযান শুরু হয়। ৪ শত পদাতিক ও ১ শত অশ্বারোহী এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। এরা জাতিতে সবাই বার্বার এবং মুসার সৈন্যদল-ভুক্ত ছিল। মুসা উমাইয়া খলীফাদের অধীনে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন। আক্রমণকারী সৈন্যদল তারিফা নামক ক্ষুদ্র উপদ্বীপে অবতরণ করে। তারিফাকে ইউরোপের সর্বদক্ষিণ ডগা বলা যেতে পারে।

মুসা ৬৯৯ খৃস্টাব্দ হতে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর ছিলেন। কার্থেজের পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত ভূ-ভাগ হতে তিনি বাইজেন্টাইনদের চিরতরে বিতাড়িত করেন এবং ক্রমে তাঁর বিজয় অভিযান আটলান্টিকের উপকূলভাগে গিয়ে পৌঁছে। এইরূপে তিনি ইউরোপে মুসলিম অভিযান-পথ খোলাসা করেন। মুসার প্রাথমিক স্পেনীয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। স্পেনের তৎকালীন ভিসিয়োগথ্ রাজাদের

মধ্যে বংশগত দ্বন্দ্ব জেগে ওঠে। এ উভয় কারণে উৎসাহিত হয়ে এবং রাজ্য জয়ের চেয়ে লুণ্ঠন আশায় অধিকতর প্রলুব্ধ বোধ করে ৭১১ খৃস্টাব্দে মুসা তারিককে ৭ হাজার সৈন্য-সহ স্পেন বিজয়ে প্রেরণ করেন। তারিক জাতিতে বার্বার এবং মুসার আজাদী দেওয়া লোক ছিলেন তাঁর সৈন্যদের অধিকাংশই বার্বার জাতীয় ছিল। তারিক এক পাহাড়ের উপর অবতরণ করেন। এই পাহাড় জিব্রাইল্টার (জবল-আল-তারিক-অর্থাৎ তারিক পাহাড়) নামে তারিককে অমর করে রেখেছে। এখানে প্রণালীটি পাশে মাত্র তের মাইল। কথিত আছে, সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলীয়ান তারিকের নৌ-বহরের রসদ-পত্র জোগান।

পথে আরো কিছু সৈন তারিকের সঙ্গে যোগ দেয়। এইরূপে বর্ধিত বার হাজার সৈন্য নিয়ে ৭১১ খৃস্টাব্দের ১৯ জুলাই তারিক সালাদো নদীর মুখে রাজা রডারিকের সম্মুখীন হন। রডারিক উইটিজার পুত্রকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসেন। রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ২৫ হাজার হওয়া সত্ত্বেও তারা ভীষণভাবে পরাজিত হয়। রডারিকের ভাগ্যে অতঃপর কি ঘটে, তা আজো প্রহেলিকা হয়ে আছে। স্পেনীয় ও আরব ঐতিহাসিকেরা কেবল এইটুকু বলেই তুষ্ট যে, রডারিক উধাও হয়ে গেলেন।

এই চূড়ান্ত বিজয়ের পর মুসলমানেরা স্পেনময় কেবল যেন বেড়িয়ে বেড়িয়ে এগিয়ে গেল। কোথাও উল্লেখযোগ্য লড়াই আর কিছুই হল না। কেবল যেসব শহরে ভিসিয়োগথ্ নাইটদের প্রভুত্ব ছিল, সেখানে তারা যথেষ্ট বাধা দিল। তারিক সৈন্যদলের প্রধান অংশ-সহ ইসিজার পথে রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হলেন; বাকী সৈন্যগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন শহরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। দক্ষিণে সেভিল শহর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; সে শহর আরব সৈন্যরা এড়িয়ে গেল। এক দল আর্কিদোনা অবরোধ করল; আর্কিদোনা বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করল। আর একদল আল-ভীরা দখল করল। তৃতীয় দলে অশ্বারোহী ছিল। এ দল মুসলমানদের ভবিষ্যৎ রাজধানী কর্ডোভা অবরোধ করে বসল। দুই মাস পর্যন্ত অবরোধ চল্ল। কথিত আছে, এরপর এক বিশ্বাসঘাতক রাখাল দুর্গের ভগ্ন প্রাচীর দেখিয়ে দেয় এবং তার ফলে কর্ডোভার পতন হয়। মালাগা কোন বাধাই দিল না। ইসিজায় হল এ অভিযানের সবচেয়ে ভীষণ লড়াই এবং পরিণামে আরবরাই জয়লাভ করল। কয়েকজন ইহুদীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজধানী টলেডোর পতন হল। এইরূপে তারিক ৭১১ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে একটা অতর্কিত আক্রমণের নেতা হিসেবে শুরু করে গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগ পর্যন্ত অর্ধ স্পেনের অধীশ্বর হয়ে বসলেন। একটা সমগ্র রাজ্যকে তিনি ধ্বংস করে ফেল্লেন।

মুসা তাঁর ক্ষুদ্র সহকারীর এই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ১০ হাজার সৈন্যসহ ৭১২ সালের জুন মাসে স্পেন অভিমুখে ধাবিত হলেন। এ সৈন্যদের সবাই ছিল আরব ও সিরিয়া হতে সংগৃহীত। তিনি সেই সব শহর ও দুর্গ বিজয়ের জন্য বেছে নিলেন যেগুলি তারিক এড়িয়ে গিয়েছিলেন ঃ মেডিনা, সিডোনীয়া ও কারমোনা। সেভিলে ছিল স্পেনের সবচেয়ে বড় শহর—এর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং এককালের রোমক রাজধানী। মুসা সেভিল অবরোধ করলেন। ৭১৩ সালের জুন পর্যন্ত অবরোধ চল্ল। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম করতে হল মেরিডা জয় করতে। এক বছর অবরোধের পর ৭১৩ সালের ১ জুন মেরিডা অধিকৃত হয়।

টলেডো শহরে বা তার নিকটবর্তী কোন স্থানে মুসা ও তারিকের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে। কথিত হয়, তারিকের বিজয় অভিযানের প্রথম দিকে মুসা তাঁকে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করেন; কিন্তু তারিক সে আদেশ মান্য করেন নাই। সেই অপরাধে মুসা এই সাক্ষাৎকালে তারিককে বেত্রাঘাত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। কিন্তু বিজয় অভিযান রুদ্ধ হল না। অল্পকাল মধ্যেই উত্তরে সারাগোসা পর্যন্ত ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন হল এবং মুসলমান সৈন্যরা আরাগন, লিয়ন, অস্টুরিয়াস এবং গ্যালিসিয়ার উচ্চ ভূমিতে প্রবেশ করল। সেই বছরেরই শরৎকালে খলীফা ওলীদ মুসাকে সুদূর দামেস্কে ডেকে পাঠালেন—সেই একই অপরাধে, যে অপরাধে মুসা নিজ অধীনস্থ তারিককে শাস্তি দিয়েছিলেন ঃ তাঁর মনীবের বিনা আদেশে স্বাধীনভাবে কাজ করার অপরাধে।

মুসা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল আজীজকে নব-বিজিত রাজ্যের শাসন-ভার দিয়ে ধীরে ধীরে স্থলপথে দামেস্কের পানে চল্লেন। তাঁর সঙ্গে চল্ল তাঁর অফিসার মণ্ডলী, চারশত ভিসিওগথ বংশীয় শাহ্জাদা—তাদের মাথায় রাজমুকুট, তাদের কোমরে সোনার কোমরবন্দ—অগণ্য গোলাম ও যুদ্ধ-বন্দী এবং অফুরন্ত লুণ্ঠিত ধন-রত্ন। আরব ঐতিহাসিকেরা উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম হতে পূর্ব পর্যন্ত এই বিজয়-শোভাযাত্রার কথা অতি আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনা পাঠককে প্রাচীনকালে বিজয়ী রোমক বীরদের বিজয় কুচকাওয়াজের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বিরাট শোভাযাত্রা দামেস্কে পৌছার আগেই তার খবর দামেস্কে গিয়ে পৌছল। খলীফা ওলীদ তখন রোগশয্যায় শায়িত। তাঁর ভাই সোলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী। মুসা টাইবেরিয়াসে উপস্থিত হয়ে সোলায়মানের আদেশ পেলেন ঃ 'রাজধানীতে দেরীতে প্রবেশের প্রতীক্ষায় ঐখানে অপেক্ষা করুন।' ভাবী খলীফা ভেবেছিলেন, ওলীদ শীঘ্রই ওপরে চলে যাবেন; তখন তাঁর সিংহাসন-আরোহণের উৎসবের মধ্যে শোভাযাত্রা রাজধানীতে প্রবেশ করবে।

রত্ন-ঝলমল পোশাক পরিহিত ভিসিয়োগথ্-বংশীয় শাহ্জাদাদের সঙ্গে নিয়ে মুসা ৭১৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দামেস্কে প্রবেশ করলেন। মনে হল, ওলীদ খুশীর সঙ্গেই তাঁর বিজয়ী সেনাপতিকে গ্রহণ করলেন। মহান উমাইয়া মসজিদে যে বিপুল সম্ভ্রম ও ধূমধামের সঙ্গে অভ্যর্থনার উৎসব সম্পন্ন হল, তা বিজয়ী ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল গৌরব-স্তম্ভ। এই প্রথম ইউরোপীয় শাহ্জাদা ও হাজার হাজার ইউরোপীয় বন্দীকে আমীরুল মুমিনিনের সম্মুখে বশ্যতা স্বীকারের শপথ গ্রহণ করতে দেখা গেল।

মুসা খলীফাকে অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের মধ্যে একটি অপূর্ব কারুকার্য খচিত টেবিল নজর দিলেন। প্রাচীন কাহিনী বলে, বাদশাহ্ সোলায়মান জ্বীন মিস্ত্রী দ্বারা এই টেবিল নির্মাণ করিয়েছিলেন। কাহিনীতে আরো পাওয়া যায় যে, রোমকরা বায়তুল মোকাদ্দেস হতে এই টেবিল তাদের নিজ রাজধানীতে চালান দেয় এবং পরবর্তীকালে সেখানে হতে গথ্রা এ টেবিল নিয়ে যায়। প্রত্যেক গথ্ রাজা তাঁর পূর্ববর্তী রাজার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বহু মূল্য রত্নরাজিতে এ টেবিল সুশোভিত করতেন। রাজধানীর প্রধান গীর্জায় এই অমূল্য টেবিল রক্ষিত ছিল,— বোধহয় কোন পুরোহিতের নিয়ে পলায়নের সময় তারিক তার নিকট হতে উদ্ধার করেন। টলেডোতে যখন মুসার সঙ্গে তারিকের সাক্ষাৎ হয়, তখন মুসা তারিককে বেত মারার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটিও কেড়ে নেন। কিন্তু তারিক নাকি চুপে চুপে একটি পায়া সরিয়ে ফলেন এবং এখন খলীফার সামনে নাটকীয়ভাবে হারানো পায়াটি উপস্থিত করেন ঃ টেবিলটি যে আসলে তিনিই সংগ্রহ করেন, তারই প্রমাণ স্বরূপ।

অনেক করিৎকর্মা আরব সেনাপতির ভাগ্যে যা ঘটেছে, মুসার ভাগ্যেরও তা-ই ঘটল। ওলীদের পরবর্তী খলীফা তাঁকে অপদস্থ করলেন। রোদে হয়রান হয়ে ভেঙ্গে না পড়া পর্যন্ত তাঁকে খোলা আকাশতলে দাঁড়িয়ে রাখা হল। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল; তাঁকে সর্ব ক্ষমতা হতে বঞ্চিত করা হল। তাঁর সম্বন্ধে আমরা যে শেষ সংবাদ পাই তা এই যে, হেজাজের এক দূর পল্লীতে এই বৃদ্ধ আফ্রিকা-স্পেন বিজয়ী বীর ভিক্ষা করে জীবনযাপন করেছেন।

স্পেন এখন খেলাফতী-সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে পড়ল। এর আরবী নাম দেওয়া হল, আল-আন্দালুস। ভ্যাণ্ডাল শব্দের সঙ্গে আন্দালুসের ব্যুৎপত্তিগত যোগ আছে। আরবদের স্পেন অধিকারের আগে ভ্যাণ্ডালরা স্পেন অধিকার করেছিল। মুসার পরবর্তী শাসকদের জন্য স্পেনের উত্তর এবং পূর্বভাগে অল্প স্থানই দখলের বাকী ছিল; বিদ্রোহ দমনও বেশি করতে হয় নাই। মধ্যযুগীয় ইউরোপে স্পেন

ছিল সুন্দরতম ও বৃহত্তম অঞ্চল সমূহের অন্যতম। মাত্র সাত বছর সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের বিজয় পরিপূর্ণ হল। বিজেতারা অতঃপর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনের ভাগ্যবিধাতা হয়ে রইল।

এ বিস্ময়কর বিজয়মালাকে আপাতদৃষ্টিতে অপূর্ব বলেই মনে হয়। তবে, এর কারণ নির্ধারণ কঠিন নয় এবং উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই এর কারণ অনুমান করা চলে। ভিসিয়োগথ্‌রা (পশ্চিমী গথ্‌) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্বর টিউটন জাতি হিসেবে স্পেনে প্রবেশ করে। এদের এবং স্পেনীয়-রোমক বাসিন্দাদের মধ্যে বিভেদ-রেখা কোনক্রমেই মুছে ফেলা সম্ভব হয় নাই। সুয়েভী ও ভ্যাণ্ডালরা জার্মানী হতে এসে গথ্‌দের আগে স্পেনে প্রবেশ করে। তাদের উচ্ছেদ করতে ভিসিয়োগথ্‌দের বহুকাল পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। ভিসিয়োগথ্‌রা একচ্ছত্র এবং কখনো কখনো স্বেচ্ছাচারী রাজারূপে শাসন কাজ চালিয়েছে। তারা বরাবর আরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত খৃস্টানধর্ম পালন করে চলেছে। অবশেষে ৫৮৭ খৃস্টাব্দে রিকার্ড নামক তাদের একজন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেন। দেশের বাসিন্দারা সবাই ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিল। ক্যাথলিক ধর্মপন্থী হিসেবে তারা বরাবর অন্য ধর্ম পন্থীদের শাসনকে ঘৃণার চোখে দেখত। বাসিন্দাদের মধ্যে বহুসংখ্যক গোলাম ও ভূমি-দাস ছিল। তারা তাদের এ দুর্ভাগ্যের কলঙ্ক-তিলক ললাটে নিয়ে স্বভাতঃই তুষ্ট ছিল না। এই দাস শ্রেণী যদি আক্রমণকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের সাফল্য বিধান করে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। তারপর বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল বেশ কিছুসংখ্যক ইহুদী। গথ্‌ রাজারা এদের উপর জুলুম করে করে এদের সহানুভূতি হারিয়েছিল। এদের জোর করে খৃস্টান করার চেষ্টা চরমে পৌছল তখন, যখন ৬১২ সালে রাজা হুকুম জারী করে বসলেন যে, হয় ইহুদীদের খৃস্টান হতে হবে, না হয় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তারা নির্বাসিত হবে। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম বিজেতারা তাদের স্পেনীয় অভিযানকালে কয়েকটি বিজিত শহর ইহুদীদের হাতে ন্যস্ত করে নিজেরা বাকী অঞ্চল অধিকারে ব্যাপৃত হয়েছেন।

আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, রাজা ও তাঁর গথ্‌-বংশীয় আমীর-রইসদের মধ্যে রাজনৈতিক মতানৈক্য এবং আত্মকলহ রাষ্ট্রের শক্তি খর্ব করে রেখেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গথীয় আমীরেরা বড় বড় ভূখণ্ডের অধীশ্বর হয়ে উঠেছিল। মুসলিম আক্রমণের পূর্ব-মুহূর্তে এই আমীরদের একজন জোর করে দেশের সিংহাসন দখল করে বসেছিলেন। কাজেই সিংহাসন-চ্যুত রাজার

জ্ঞাতিরা অসঙ্কোচে নতুন রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। উইটিজার সিংহাসন-চ্যুত পুত্র অচিলা অকপটে বিশ্বাস করে আসছিলেন যে, আরবরা তাঁরই পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে। এলেডো অধিকারকালে উক্ত শহরে তাঁর যে ব্যক্তিগত জমিদারী ছিল, তিনি তা-ই ফেরত পেয়ে তুষ্ট রইলেন এবং এখানে মহাধূমধামে জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাঁর পিতৃব্য বিশপ্ ওপাসকে রাজধানীতে তাঁর স্বপদে বহাল করা হল। সিউটার গভর্নর জুলীয়ান সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি আরব নৌ-বাহিনীকে নৌবহর সরবরাহ করেছিলেন। স্পেন বিজয়ে তিনিও অভিনয় করেন; তবে তাঁর অভিনয়ের গুরুত্ব স্পষ্টতঃই অতিরঞ্জিত হয়েছে। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যে কয়টি শেষ বাধা ছিল, সারাগোসার পতনে তার একটি দূর হল; কিন্তু পিরেনীজ পর্বত রয়ে গেল। কোন কোন আরব ঐতিহাসিক বলেন যে, মুসা পিরেনীজ অতিক্রম করেছিলন। তিনি নাকি এমন আশাও করেছিলেন সে, ফিরিঙ্গীদের দেশ অতিক্রম করে কনস্টান্টিনোপলের পথে তিনি দামেস্কে খলীফার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন। আদতে কিন্তু তিনি কখনো পিরেনীজ পার হন নাই। ইউরোপের ভূগোল সম্বন্ধে আরব আক্রমণকারীদের জ্ঞান স্পষ্ট থাকার কথা নয়। কাজেই ফিরিঙ্গীদের দেশ জয় করে দামেস্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কল্পনা যতই উদ্ভট হোক না কেন, অমন কল্পনা সত্যি তাদের মাথায় প্রবেশ করে থাকতে পারে। মুসার পরবর্তীদের মধ্যে তৃতীয় জন আল-হারূর্ ইবনে-আব্দুর রহমান আল থাকাফী ৭১৭ কি ৭১৮ সালে প্রথম পিরেনীজ অতিক্রম করেন।

ফ্রান্সের মঠ ও গীর্জার ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে এবং মেরোভিন্জীয়ান দরবারের প্রধান অফিসারদের সঙ্গে একুইটেইন-এর ডিউকদের আত্মকলহের সুযোগে আল-হারূর্ মাঝে মাঝে ফ্রান্সের বুকে অতর্কিত আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী আস্ সামাহ্ ইবনে মালিক আল-খাওয়ালানী এই আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। ৭২০ সালে আস-সামাহ্ সেপ্টিমেনীয়া দখল করেন। সেপ্টিমেনীয়া ভূতপূর্ব ভিসিয়োগথ্ রাজ্যের একটি সামন্ত প্রদেশ ছিল। অতঃপর তিনি নারবোন অধিকার করে তাকে এক বিশাল কেল্লায় পরিণত করেন এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র এখানে রক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী বছর তুলঁতে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তুলঁ একুইটেনের ডিউক ইউডিসের রাজধানী ছিল; তাঁর প্রবল প্রতিরোধে মুসলিম বাহিনী পরাভূত হয়। এই সংগ্রামে আস-সামাহ্ শহীদ হন। এইরূপে একজন জার্মান রাজপুত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করেন। পিরেনীজের ওপারে মুসলমানদের পরবর্তী অভিযান সফল হয় নাই।

আস-সামাহ্'র পর আব্দুর-রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-গাফিকী স্পেনের শাসনকর্তা হন। তিনি উত্তর অঞ্চলে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযান করেন। ৭৩২ খৃস্টাব্দের বসন্তকালের প্রথম ভাগে আব্দুর রহমান পশ্চিম পিরেনীজের পথে অগ্রসর হন। গারোঁন নদীর তীরে তিনি ডিউক ইউড্সিকে পরাজিত করেন—বোর্দোঁ আক্রমণ করে এর গীর্জাসমূহে আগুন লাগিয়ে দেন এবং পয়টিয়ারস্ হয়ে ট্যুরস-এর প্রান্তভূমিতে গিয়ে হাজির হন। গল্দের ধর্ম পুরুষ সেন্ট মার্টিনের মাজার হিসেবে টুর্স গলদের একপ্রকার ধর্মীয় রাজধানী ছিল। এখানে উৎসর্গীকৃত ঐশ্বর্যরাশিই নিঃসন্দেহ রকমে আক্রমণকারীর পক্ষে প্রধান আকর্ষণ ছিল।

এখানে টুর্স এবং পয়টিয়ার্স-এর মাঝখানে ক্লেইন ও ভিয়েন-এর সঙ্গমস্থলে চার্লস মার্টেল আবদুর রহমানের সম্মুখীন হলেন। চার্লস মেরোভিন্জীয়ান দরবারের প্রাসাদ মেয়র ছিলেন। ইউডিস তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চার্লস 'মার্টেল' (হাতুড়ীওয়ালা) উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি হতেই বোঝা যায় যে, চার্লস অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি এর আগে অনেক শত্রু দমন করেন। ইউডিস্ ইতিপূর্বে একুইটেইনে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন; চার্লস তাঁকে উত্তরাঞ্চলে ফিরিঙ্গীদের প্রভুত্বকে নামতঃ স্বীকার করতে বাধ্য করেন। চার্লস হেরিস্টলের পেপিনের জারজ সন্তান ছিলেন। নামে না হলেও কার্যতঃ তিনি রাজ–শক্তি পরিচালনা করতেন।

চার্লসের ফিরিঙ্গী সৈন্যদলের বেশীরভাগই ছিল পদাতিক। তাদের গায়ে ছিল নেকড়ে বাঘের চামড়া আর জটাযুক্ত বাব্রী মাথা হতে কাঁধের উপর দিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছিল। দীর্ঘ সাতদিন পর্যন্ত আবদুর রহমানের অধীনে আরব-বাহিনী আর চার্লসের অধীনে ফিরিঙ্গী সৈন্যদল সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রইল। ছোট ছোট হাতাহাড়ি লড়াই চলতে লাগল। অবশেষে ৭৩২ সালের অক্টোবর মাসের এক শনিবার আরব নেতা অগ্রণী হয়ে আক্রমণ করলেন। ময়দান যখন যোদ্ধাদের হুঙ্কারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তখন ফিরিঙ্গী যোদ্ধারা এক ফাঁপা চতুষ্কোণ তৈরি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্ভেদ্য দেয়ালের মত (একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের ভাষায় এক অনমনীয় বরফখণ্ডের মত) দাঁড়িয়ে গেল। শত্রুদের অশ্বারোহী সৈন্যরা সে দেয়ালে প্রহত হয়ে ফিরে যেতে লাগল। ফিরিঙ্গী সৈন্য স্ব-স্থান হতে বিচ্যুত না হয়ে আক্রমণকারীদিগকে কেটে

টুকরা টুকরা করতে লাগল। আবদুর রহমান নিজেও তাদের হাতে নিহত হলেন। অবশেষে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। শত্রুরা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল।

রাত্রি প্রভাতে শত্রু-শিবিরের নিস্তব্ধতা দেখে চার্লস সন্দেহ করলেন যে, শত্রুরা কোথাও চুপচাপ ওঁত পেতে বসে আছে। তিনি খোঁজ নিতে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। দেখা গেল, রাত্রির অন্ধকারে আরবরা নিরবে শিবির ত্যাগ করে উধাও হয়ে গেছে। চার্লস জয় লাভ করলেন। পরবর্তীকালের কাহিনী-প্রিয় লোকেরা পয়টিয়ার্স বা টুর্‌স-এর এই যুদ্ধকে নানা গল্প-গুজবে সজ্জিত করে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বহুগুণে অতিরঞ্জিত করেছে। খৃস্টানদের পক্ষে এ ছিল তাদের চির-শত্রুদের সামরিক-ভাগ্যে ভাটার শুরু। গিবন ও তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এই দিন আরবদের জয়লাভ ঘটলে আজ লণ্ডন ও প্যারিসে গীর্জার স্থলে দেখা যেত মসজিদ, আকস্‌ফোর্ড ও অন্যান্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে বাইবেলের বদলে ব্যাখ্যাত হত কোরআন। কতিপয় আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে টুর্‌সের যুদ্ধ এক চরম ভাগ্যনিয়ন্ত্রক ঘটনা।

প্রকৃতপক্ষে, টুর্‌সের লড়াই কোন কিছুই চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নাই। আরব-বার্বার তরঙ্গ প্রায় হাজার মাইল দূরস্থ জিব্রাল্‌টার হতে যাত্রা শুরু করে এখন এক স্বাভাবিক নিশ্চল অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। এ তরঙ্গ তার গতি হারিয়ে ফেলেছিল; এর শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বার্বার-আরবের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং পরস্পর হিংসা আবদুল রহমানের সৈন্যদলকে দুর্বল করতে শুরু করেছিল। আরবদের মধ্যেও মনোভাব ও উদ্দেশ্যের ঐক্য ছিল না। একথা সত্য যে, এই দিকে মুসলমানের আক্রমণ রুদ্ধ হল, কিন্তু অন্যান্য দিকে তাদের আক্রমণ চলতেই লাগল। উদাহরণস্বরূপ, ৭৩৪ সালে তারা এভিগ্‌নন অধিকার করল; এর নয় বছর পর তারা লিয়ন্‌স লুণ্ঠন করল এবং ৭৫৯ সাল পর্যন্ত তারা নার্‌বন নিজ দখলেই রাখল। টুর্‌সের এই পরাজয় যদিও আরবদের গতি-রোধের বাস্তবিক কারণ ছিল না, তথাপি বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর আগমনের শেষ সীমারেখা এই পরাজয় দ্বারা নির্ধারিত হল।

৭৩২ খৃস্টাব্দে মহানবীর মৃত্যুর প্রথম শতক। তাঁর অনুগামীরা এখন এক বিপুল সাম্রাজ্যের বিজেতা। এ সাম্রাজ্য বিস্কে উপসাগর হতে সিন্ধু ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এবং আরল সাগর হতে নীলনদের উপরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দামেস্ক ছিল এই মহান সাম্রাজ্যের রাজধানী। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল উমাইয়াদের সুরম্য প্রাসাদ। এইখানে দাঁড়ালে নজরে পড়ত শস্য-শ্যামলা সমতলভূমির অপূর্ব বিথার; তার দক্ষিণ সীমা ছিল বরফের পাগড়ী পরিহিত মাউন্ট হারমন। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবীয়াই এ প্রাসাদের নির্মাতা ছিলেন। এর সন্নিকটে অবস্থিত ছিল উমাইয়া মসজিদ। খলীফা ওলীদ নতুন করে এ মসজিদকে সুসজ্জিত করেন এবং ভাস্কর্য-শিল্পের সেই অপূর্ব মণিতে পরিণত করেন, যা আজো সৌন্দর্য-পিয়াসীদের আকর্ষণ করে।

দর্শন দেওয়ার কামরায় অত্যন্ত দামী কারুকার্যখচিত গালিচায় ঢাকা একটি চতুষ্কোণ চৌকি থাকত। এই-ই ছিল খলীফার সিংহাসন। উৎসব উপলক্ষে দোলায়মান ঝলমল পোশাকে তিনি এই সিংহাসনের উপর আসন করে বসতেন। তাঁর দক্ষিণে তাঁর পিতৃবংশীয়রা নিজ নিজ বয়স অনুযায়ী দাঁড়িয়ে থাকতেন; তাঁর বাম পাশে দাঁড়াতেন তাঁর মাতৃবংশীয়রা। দরবারী, কবি ও দরখাস্তকারীরা দাঁড়াতেন পেছনে। অধিকতর আনুষ্ঠানিক উৎসব সম্পাদিত হত উমাইয়া মসজিদে। উমাইয়া মসজিদ আজো পৃথিবীর মহত্তম উপাসনালয়ের অন্যতম। এমনি একটি উৎসবেই খলীফা ওলীদ নিশ্চয়ই স্পেন বিজয়ী মুসা ও তারিককে তাঁদের বন্দী ও ঐশ্বর্য-সহ অভ্যর্থনা করেছিলেন। ইসলামের আগমন তাঁর শেষ সীমায় এবং ইসলামের প্রথম শাসক-বংশের গৌরব-মহিমা উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছিল।

সামাজিক ও তামদ্দুনিক জীবনের আরম্ভ

আমরা আমাদের কাহিনীর প্রথম বড় অধ্যায়ের শেষাংশে এসে পৌছেছি। ইসলামের বিজয় অভিযান ক্ষান্ত হয়েছে। একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যের ভিতর সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত অশান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে, তথাপি এখন হতে আমাদের কাহিনীর প্রধান বক্তব্য বিষয় হবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-বিজয় ছাড়া অন্য বস্তু ঃ মুসলিম-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ভাবের অগ্রগমন, তমদ্দুনের বিকাশ; সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, চারু-শিল্প এবং ভাস্কর্যশিল্পের অভ্যুদয়—আর তলোয়ারের বিজয় যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, তখন বিভিন্ন তমদ্দুনের ব্যাখ্যার মারফত কেমন করে মানুষ তার আধ্যাত্মিক বিজয়ের ক্ষেত্রে চলে যায়, তারই প্রাণদায়িনী বিবরণ।

এ একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দামেস্কের সাধারণ জীবন যাত্রা যেমন ছিল, তা সে শহরের বর্তমান জীবন-যাত্রার চেয়ে বিশেষ ভিন্ন ছিল না। আজকের মত তখনো দামেস্কের সংকীর্ণ রাজপথে দেখা যেত, ফিলা পাজামা, লাল সরু-ঠোঁট জুতা ও বিরাট পাগড়ী পরিহিত পথিকের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে মরুভূমির রোদ-পোড়া বেদুঈন—পরনে তার ঢিলা আল-খেল্লা, মাথায় ইকালবদ্ধ রুমাল। মাঝে মাঝে পথে দেখা যায় ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত কোন একজন ইফ্‌রান্‌জী (ফিরিঙ্গী)—আজো ইউরোপীয়রা সবাই ঐ নামেই পরিচিত। এখানে সেখানে মাঝে মাঝে দেখা যায়, দামেস্কের অভিজাত–ঘোড়ার পিঠে সওয়ার' গায় সাদা রেশমী 'আবা', কোমরে ঝুলানো তলোয়ার কিংবা নেজা। শহরে ওরাই ধনীকশ্রেণী। বোরখায় সম্পূর্ণ রকমে ঢাকা দুই-চারটি রমনী রাস্তা পার হয়; অন্যরা চুপে তাদের বাড়ীর পরদাওয়ালা জানালার ফাঁকে ফাঁকে বাজার ও হাওয়া-খাওয়ার ময়দানের দিকে চেয়ে থাকে। রাস্তায় মানুষের হল্লার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শরবত আর হালুয়া বিক্রেতারা প্রাণপণে চীৎকার করে। আবাদী জমির ও মরুভূমির উৎপন্ন শস্য পিঠে বয়ে চলেছে গাধা উটের বহর। শহরের হাওয়া গন্ধ-ভারাক্রান্ত। দুনিয়ায় যত রকম সুগন্ধ আছে, সব ঐ হাওয়ার বুকে বাসা বেঁধেছে।

অন্যান্য শহরের মত দামেস্কেও আরবরা নিজ নিজ কওমের আনুগত্য মোতাবেক স্বতন্ত্র মহল্লায় বাস করত। দামেস্ক, হিম্‌স, আলেপ্পো ও অন্যান্য শহরে এই মহল্লাগুলির পার্থক্য আজো সুস্পষ্ট। প্রত্যেক বাড়ীর ফটক পার হলেই সম্মুখে ছিল উঠান। সাধারণতঃ, এসব উঠানের মাঝখানে পানির বড় চৌবাচ্চা থাকত আর চৌবাচ্চার মাঝখানে থাকত ফোয়ারা । ফোয়ারার মুখ হতে হীরক চূর্ণের মত পানির কণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। চৌবাচ্চার ধারে হয়তো থাকত একটা কমলালেবুর গাছ। উঠানের চারপাশ ঘিরে ঘরের কামরা সাজানো থাকত। বড় বড় বাড়ীতে এবাদতখানাও থাকত। উমাইয়াদের এ এক অবিনশ্বর গৌরব যে, তাঁরা দামেস্কে পানি সরবরাহের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা তৎকালে সমগ্র প্রাচ্যের আর কোথাও ছিল না। আর সে ব্যবস্থা আজো চালু আছে।

সাম্রাজ্যর সর্বত্র বাসিন্দারা চারটি সামাজিক ভাগে বিভক্ত ছিল। শাসক–শ্রেণীর মুসলমানরাই স্বভাবতঃ উচ্চতম শ্রেণীর ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন খলীফার পরিবার ও বিজেতা আরব অভিজাত-গোষ্ঠী। কোথায় এদের সংখ্যা কত ছিল বলা কঠিন। তবে হিম্‌স ও দামেস্কে এঁদের সংখ্যা ছিল ২০ হতে ৪৫ হাজার।

আরব-মুসলমানদের পরবর্তী স্তর-ভুক্ত ছিল নবদীক্ষিত মুসলমানগণ। নীতি হিসেবে এরা ইসলামের সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকারের অধিকারী ছিল। উমাইয়া আমলের প্রায় আগা-গোড়াই জমির মালিকরা ধর্মনির্বিশেষে খাজনা দিত। তথাপি সরকারী আয় কমে যাওয়ার একটা নিঃসন্দেহ কারণ ছিল, ইসলামে নব দীক্ষা।

এই নব-দীক্ষিত মুসলমানরাই মুসলিম সমাজের নিম্নতম স্তর-ভুক্ত ছিল। তাদের এ সামাজিক মর্যাদাহীনতার জন্য তারা হামেশাই বিক্ষুব্ধ থাকত। আর এই জন্যই আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, বার বার তারা ইরাকে শীয়া দল ও ইরানে খারেজী দলে যোগদান করেছে এবং তার ফলে ঘটেছে অন্তহীন আত্মকলহ ও রক্তপাত। এদের কেউ কেউ উত্তাপে বালি হয়ে সূর্যের চেয়ে দুঃসহ ছিল। তাদের ধর্মোৎসাহ অনেক সময় ধর্মোন্মাদনায় পরিণত হয়ে অমুসলমানদের উপর অত্যাচারের কারণ হত। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরমত-অসহিষ্ণু ছিল, তাদের মধ্যে ইহুদী খৃষ্টান ধর্ম হতে ইসলামে দীক্ষিতের দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

মুসলমান সমাজে স্বভাবতঃ এরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এবং চারুশিল্পের অনুশীলনে প্রথম আকৃষ্ট হয়; কারণ, এদেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল দীর্ঘতম। এরা মুসলমান আরবদের তুলনায় যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় শ্রেষ্ঠতর স্থান দখল

করতে লাগল, তখন তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। বিজেতা আরবদের সঙ্গে বিয়ে-শাদী করে তারা আরব রক্তে মিশ্রণ আমদানী করল এবং পরিণামে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আরব রক্তের পূর্ব-বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না।

তৃতীয় সমাজিক শ্রেণী গঠিত ছিল, সয়ে-নেওয়া-সম্প্রদায়সমূহের দ্বারা— যারা প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত ধর্মে বিশ্বাসী ছিল—তথাকথিত 'জিম্মী' দল—খৃস্টান, ইহুদী, সেবীয়ান। এদের সঙ্গে মুসলমানরা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এই সয়ে-নেওয়া ধর্মের অনুসরণকারীগণকে নিরস্ত্র করে মুসলিম-আশ্রয়ে রক্ষা করা হত এবং এর বিনিময়ে তাদের একটা কর দিতে হত। হযরত মুহম্মদই (সঃ) এ নীতির প্রথম প্রবর্তন করেন। এর এক কারণ ছিল, বাইবেলের প্রতি মহানবীর শ্রদ্ধা এবং অন্য কারণ ছিল, কোন কোন খৃস্টান কওমের অভিজাত-সুলভ আত্মীয়তা।

জিম্মীরা তাদের এই সমাজ-স্তরে ভূমি-কর ও মাথা-পিছু কর হতে অনেকাংশে মুক্ত ছিল। কোন মামলায় মুসলমান বিজড়িত না থাকলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-ঘটিত ব্যাপারে তারা কার্যতঃ তাদের ধর্মগুরুর অধীনেই বাস করত। মুসলিম-কানুন এত পবিত্র যে, তাদের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারত না। এই আইন-বিধির মৌলিক বংশ তুর্ক-সাম্রাজ্যে জারী ছিল এবং সিরীয় ও ফিলিস্তিনের অছি-জামানাতেও তা মরে যায় নাই, দেখা গেছে।

সমাজের নিম্নতম-স্তরে ছিল গোলাম। অতি প্রাচীনকাল হতে সেমিটিক সমাজে দাস প্রথার চল ছিল। ইসলাম এ প্রথাকে বর্জন করে নাই। ওল্ড টেস্টামেন্ট দাস-প্রথাকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলেছে; তবে এ গ্রন্থ দাসদের ভাগ্যকে অনেকখানি উন্নত করেছিল। ধর্মীয় আইন এক মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানকে গোলাম করা হারাম করেছে। আর বাইরের কোন গোলাম ইসলাম কবুল করলে তাকে আযাদ করার প্রেরণা দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্য হতে গোলাম সংগ্রহ করা হত। এ যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে নারী এবং শিশুও থাকত। অবশ্য মুক্তি-মূল্য দিয়ে এদের আযাদ করে নেওয়া চলত। বাজারে খরিদ করে, কখনো বা অতর্কিত আক্রমণ দ্বারাও গোলাম সংগৃহীত হত। অল্পকাল মধ্যে দাস-ব্যবসায় মুসলিম-জগতের সর্বত্র জেঁকে উঠল এবং খুব লাভজনক তেজারতিতে পরিণত হল। পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার কতক গোলাম কৃষ্ণকায় ছিল; চীন-তুর্কীস্তানের গোলাম পীতকায় ছিল, নিকট প্রাচ্য কিংবা পূর্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপের গোলাম ছিল শ্বেতকায়। স্পেনীয় গোলামদের প্রত্যেকের দাম ছিল হাজার দিনার; তুর্কী গোলামদের প্রত্যেকের দাম ছিল ছয়শ' দিনার। ইসলামী বিধান মোতাবেক বাঁদীর গর্ভে গোলাম বা অন্য কারো কিংবা স্বয়ং মনিবের ঔরসজাত সন্তান (যেখানে মনিব সন্তানকে নিজ ঔরসজাত বলে

অস্বীকার করত) গোলামরূপেই জন্মগ্রহণ করত। কিন্তু আযাদ নারীর গর্ভে গোলামের ঔরসজাত সন্তান আযাদরূপে ভূমিষ্ঠ হত।

বিস্তীর্ণ বিজয়ের ফলে গোলাম দ্বারা মুসলিম-সাম্রাজ্য কি ভয়াবহরূপে প্লাবিত হয়েছিল, পরবর্তী অতিরঞ্জিত হিসেব হতে তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় ঃ মুসা উত্তর আফ্রিকা হতে ৩ লক্ষ বন্দী নিয়ে আসেন; এর ৬০ হাজার বন্দী তিনি খলীফাকে পাঠিয়ে দেন এবং স্পেনের গথ্ অভিজাতদের ঘর হতে ৩০ হাজার কুমারীকে বন্দী করেন — তুর্কীস্তানের একজন মুসলিম সেনাপতি একা ১ লক্ষ লোককে বন্দী করেন।

মনিব বাঁদীকে রক্ষিতা হিসেবে রাখতে পারত, কিন্তু বিয়ে করতে পারত না। এমন মিলনের সন্তানেরা মনিবের সন্তান বলে গণ্য হত; সুতরাং তারা আযাদ হিসেবে জন্মগ্রহণ করত। কিন্তু এতে রক্ষিতার সম্মান কেবল 'সন্তানের জননী' পর্যন্তই উন্নীত হত—তাকে মনিব-স্বামী বিক্রি বা দান করতে পারত না এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে আযাদী লাভ করত। ক্রমাগত আন্তঃবিবাহের ফলে আরবজাতির সঙ্গে অনারবদের এই যে মিশ্রণ ঘটছিল, এ প্রক্রিয়ায় দাস-ব্যবসায় নিঃসন্দেহরূপে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

আমরা আগে বলেছি যে, মরুভূমি হতে আগত আক্রমণকারীরা তাদের সঙ্গে বিজিত দেশে কোন জ্ঞান-চর্চার ঐতিহ্য কিংবা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আনে নাই। উমাইয়াদের জামানা আইয়ামে-জাহেলিয়াতের সন্নিকট ছিল বলে—আর এ জামানায় অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহে মুসলমানরা এত ব্যস্ত ছিল এবং মুসলিম জগতের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এমন অনিশ্চিত ছিল যে, সে প্রাথমিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে নাই। কিন্তু বীজ এই সময়েই বপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তী বংশের আমলে বাগদাদে বৃক্ষ ফল-ফুলে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। তার মূল নিঃসন্দেহ রকমে পূর্ববর্তী জামানার গ্রীক, সিরিয়া ও পারস্য সংস্কৃতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। উমাইয়া জামানা মোটের উপর 'ডিমে তা দেওয়া'র জামানা ছিল।

পারসিক, সিরিয়ান, কাপ্ত, বার্বার এবং অন্যান্যদের ইসলাম কবুল এবং আরব রমনীর পানি গ্রহণের ফলে প্রাথমিক যুগে আরব ও অনারবের মধ্যে যে বিভেদ-দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছিল, তার ক্রমে ধসে পড়ল। মুসলমানের মধ্যে কে কোন্ জাতি হতে উদ্ভূত, সে প্রশ্ন পেছনে পড়ে গেল। গোড়ায় জাতিতে যে যা-ই থাক্ না কেন, হযরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসরণ করলেই সে আরব জাতি বলে গণ্য হয়ে যেত। অতঃপর কোন মানুষ আদতে সে যে জাতির অন্তর্গতই থাক্ না কেন, ইসলাম গ্রহণ কলেই এবং আরবী ভাষায় কথাবার্তা বল্লে ও লিখলেই সে আরব হয়ে যেতে পারত। আরব সভ্যতার ইতিহাসের এক বিশিষ্ট

লক্ষণ। আরবী ভাষা-ভাষী মানুষ এতকাল ছিল কেবল আরব, এখন সে হয়ে পড়ল আন্তর্জাতিক। কাজেই যখন আমরা বলি 'আরব চিকিৎসা শাস্ত্র', 'আরব-দর্শন', অথবা 'আরব গণিত', তাতে এ বুঝায় না যে, ঐ আরব চিকিৎসা শাস্ত্র বা দর্শন বা গণিত কেবল আরবদের উপদ্বীপের বাসিন্দাদের সাধনার ফল। তাতে এই বুঝায় যে, ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় লিখিত—এর লেখকেরা প্রধানতঃ খেলাফতী আমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন; সে লেখকেরা ছিলেন পারসিক, সিরিয়াবাসী, মিসরবাসী, আরববাসী, খৃস্টান, ইহুদী বা মুসলিম এবং তাঁরা তাঁদের উপকরণের কতকাংশ সংগ্রহ করেছিলেন গ্রীক, আরামিয়ান, ইন্দো-পারসিক অথবা অন্য উৎসমূল হতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিজ্ঞান-সম্মত অধ্যয়ন শুরু হয় পারস্যের সীমান্ত ভূমিতে এবং প্রধানতঃ বিদেশী নও-মুসলিমরাই এ অধ্যয়ন চালিয়ে যান। নও-মুসলিমদের অনেকে কোরআন অধ্যয়ন করতে সরকারী পদে স্থান পেতে এবং বিজেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেই স্বভাবতই আগ্রহান্বিত ছিল। প্রধানতঃ, এই প্রয়োজন মিটানোর জন্যই উপরোক্ত অধ্যয়নের প্রথম তাগিদ আসে। কথিত আছে, আরবীর আদি ব্যাকরণ রচিত হয় এক খলীফার এই ফরমান অনুসারে যে, শব্দ প্রকারণের তিন ভাগ—বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং অব্যয়। আসলে কিন্তু আরবী ব্যাকরণের বিকাশ ঘটে দীর্ঘকালব্যাপী, ধীর গতিতে এবং তার উপর গ্রীক তর্ক–শাস্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

কোরআন অধ্যয়ন এবং তার তফ্সীরের প্রয়োজন হতে উদ্ভূত হয় শব্দ-তত্ত্ব, অভিধান রচনা এবং মুসলমানদের সেই একান্ত নিজস্ব সাহিত্য-সাধনা হাদীস-বিজ্ঞান। হাদীসের শব্দগত মানে—বর্ণিত বস্তু, আখ্যান; পরিভাষা হিসেবে এর মানে হচ্ছে,. মহানবী বা তাঁর কোন সাহাবীর কোন কাজ বা কথার বিবরণ। কোরআন এবং হাদীসের ভিত্তির উপরই রচিত হয় ধর্ম-তত্ত্ব ও আইন-কানুন। বর্তমান যুগে বিধান-তত্ত্ব (জুরিস্ প্রুডেন্স) বলতে যা বুঝায়, ইসলামে আইন তার উপর তত নির্ভরশীল নয়, যত নির্ভরশীল ধর্মের উপর। তালমুড এবং অন্যান্য সূত্রে রোমক আইন নিঃসন্দেহ রকমে উমাইয়াদের আইন প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল; তবে সে প্রভাবের পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই।

অমরা এই যুগে আরব-বিজ্ঞানের আরম্ভ দেখতে পাই। একজন ইহুদী আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক খৃস্টান পাদ্রীর গ্রীক ভাষায় লিখিত একখানি বইয়ের অনুবাদ করেন। আরবী ভাষার চিকিৎসা সম্বন্ধে এই-ই প্রথম পুস্তক চিকিৎসা-শাস্ত্রের মত আল-কিমিয়াও পরবর্তীকালে আরব অবদানে বিশেষ পরিপুরি লাভ করে এবং আল-কিমিয়া সংক্রান্ত সাধনাও এই প্রাথমিক যুগেই শুরু হয়।

দামেস্কের দরবারে কবিতা ও সঙ্গীত বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অবশ্য সমাজের রক্ষণশীলেরা সঙ্গীতের সমর্থক ছিল না; তারা মনে করত, সুরা পান ও

জুয়া খেলার মত গানের আনন্দ-উৎসবকে মহানবী হারাম করে গেছেন। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রেই উমাইয়াদের আমলে সাংস্কৃতিক প্রগতি সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে। উমাইয়াদের আগের আমল ছিল কঠোর বিজয়ের আমল। আরবরা কবির জাতি হওয়া সত্ত্বেও এ যুগে সে জাতির মধ্যে কোন কবির আবির্ভাব হয় নাই। দুনিয়াদার উমাইয়াদের ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুরার দেবী, গানের দেবী এবং কবিতা দেবীদের সঙ্গে পুরাতন সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হল। আরবী ভাষায় এই প্রথম প্রেমের কবি পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করল।

মুসলিম আরবদের বেলায় চারু-শিল্প সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করে তাদের ধর্মীয় দালান-কোঠা নির্মাণে। মুসলিম স্থপতিবিদ বা তাদের নিযুক্ত লোকেরা দালান-ইমারত নির্মাণের এক নব-পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। তাদের নির্মিত দালান-কোঠা একাধারে সরল ও মহিমান্বিত ছিল। পুরাতন নমুনার উপরই এ পদ্ধতির বুনিয়াদ ছিল; কিন্তু তথাপি এ পদ্ধতিতে তাদের নব ধর্মের অন্তর্বাণী যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। এই জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলে যে ইসলামী-সভ্যতার বিকাশ ঘটে, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মিলে মুসলমানের মসজিদে। ইসলাম এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে যে তামদ্দুনিক আদান-প্রদান হয়েছে, মসজিদ ছাড়া তার স্পষ্টতর নিদর্শন বোধহয় আর কোথাও নাই।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে হযরত মুহম্মদের (সঃ) মদীনাস্থ সাদা-সিধা মসজিদটিই জামে মসজিদের মূল আদর্শ ছিল। এ মসজিদটি ছিল একটি ছাদহীন খোলা অঙ্গন; তার চারদিকে ছিল রোদে-পোড়া ইটের দেয়াল। রোদ হতে আত্মরক্ষার জন্য মহানবী পরে সংলগ্ন দালান হতে একটি সমতল ছাদ বাড়িয়ে এনে সমস্ত অঙ্গন ঢেকে দেন। এ ছাদ তৈরি ছিল খেজুর পাতা আর কাদায় এবং স্থাপিত ছিল খেজুর গাছের খামের উপর। খেজুর গাছের একটা খণ্ড মাটিতে পুঁতে মেহরাব তৈরি করা হয়; মহানবী তারই উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে খোত্‌বা দিতেন। পরে খেজুর গাছের এ-খণ্ড তুলে ফেলে সেখানে সিরিয়ার গীর্জার অনুকরণে তিন ধাপ যুক্ত একটি কাঠের মঞ্চ স্থাপিত হয়। সুতরাং জামে মসজিদের জন্য সাধারণভাবে যা দরকার এখানে আমরা তার একটা মোটামুটি পরিচয় পাই—একটি অঙ্গন, মুসুল্লীদের শীতাতপ হতে রক্ষার জন্য খানিকটা ছাদ এবং একটি খোত্‌বা-মঞ্চ।

পরবর্তীকালে আরবরা পশ্চিত এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত উন্নত ভাস্কর্য-শিল্পের পরিচায়ক অগণ্য ভগ্ন ও অভগ্ন দালান-কোঠার অধিকারী হয়। কেবল তা-ই নয়, বিজিত জাতিরা যুগ-যুগান্তর হতে যে জীবন্ত শিল্প-জ্ঞান উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল, আরবরা তার নিয়ন্ত্রণ–ভার পায়।

মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনে এই জ্ঞান প্রযুক্ত হয় এবং তারই ফলে কালক্রমে বিকাশ লাভ করে সেই সুন্দর শিল্প, যাকে কেউ বলে সারাসেনী, কেউ বলে আরবী, কেউ বা বলে মুসলিম আর্ট। 'মুহম্মদী আর্ট' শব্দ ব্যবহারে মুসলমানদের আপত্তি আছে। খৃস্টানরা খৃস্টের উপাসনা করে বলে খৃস্টান; মুসলমানরা হযরত মুহম্মদের (সঃ) উপাসনা করে না; কাজেই তারা 'মুহম্মদী' নয়।

বায়তুল মোকাদ্দেস বাইবেলের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া, হযরত মুহম্মদের (সঃ) মে'রাজে যাওয়ার কালে এ স্থান ছিল তাঁর এক মঞ্জিল। এ উভয় কারণে সেই প্রাথমিক যুগেই বায়তুল মোকাদ্দেস মুসলমানদের চোখে পবিত্র হয়ে ওঠে। পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃস্টান এবং মুসলিম ঐতিহ্যে পবিত্র এক ভূখণ্ডের উপর ৬৯১ সালে পাথরের গম্বুজ নির্মিত হয়। কথিত আছে, ঐ স্থানেই ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাইলকে কোরবান করতে চেয়েছিলেন। এই গম্বুজ নির্মাণে সম্পূর্ণ নতুন স্থাপত্য-রীতি অনুসৃত হয় এবং খৃস্টানদের প্রধান গীর্জার চেয়ে সুন্দর করার জন্য এ প্রস্তর-গম্বুজকে এমন অভাবনীয় সুন্দর কারুকার্যে খচিত করা হয় যে, আজ পর্যন্তও তার চেয়ে সুন্দর অমন কিছু আর কোথাও নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

দামেস্কের জামে মসজিদের দিকে চাইলে আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কিভাবে আরব-সভ্যতার' বিকাশ ঘটে। ৭০৫ সালে খলীফা ওলীদ দামেস্কের খৃস্টান গীর্জার স্থান নিয়ে নেন। এ স্থানে আদি যুগে ছিল জুপিটারের মন্দির; খৃস্টানরা এ স্থানকে উৎসর্গ করে সেন্ট জনের নামে। এখানেই খলীফা উমাইয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। খৃস্টানদের গীর্জার কতটুকু মসজিদ নির্মাণকালে সংরক্ষিত হয়েছিল, তা বলা কঠিন। প্রাচীন গীর্জার বুরুজের উপর দক্ষিণের দুটি মিনার স্থাপিত; কিন্তু উত্তরের মিনার ওলীদ নিজে তৈরী করেছিলেন। এই মিনার আলোক-স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং এরই অনুকরণে সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে বহু মিনার নির্মিত হয়। যে সকল খাঁটি মুসলিম মিনার আজো টিকে আছে, তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন। এই মসজিদ নির্মাণে ওলীদ পারসিক, গ্রীক এবং ভারতীয় কারিগর মোতায়েন করেন। ইদানীং যে প্রাচীন দলিল-পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিছু কিছু মাল-মসলা ও কারিগর মিসর হতেও আনীত হয়েছিল।

উপরে যা বর্ণিত হল এবং পরে যা বর্ণিত হবে, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হবে যে, আরবরা দুনিয়াকে যুদ্ধ-বিদ্যায় তাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জনেরও ক্ষমতা ছিল।

গৌরবের যুগে বাগদাদ

আরবগণ সৌন্দর্য-চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে যেমন আত্মনিয়োগ করে, অনাচারেও তারা তেমনি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের কিঞ্চিৎ আগে একজন বাঁদীর গর্ভজাত খলীফা উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। তাঁর পরবর্তী দুই খলীফাও বাঁদীর গর্ভজাত ছিলেন—আর এঁরাই ছিলেন উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা। খোজা-প্রথা ইতিমধ্যেই পূর্ণ বিকাশ-লাভ করে এবং এই খোজাদের সাহায্যেই হেরেম প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সম্ভব হয়। অপরিমিত ঐশ্বর্য ও গোলাম-বাঁদীর ছড়াছড়ি হেতু বিলাস-সম্ভোগ চরমে ওঠে। শাসকগোষ্ঠীতে খাঁটি আরব-রক্ত কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্বত্র নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

এই অধোঃগতি উমাইয়া বংশকে অনেকখানি দুর্বল করে ফেলে। উত্তর ও দক্ষিণ আরবের কওমদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মকলহ উমাইয়াদের দুর্বলতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। প্রাক-ইসলামী যুগেও এমন গোষ্ঠীগত বিভেদ-প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। এখন সেই ব্যাধি চরমে গিয়ে ওঠে এবং অনন্ত বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করতে থাকে। সিন্ধুনদের তীরে তীরে, সিসিলীর উপকূলে উপকূলে এবং সাহারার সীমান্তে সীমান্তে এই প্রাচীন কলহ আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে দুটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় ঃ কাইস্ ও ইয়ামন। লেবানন ও ফিলিস্তিনে আধুনিক যুগ পর্যন্তও এ কলহ জীবন্ত ছিল। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এ দুই দলের মধ্যে দস্তুরমত লড়াই হয়েছে।

বংশের মধ্যে কার পর কে খলীফার সিংহাসনে বসবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় অনিশ্চয়তা উমাইয়া বংশকে আরো দুর্বল করে তোলে। মুয়াবীয়া তাঁর পুত্রকে সিংহাসনের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। আরবের সনাতন রীতি ছিল যে, সমাজের বয়োঃজ্যেষ্ঠই উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু এ-সত্ত্বেও শাসক পিতা স্বভাবতই তাঁর পুত্রকে সিংহাসন দিতে লালায়িত হতেন। ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠত।

এ আমলের ইতিহাসে 'জনসাধারণ' বা 'জাতির' উল্লেখ কমই মিলে। অথচ এই জনসাধারণ বা জাতির আনুগত্যই সিংহাসন লাভের একমাত্র দাবী হয়ে

দাঁড়ায়। এই আনুগত্য প্রকাশ করা হত নেতাদের মারফত। জনসাধারণ শক্তির চূড়ান্ত উৎস হওয়া সত্ত্বেও এ আমলে তারা মাঝে মাঝে উচ্ছৃঙ্খল গণ-বিক্ষোভ দ্বারা গোলযোগের সৃষ্টি করত। তাদের ইচ্ছাকে শাসন-শক্তির নিকট কার্যকরী করার দিন তখনো দূরে ছিল।

উমাইয়াদের জাতি-ভাই আব্বাসীয়রা ৭৪৭ সালে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আব্বাসীয়রা মহাবীর অন্যতম পিতৃব্য আল-আব্বাসের বংশধর। এই সময় আব্বাসীয়দের বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং উমাইয়া খান্দান ধ্বংস হয়ে যায়। জনৈক আব্বাসীয় সেনাপতি ক্ষমতাচ্যুত উমাইয়া পরিবারের আশি জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে এক ভোজে দাওয়াত করেন এবং ভোজের সময় তাদের প্রত্যেককে কেটে টুকরা করে তাদের মৃত ও অর্ধমৃত দেহের উপর চামড়ার চাদর বিছিয়ে ভোজন করেন। প্রথম আব্বাসীয় খলীফা নিজকে আস্-সাফ্ফা (রক্তপাতকারী) বলে পরিচয় দিতেন এবং পরে এ-ই তাঁর উপনাম হয়। আস্-সাফ্ফার এই কাজের ফল দূরগামী ছিল। নতুন রাজবংশ তাদের নীতি কাজে পরিণত করার জন্য জোর-জুলুমের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। এ জামানার জল্লাদ্রা একটি চামড়াকে তাদের গালিচা হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম সেই চামড়া খলীফার সিংহাসনের পাশে তার অনুবদ্ধ হিসেবে স্থান লাভ করল। আব্বাসীয় খলীফারা কোনদিনই উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেনের উপর শাসন-পরিচালনা করে নাই; কিন্তু তারা পরবর্তী পাঁচশ' বছর পর্যন্ত মুসলিম-জগতের পূর্বাংশ শাসন করেছে। তাদের বংশের সপ্ত-ত্রিংশ খলীফা ১২৫৮ সালে মোগলদের হাতে নিহত হন। প্রকৃতপক্ষে আব্বাসীয়দের-আমলকেই ইসলামী সভ্যতার সোনার যুগ বলা যায়। বাগদাদ আব্বাসীয় খলীফাদের সৃষ্টি। এই বংশের দ্বিতীয় খলীফা তাইগ্রিস নদীর পশ্চিম-পারে এর পত্তন করেন। এইখানে প্রাচীনযুগের কয়েকটি মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। খলীফা তাঁর রাজধানীর জন্য এই স্থান নির্বাচন কালে বলেন ঃ 'এখানে সুন্দর একটা সেনা-নিবাস হবে। তা'ছাড়া, এই তাইগ্রিস নদীর সাহায্যে আমরা সুদূর চীন পর্যন্ত বহু দেশের সংগে সংযোগ স্থাপন করতে পারব। সমুদ্রের ঐশ্বর্য যা পাওয়া যাবে, নিয়ে আসতে পারব। মেসোপটেমীয়া, আর্মেনিয়া এবং তাদের সন্নিহিত স্থান হতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে পারব। এর উপর, কাছেই আছে ইউফ্রেতিস। এর মধ্য দিয়ে সিরিয়া, আর-রাক্কা এবং তৎসলগ্ন স্থান হতে বহু জিনিস আমরা আনতে পারব।' এ নির্বাচন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ছিল। এক লক্ষ কারিগর ও ওস্তাগর চার বছর ক্রমান্বয়ে কাজ করে চলে। এমনিভাবে জেগে ওঠে এ স্বপ্নের শহর।

শহরটি গোলাকার ছিল। এইজন্য এর আর এক নাম ' গোল শহর'। শহরের চারপাশে ছিল পর পর দু'টি পাকা দেয়াল। তারপরে ছিল একটি

গভীর পরিখা—তার পরে ছিল ইটের আরো একটি দেয়াল—৯০ ফিট উঁচু। এই শেষ দেয়াল কেন্দ্রস্থানকে ঘিরে রাখত। দেয়ালের চারপাশে চারটি ফটক ছিল এবং সেই ফটকের ভিতর দিয়ে চারটি রাজ-পথ নির্গত হয়ে সাম্রাজ্যের চারকোণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব দেয়াল-বৃত্তের মাঝখানে অবস্থিত ছিল খলীফার প্রাসাদ। প্রাসাদের এক নাম ছিল সোনার দরজা—অন্য নাম ছিল সবুজ গম্বুজ। প্রাসাদের কাছেই ছিল বিশাল মসজিদ। দরবার-মহলের গম্বুজটি উচ্চতায় ছিল একশ' ত্রিশ ফিট। এই গম্বুজ অনুসারেই প্রাসাদের অন্যতম নাম হয়। পরবর্তীকালের একটি উপ-কথায় পাওয়া যায় যে, এই গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়ানো ছিল নেজা হাতে একজন অশ্বারোহী এবং বিপদের সময় নেজাটি সেই দিকে মুখ করে থাকত, যে দিক হতে দুশমনের আগমন সম্ভাবনা থাক্‌তো। কিন্তু একজন আরব ভৌগোলিক বলেন যে, নেজাটি বরাবর একই দিকে প্রসারিত ছিল। তাই বলে এই একই দিক হতে সর্বদা দুশমনের আগমণের আশঙ্কা আছে, মুসলমানেরা এমন আজগুবী কথা বিশ্বাস করার মতো বোকা ছিল না।

নতুন রাজধানীর এই অবস্থানের ফলে প্রাচ্য-দেশসমূহ হতে নব নব ভাবের আগমন পথ খুলে যায়। আরবের জীবনবাদ ইরানী প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার করে। খলীফা আর আরবের শেখের মত রইলেন না; তিনি ইরানী বাদশাহ্‌র মত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেন। ক্রমে ইরানী উপাধি ইরানী শরাব, ইরানী পত্নী ও উপপত্নী, ইরানী সঙ্গীত ও ভাবধারা প্রধান্য বিস্তার করে। তাদের প্রভাবে আদিম আরব-জীবনের রুক্ষতা দূর হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের এক নব-যুগের দুয়ার খুলে যায়। কেবল দুই বিষয়ে আরবরা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হয় : ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্ম এবং আরবী সরকারী-ভাষা রয়ে যায়।

নবম শতাব্দীর শুরুতে দুইজন বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট ইতিহাসের দিগন্তে দেখা দেন! পাশ্চাত্যে শার্লেমেন আর প্রাচ্যে খলীফা হারুনর-রশীদ। এ দুইয়ের মধ্যে হারুন নিঃসন্দেহ রকমে অধিকতর শক্তিশালী ও উন্নততর সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। স্বকীয় স্বার্থের খাতিরে এঁরা দুই জন বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। শার্লেমেন হারুনের বন্ধুত্ব কামনা করেন এইজন্য, যাতে হারুন শার্লেমেনের শত্রু বাইজেন্টাইনদের সাহায্য না করেন। আবার হারুন শার্লেমেনের বন্ধুত্ব কামনা করেন এইজন্য, যাতে শার্লেমেন হারুনের বিপজ্জনক দুমশন স্পেনের উমাইয়াদের সাহায্য না করেন। কারণ, ইতিমধ্যে উমাইয়াদের এক শাখা স্পেনে এক মহাশক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ে তোলেন। পাশ্চাত্য লেখকদের মতে—এই দুই সম্রাট তাঁদের বন্ধুত্বের পরিচয় হিসেবে নিজেদের মধ্যে দূত ও উপহার আদান-প্রদান করেন। এ আমলের একজন ফিরিঙ্গী লেখককে কেউ কেউ শার্লেমেনের সেক্রেটারীরূপে বর্ণনা করেছেন। ইনি বলেন যে, 'পাশ্চাত্যের মহান

সম্রাটের দূত পারস্যের রাজা হারুনের নিকট হতে বহু দামী সওগাতসহ ফিরে এলেন।' এ সওগাতের মধ্যে ছিল কাপড়-চোপড়, গন্ধ-দ্রব্য ও একটি হাতী। এ বিবরণে আরও পাওয়া যায় যে, এ সওগাতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কাজ করা ঘড়ি ছিল। হারুন তাঁর প্রদত্ত উপহারগুলির মধ্যে একটি অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র দিয়ে ছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা বহু মনোরম কাহিনীর মত সম্পূর্ণ অলীক। মূল বিবরণে 'ক্লেপসিড্রা' শব্দটির ভুল অনুবাদ হতে এ কাহিনীর উদ্ভব। শব্দটির আসল মানে হচ্ছে, পানির সাহায্যে সময় পরিমাপ করার একটি কৌশল। স্বভাবতঃ ঘড়িটি সম্পর্কেই এ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছিল। হারুন বায়তুল মোকাদ্দেসের বড় গীর্জার চাবি শার্লেমেনের নিকট পাঠিয়েছিলেন বলে যে কাহিনী শুনা যায়, তা-ও ভিত্তিহীন। এইসব উপহার ও দূত বিনিময় নাকি হয় ৭৯৭ সাল হতে ৮০৬ সালের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ সম্বন্ধে মুসলিম লেখকেরা একদম চুপ। অন্য বহু দূত ও উপহার বিনিময়ের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি হরফও তাঁরা উচ্চারণ করেন নাই।

হারুনের আমলে (৭৮৬—৮০৯) বাগদাদের বয়স পঞ্চাশেরো কম ছিল; অথচ এই স্বল্পপরিসর সময়ের মধ্যে বাগদাদ একদম শূন্য হতে মহা ঐশ্বর্যশালী ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে ওঠে। সে যুগে এই-ই ছিল বাইজানটিয়ামের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী বাগদাদেরও ঐশ্বর্য-মহিমা বেড়ে চলে। বাগদাদ হয়ে ওঠে এ দুনিয়ার অতুল্য নগরী।'

হেরেম, খোজাদের আবাস, অন্যান্য আমলাদের ইমারতসহ খলীফার প্রাসাদ 'গোল শহরের' তিনভাগের একভাগ জুড়ে ছিল। প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ছিল, তাঁর মোলাকাত মহল। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ গালিচা, পরদা, সোফা ইত্যাদিতে সুসজ্জিত থাকত এ মহলটি। খলীফার বেগম ছিলেন জোবায়দা—আগের সম্বন্ধে চাচাতো বোন। পরবর্তী যুগের লোকেরা খলীফার জীবনকে যে গৌরব-মহিমায় মণ্ডিত করেছে, বেগম জোবায়দা তার আংশিক অধিকারিণী। মণি-মাণিক্য খচিত সোনা-রূপার বাসনপত্র ছাড়া অন্য বাসন জোবায়দার টেবিলে স্থান পেত না। তিনিই প্রথম তাঁর জুতা বহুমূল্য মণি-মাণিক্যে খচিত করেন। কথিত আছে, হজ্ করতে যাওয়া উপলক্ষে তিনি ত্রিশ লক্ষ দিনার ব্যয় করেন। এই অর্থের আংশিক ব্যয়ে বিশ মাইল দূরের এক নদী হতে খাল কেটে মক্কা শরীফে পানি আনা হয়।

সৌন্দর্যে জোবায়দার প্রতিদ্বন্দ্বিণী ছিলেন হারুনের সতেলা বোন উলাইয়া। উলাইয়ার কপালে সামান্য একটু দাগ ছিল। সেই দাগ ঢাকার জন্য উলাইয়া একটি জড়োয়া ফিতা ব্যবহার শুরু করেন। অল্পকাল মধ্যেই ফ্যাশন জগতে 'আলা-উলাইয়া' নামে এই ফিতার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে।

খলিফার অভিষেক উৎসব, বিয়ে-শাদী, হজে গমন ও বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজকীয় ঐশ্বর্য ও ধূমধামের পূর্ণ আয়োজন হত। ৮২৫ সালে খলীফা মামুনের সঙ্গে তাঁর উজীর কন্যা আঠারো বছর বয়স্কা বুরানের বিয়ে হয়। এই বিয়ে উপলক্ষে এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় যে, তা সমসাময়িক আরবী সাহিত্যে অপরিমিত ব্যয়ের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসেবে স্থান পেয়েছে। নব-দম্পতি মণিমুক্তা খচিত এক সোনার পাটির উপর দাঁড়ান; একটি খাঞ্চা হতে অতুল্য আকারের এক হাজার মতি তাঁদের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। একটি বিরাট আকারের মোমবাতি রাতকে দিন করে রাখে। মেশকের বড় বড় গোলা-প্রত্যেক গোলার সঙ্গে আটকানো একটি টিকেট, সেই টিকেটে লেখা একটি জমিদারী, একটি গোলাম, কিংবা অনুরূপ মূল্যবান কোন বস্তুর নাম—আর সেই গোলা উপস্থিত শাহ্জাদা ও আমীর-রইসদের উপর বর্ষণ করা হয়। ৯১৭ সালে খলিফা মুক্তাদীর তাঁর প্রাসাদে মহাধূমধামে সপ্তম কনস্ট্যানটাইনের দূতগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। যুদ্ধ-বন্দীর মুক্তি-মূল্য নির্ধারণ করার জন্য এ দূতগণ এসেছিলেন বলে মনে হয়। অভ্যর্থনার জন্য খলীফার পক্ষ হতে যেসব লোক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তার মধ্যে ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৭ হাজার সাদা ও কালা খোজা এবং ৭ শ' উচ্চপদস্থ আমলা। প্যারেডের সঙ্গে চলেছিল এক শ' সিংহ আর খলীফার প্রাসাদে ঝুলেছিল ৩৮ হাজার পর্দা (তার মধ্যে ১২ হাজার ৫ শ' পর্দা ছিল জরির কারুকার্য খচিত), আর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ২২ হাজার গালিচা। দূতেরা. এমন চমৎকৃত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা প্রথমে প্রাসাদ অধ্যক্ষের কামরাকে, তাঁরপর উজীরের কামরাকে খলীফার মোলাকাত মহল বলে মনে করেছিলেন। তারা বিশেষ করে বিস্মিত হন দরাখ্ত-মহল দেখে। এই মহলে ৫ লক্ষ ড্রাম (প্রায় ২৯ মণ) ওজনের সোনা ও রূপায় তৈরী একটি গাছ ছিল। তার শাখায় শাখায় বসান ছিল সোনার তৈরী কৃত্রিম গায়ক পাখী। বাগানে গিয়ে তাঁরা অবাক হয়ে দেখেন যে, কৃত্রিম উপায়ে কতকগুলি খেজুর গাছকে ছোট করা হয়েছে এবং তাতে থোকায় থোকায় ধরে আছে দুষ্প্রাপ্য জাতের খেজুর।

মুসলমান রাজা-বাদশাহদের মধ্যে হারুন অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। তাঁর ও তাঁর পরবর্তী খলীফাদের অফুরন্ত বদান্যতার আকষর্ণে চুম্বকের আকর্ষণের মত রাজধানীতে কবি, বিদূষক, গায়ক, বাদক, নর্তক, লড়াইর মোরগ ও কুকুরের শিক্ষাদাতা এবং অন্যান্য নানা রকমের আনন্দ পরিবেশকরা এসে হাজির হত। কবি আবু-নুয়াস আর রশীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর অনেক নৈশ অভিসারের শরীক ছিলেন। তিনি এই গৌরবময় যুগের দরবারী জীবনের যে বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়। আল-আগানীর গ্রন্থ এই গৌরবময় যুগের

কাহিনীতে পরিপূর্ণ এবং সে কাহিনী হতে মূল সত্য উদ্ধার করা কঠিন নয়। এই কাহিনীর এক কাহিনীতে আমরা শুনতে পাই যে, হারুনর রশীদের পুত্র খলীফা আল-আমীন একদা অপরাহ্নে তাঁর দরবারে বসে তাঁর পিতৃব্য গায়ক ইব্রাহীমকে আবু-নুয়াসের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তির জন্য তিন লক্ষ দিনার উপহার দেন। ইব্রাহীম খলীফার নিকট হতে ইতিপূর্বে যে ভাতা পেয়েছিলেন, এ দান তাঁর সঙ্গে যোগ করে মোট পরিমাণ দাঁড়ায়, দুই কোটি দেরহাম। কয়েকটি জিলার খাজনাতেই এ অর্থের সংকুলান হয়ে যেত। আল-আমীন তাইগ্রীস নদীতে মজলিস করার জন্য অনেকগুলি বজরা তৈয়ার করেছিলেন। এসব বজরার আকার নানারকম জীব-জন্তুর মত ছিল। একটি বজরা দেখিতে ছিল শুকোরের মত, একটি ছিল সিংহের মত, আর একটি ছিল ঈগল পাখীর মত। এর একটি তৈয়ার করতে খরচ হয় ৩০ লক্ষ দেরহাম। এই বিবরণে আমরা দেখতে পাই সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত কোন একটি নাচের বিবরণ। খলীফা আল-আমীন নিজে হাজির থেকে এ নাচ পরিচালনা করেন; অনেক সুন্দরী তরুণী এ নাচের উৎসবে যোগ দেয় এবং মৃদু গানের তালে তালে নাচে। উপস্থিতদের সকলেই গানে শরীক হয়। অন্য একজন গ্রন্থকার বলেন যে, আর-রশীদের ভাই ইব্রাহীম একদিন আর-রশীদকে দাওয়াত করেন। খলীফার সামনে মাছের যে পেয়ালা দেওয়া হয়, দেখা যায় সে পেয়ালায় মাছের টুকরা নেহায়েত ছোট ছোট। কারণ জিজ্ঞাসা করায় ইব্রাহীম বলেন যে, এগুলি কেবল মাছের জিভ এবং ঐ এক পেয়ালার ১৫০টি জিভ সংগ্রহ করতে তাঁর খরচ হয়েছে এক হাজার দেরহামের উপর। বর্ণনাকারীদের স্বাভাবিক অতিরঞ্জন বাদ দিলেও বাগদাদ দরবারের জাঁকজমক আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বাগদাদের বহু মাইল-ব্যাপী জেটির ধারে যুদ্ধ-জাহাজ ও প্রমোদ-তরী সহ শত শত জলযান বাঁধা থাকত। তাদের মধ্যে চীনের জাঙ্কও দেখা যেত। আর ভেড়ার চামড়া ফুলিয়ে তৈরী ভেলাও দেখা যেত। শহরের বিভিন্ন বাজারে আসত-চীন হতে মাটির বাসন, রেশম ও কস্তুরী; ভারত হতে মসলা, খনিজ-দ্রব্য এবং রং; মালয় দ্বীপপুঞ্জ হতে লাল-পাথর ও কাপড়-চোপড়; মধ্য এশিয়ার তুর্কি-ভূমি হতে দাস-দাসী; স্ক্যান্‌ডিনেভিয়া ও রাশীয়া হতে মধু, মোম এবং শেতাঙ্গ দাস-দাসী; পূর্ব-আফ্রিকা হতে হাতীর দাঁত, সোনা চূর্ণ এবং কৃষ্ণাঙ্গ দাস-দাসী। চীনা মালপত্র বিক্রির জন্য একটি খাস বাজার ছিল। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলসমূহ হতে জল-স্থল উভয় পথে আসত তাদের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্য। মিসর হতে ধান, গম, যব এবং পট্ট-বস্ত্র; সিরিয়া হতে কাচ, ধাতব-দ্রব্য ও ফল; আরব হতে কিংখাব, মতি ও অস্ত্র-শস্ত্র এবং পারস্য হতে রেশম, আতর এবং শাক-সব্‌জী।

বাগদাদ ও অন্যান্য রফ্‌তানী কেন্দ্র হতে আরব সওদাগরেরা কাপড়-চোপড় জওয়াহিরাত, ধাতব আয়না, কাচের গুটিকা এবং মসলা নিয়ে দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় চলে যেত। রাশীয়া, ফিন্‌ল্যান্ড, সুইডেন ও জার্মানীর মত সুদূর উত্তরে ইদানীং যেসব আরব-মুদ্রার গুপ্তভাণ্ডার পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এ যুগের এবং এর পরবর্তী যুগের মুসলমানদের দুনিয়া-জোড়া সওদাগরীর পরিচয় পাওয়া যায়। আরব্য উপন্যাসে বণিক সিন্দাবাদের কাহিনীটি একান্ত সুপরিচিত। এই কাহিনীতে যে সব দুঃসাহসী কাজের বর্ণনা আছে, আরব বণিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতাই যে তার বুনিয়াদ, এ কথা অনেক কাল হতে বহুজনে স্বীকার করে আসছেন।

বাগদাদের সমাজে সওদাগরদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। আজকের মত তখনো আলাদা আলাদা জিনিসের ব্যবসায়ীদের আলাদা আলাদা বাজার ছিল। গলী জীবনের একটানা সুর ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে চলতো বিয়ে অথবা ত্বক-ছেদনের উৎসবের শোভাযাত্রা। চিকিৎসক, উকিল, শিক্ষক, লেখক. এবং অনুরূপ শ্রেণীর অন্যান্যরা সমাজে উচ্চ স্থান দখল করতে শুরু করেন। একজন জীবনী লেখক জনৈক বুদ্ধিজীবীর দৈনিক কার্যসূচীর একটা বর্ণনা রেখে গেছেন। তা দেখে মনে হয়, তৎকালীন বাজারে বুদ্ধিজীবীদের বেশ দাম ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, এই বিদ্বান মানুষটি রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যান, তারপর সরকারী গোসলখানায় প্রবেশ করেন। সেখানে চাকরেরা তাঁর উপর পানি ঢেলে দেয়। গোসলখানা হতে বের হয়ে তিনি আরামের পোশাক পড়েন, একটু শরবত পান করেন. একটা বিস্কুট মুখে দেন এবং বিছানায় গড়ান; হয়তো ঘুমিয়ে পড়েন। এই দিবা-নিদ্রা অন্তে তিনি নিজ দেহকে সুবাসিত করার জন্য গন্ধদ্রব্য পোড়ান এবং মধ্যাহ্নের খানা হাজির করার হুকুম দেন। সে খানায় সাধারণতঃ থাকে শুরুয়া, মুরগীর বাচ্চা ও রুটি। এরপর তিনি ফের নিদ্রা যান। ঘুম ভাঙ্গলে উঠে পান করেন চার বোতল পুরোনো শরাব এবং সঙ্গে কখনো কখনো সিরিয়া দেশের দুই চারটে ছেব নাশ্‌পতি খান।

বিলাস-ঐশ্বর্যময় জীবন এ যুগকে ইতিহাস ও উপন্যাসের নিকট প্রিয় করে তোলে। কিন্তু এ যুগকে দুনিয়ার ইতিহাসে অমর করে রেখেছে এক জ্ঞানাত্মক জাগরণ। এ জাগরণ কেবল ইসলামের ইতিহাসে নয়—চিন্তা ও সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে এ ছিল এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ জাগরণের প্রধান হেতু ছিল বিদেশী প্রভাব: কতকটা ইন্দো-পারসিক এবং সিরীয়, কিন্তু প্রধানতঃ হেলেনিক। এ নব-জীবনের সাধনার এক বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল ফারসী, সংস্কৃত, সিরিয়াক এবং গ্রীস হতে আরবী ভাষায় অনুবাদ। আরবরা অতিসামান্য নিজস্ব সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শন নিয়ে তাদের নতুন জাতীয় জীবনে যাত্রা শুরু করে;

কিন্তু তারা মরুভূমি হতে নিয়ে আসে জ্ঞানাত্মক কৌতূহলের এক সুতীক্ষ্ণ বোধশক্তি ও বহু অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট গুণ এবং অল্পকাল মধ্যেই তারা বিজিত কিংবা লড়াইর ময়দানে পরিচিত পুরোনো ও উন্নততর সংস্কৃতিবান জাতিসমূহের উত্তরাধিকারী হয়ে বসে। সিরিয়া সভ্যতা পরবর্তী গ্রীক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আরবের মুসলমানরা সিরিয়ায় গিয়ে এই গ্রীক প্রভাবিত সিরীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। তেমনি ইরাকে গিয়ে তারা ইরান প্রভাবিত ইরাকী সভ্যতা গ্রহণ করে। বাগদাদ নগর স্থাপনের মাত্র পঁচাত্তর বছরের মধ্যে আরবী পাঠক-জগত আপন আয়ত্তে এনে নেয় আরাস্তুর প্রধান প্রধান দর্শন-গ্রন্থ, বড় বড় নিও-প্ল্যাটনিক ভাষ্যকারদের গ্রন্থ, গ্যালেনের অধিকাংশ চিকিৎসা গ্রন্থ এবং পারসিক ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী। —যার বিকাশ সাধন করতে গ্রীকদের বহু শতাব্দী কেটে গিয়েছিল, আরবরা কয়েক দশকের মধ্যেই তা আত্মস্থ করে নেয়। ইসলামের মূল প্রকৃতিতে ছিল মরুর প্রভাব ও আরব জাতীয়তার পরিচয়-চিহ্ন। গ্রীক ও পারস্য সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মস্থ করার ফলে ইসলাম তার আদি প্রকৃতির অধিকাংশ হারিয়ে ফেলে; কিন্তু এই পথে ইসলাম মধ্যযুগীয় সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই মধ্যযুগীয় সভ্যতা তৎকালে দক্ষিণ ইউরোপ ও নিকট-প্রাচ্যের মধ্যে যোগ-সূত্র ছিল। মনে রাখতে হবে, এ সভ্যতার খোরাক জোগাত একটি মাত্র স্রোতধারা। এ স্রোতধারা প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলনীয়া, ফিনিশীয়া এবং জুডীয়া হতে উৎপন্ন হয়ে চলে গিয়েছিল গ্রীসে এবং এই সময়ে হেলেনিজম-এর রূপ গ্রহণ করে প্রাচ্যে ফিরে আসছিল। আমরা পরে দেখতে পাব, কিরূপে স্পেন ও সিসিলীতে এই স্রোতধারা ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূচনা করে এবং আরবরা কিরূপে স্পেন ও সিসিলীর ভিতর দিয়ে একে ফের ইউরোপে পাঠিয়ে দেয়।

প্রাথমিক যুগেই আরবের মুসলমানেরা পাক-ভারত হতে প্রচুর প্রেরণা লাভ করে। জ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য ও গণিতেই এ প্রেরণা বিশেষ কার্যকরী হয়। ৭৭৩ সালে একজন পাক-ভারতীয় ভ্রমণকারী বাগদাদে আসেন এবং গ্রহ-বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি গ্রন্থ খলীফার নিকট উপস্থাপিত করেন। খলীফার আদেশে আল-ফাজারী গ্রন্থখানি আরবীতে অনুবাদ করেন। অবশ্য মরুভূমিতে বাস করার কালেই গ্রহ-নক্ষত্র আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু এই সময়ের পূর্বপর্যন্ত তাদের মধ্যে ওসবের কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয় নাই। নামাযের কিবলা কোন্ দিকে হবে, তা ঠিকমত নির্ণয়ের জন্য ইসলামও গ্রহ-বিজ্ঞান অধ্যয়নে উৎসাহ দান করে। সুবিখ্যাত আল-খাওয়ারিজ্মী ৮৫০ সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-ফাজারীর গ্রন্থকে ভিত্তি করে গ্রহ-বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বহুবিশ্রুত নির্ঘণ্টগ্রন্থ প্রণয়ন করেন গ্রীক

এবং পাক-ভারতীয় গ্রহ-বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ও তাঁর নিজস্ব অবদানে উক্ত বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। ইউরোপীয়রা যে সংখ্যাকে বলে আরবীয় আর আরবরা পাক-ভারতীয়, সে সংখ্যাও মুসলিম জগতে প্রবেশ করে ঐ একই পাক-ভারতীয় ভ্রমণকারীর নীত একটি গণিত গ্রন্থ মারফত। পরবর্তীকালে নবম শতাব্দীতে আরব গণিত-বিজ্ঞান—পাক-ভারতীয়দের আরো একটি অবদানে সমৃদ্ধ হয়। গাণিতিক জগতের এ অবদান হচ্ছে, দশমিক রীতি।

আরবদের 'উর্বর হেলাল' বিজয়কালে তাদের হাতের কাছে গ্রীসের জ্ঞানাত্মক উত্তরাধিকারই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান ভাণ্ডার। সুতরাং, আরব-জীবনে সমস্ত বৈদেশিক প্রভাবের মধ্যে হেলেনিজমই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব হয়ে দাঁড়ায়।

আল-মামুনের আমলে এই গ্রীক প্রভাব তার চরম সীমায় গিয়ে পৌছে। আল-মামুনের চরিত্রে যুক্তিপ্রবণতার ঝোঁক ছিল। ধর্ম-শাস্ত্রের কথার সঙ্গে যে যুক্তির মিল থাকতে হবে, তাঁর এই মতের সমর্থনের জন্য তিনি গ্রীক-দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ৮৩০ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'জ্ঞান-নিকেতন' স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার, তত্ত্বমূলক আলোচনার কেন্দ্র ও অনুবাদ-সংঘের সমাবেশ ছিল। খৃস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলেকজান্দ্রিয়ায় যে যাদুঘর স্থাপিত হয়, তারপর জ্ঞান-নিকেতনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আর একটিও স্থাপিত হয় নাই। এই সময়ের আগ পর্যন্ত খৃস্টান, মুসলমান ও নও-মুসলিমরা নিজ নিজ মরজী মোতাবেক বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বই অনুবাদ করে আসছিলেন। আল-মামুনের সময় হতে শুরু করে তাঁর কাছাকাছি পরবর্তীদের কাল পর্যন্ত অনুবাদের কাজ প্রধানতঃ জ্ঞান-নিকেতনকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে। আব্বাসীয় অনুবাদ-যুগ—৭৫০ সাল হতে প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। অনুবাদকদের বেশির ভাগেরই মাতৃভাষা ছিল আরামেইক (সিরিয়াক)। সেই জন্য অনেক গ্রীক গ্রন্থ প্রথমে আরামেইক ভাষায় অনূদিত হয়— তারপর অনূদিত হয় আরবী ভাষায়। যীশুখৃস্ট আরামেইজ ভাষায় কথাবার্তা বলতেন।

আরবীতে যাঁরা অনুবাদ করতেন, তাঁরা সাহিত্য ও ধর্ম গ্রন্থের খোঁজ-খবর নেন নাই। গ্রীক নাটক, গ্রীক কবিতা এবং গ্রীক ইতিহাস—এসবের সঙ্গে আরব মনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে পারস্যের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। আফ্‌লাতুন ও আরাস্তুর দ্বারা উদ্ভাবিত এবং পরবর্তী নিও-প্ল্যাটোনিস্টদের দ্বারা ব্যাখ্যাত গ্রীক দর্শন নিয়েই মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কারের যাত্রা শুরু করে।

আরবরা হুনাইন ইবনে-ইসহাককে (৮০৯—৮৭৩) বলে অনুবাদকদের শেখ্। ইনি সে জামানার সবচেয়ে বড় পণ্ডিত এবং চরিত্রে সবচেয়ে মহান ছিলেন। হুনাইন হীরাবাসী একজন নেস্টোরীয়ান খৃস্টান ছিলেন। যৌবনকালে ইনি এক ডাক্তারের দোকানে কম্পাউন্ডারের চাকরী গ্রহণ করেন। একদিন তাঁর মনিব শ্লেষের সঙ্গে বলেন, 'হীরার বাসিন্দাদের চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; তুমি বরং বাজারে গিয়ে টাকা ভাঙ্গানোর পেশা শুরু কর। বালক মনিবের এই তিরস্কারের প্রতিবাদস্বরূপ সাশ্রু-নয়নে চাকরী ছেড়ে আসেন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষার জন্য সংকল্প করেন। কথিত আছে, হুনাইন গ্যালেন, হিপোক্রাটস্ এবং ডায়োস্ কোরাডীসের বই অনুবাদ করেন। এ ছাড়া, আফ্লাতুলেন 'রিপাব্লিক' এবং আরাস্তুর 'ক্যাটিগরী ফিজিক্স' ও 'ম্যাগনা মরালীয়া'রও অনুবাদ করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, গ্যালেনের প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরই আরবীতে অনুবাদ। গ্যালেনের দেহ-বিজ্ঞান বিষয়ক সাতখানি বইয়ের মূল গ্রীক গ্রন্থ হারিয়ে গেছে; সৌভাগ্যক্রমে তা আরবী অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে। হুনাইন গ্রীক সেপ্টুয়াজিন্ট হতে আরবীতে ওল্ড্ টেস্টামেন্টের যে অনুবাদ করেন, তা এখন আর পাওয়া যায় না।

হুনাইন যে সুদক্ষ অনুবাদক ছিলেন, তার সমর্থনমূলক প্রমাণ আছে। তিনি এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা মাসে ৫ শত দিনার (১২ শত ডলার বা ৪ হাজার টাকার মত) পেতেন। উপরন্তু আল-মামুন তাঁর অনূদিত গ্রন্থ ওজন করে তাঁকে সেই পরিমাণ সোনা দিতেন। কিন্তু কেবল অনুবাদক হিসেবে তাঁর গৌরব ছিল না; তিনি তাঁর গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন তখন, যখন খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। একবার খলীফা তাঁর জনৈক দুশমনের জন্য হুনাইনকে একটা গোপন বিষয় তৈরি করে দিতে বলেন। হুনাইন অস্বীকার করেন। ফলে খলীফা তাঁকে এক বছর জেলে আটক রাখেন। খলীফার সামনে এনে মৃত্যুর ভয় দেখালে তিনি উত্তর দেন ঃ 'মানুষের পক্ষে যা হিতকর, আমি কেবল তাই শিখেছি—অন্য কিছু শিখি নাই।' খলীফা বলেন ঃ 'আমি কেবল তোমার সততা পরীক্ষা করছিলাম। এখন বল, কি জন্য তুমি মারাত্মক বিষ তৈরি করতে অস্বীকার করলে?' হুনাইন উত্তরে বল্লেন ঃ 'দুই বস্তু আমাকে এ কাজ করতে বাধা দেয় ঃ এক—আমার ধর্ম, অন্য—আমার পেশা। আমার ধর্ম বলে যে, আমাদের শত্রুরও আমাদের উপকার করা উচিত; বন্ধুর উপকার তো আরো বেশি করা কর্তব্য। আর আমার এ চিকিৎসা পেশার প্রবর্তনই হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য—তাদের রোগ আরোগ্যের কাজেই এর

কর্তব্য সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, প্রত্যেক চিকিৎসকই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ যে, সে কখনো কাউকে মারাত্মক বিষ দিবে না।'

চিকিৎসা-শাস্ত্রের একজন আধুনিক ফরাসী ঐতিহাসিকই বলেন যে, হুনাইন নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন।

তরজমার জামানা খতম হয়ে আসার আগে আরাস্তুর প্রচলিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই আরবী পাঠকদের আয়ত্তে আসে। তাঁর নামে প্রচলিত এই সব বইয়ের অনেকগুলি অবশ্য মেকী ছিল। এইসব যখন ঘটে, তখন ইউরোপ গ্রীক চিন্তা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কারণ, যখন আর-রশীদ আর আল-মামুন গ্রীক ও পারসিক দর্শন নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত, সেই সময় তাঁদের পাশ্চাত্য সমসাময়িক শার্লেমেন ও তাঁর লর্ডরা নাকি তাঁদের নাম দস্তখত শিখ্‌তে খেটে মরছিলেন। ইসলামে মানব-প্রীতিমূলক অধ্যয়নের অঙ্গ হিসেবে শীঘ্রই আরাস্তুর তর্ক-শাস্ত্র বিষয়ক 'অর্গানন' এবং পর্‌ফিরীর 'ইসাগোণ্‌' আরবী-ব্যাকরণের পাশে স্থান গ্রহণ করে। আরবী অনুবাদে আরাস্তুর অলঙ্কার ও কাব্য শাস্ত্র তাঁর অরগাননের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজ পর্যন্তও এই রীতিই চলে আসছে। নিও-প্ল্যাটোনিক ভাষ্যকারদের মতে আফলাতুন ও আরাস্তুর বাণী যে মূলতঃ এক, মুসলমানরা সে অভিমত গ্রহণ করে। নিও-প্ল্যাটোনিজমের প্রভাব বিশেষ করে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সুফী মতবাদের মধ্যে। আমরা পরে দেখতে পারব যে, আরব পণ্ডিতদের—বিশেষ করে আবু আলী সীনা ও ইবনে রুশ্‌দের মারফত আরাস্তুর ও আফলাতুনের মতবাদ ল্যাটিনে প্রবেশ লাভ করে এবং ইউরোপের মধ্যযুগীয় সূক্ষ্ম চিন্তা-ধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

আব্বাসীয় আমলের এই দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ অনুবাদ-যুগের পর আসে মৌলিক অবদানের যুগ। আমরা এর পরের এক অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবী ছিল কবিতার ভাষা—হযরত মুহম্মদের (সঃ) পর প্রধানতঃ প্রত্যাদেশ ও ধর্মের ভাষা; দশম শতাব্দীতে একান্ত বিস্ময়করর়ূপে সেই ভাষা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাব-প্রকাশের মোলায়েম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে কূটনীতি ও সৌজন্যের ভাষা হিসেবে আরবী মধ্য এশিয়া হতে সমস্ত উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়ে স্পেন পর্যন্ত নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সময় হতে আজ পর্যন্ত ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোর বাসিন্দারা আরবী ভাষায় তাদের মহত্তম চিন্তা প্রকাশ করে আসছে।

জাতির জীবন

খলীফাদের বিচিত্র কার্যাবলী, শাসক-বংশের উত্থান ও পতনের জটিল রক্তাক্ত কাহিনী, ভণ্ড দাবীদারদের কিস্‌সা এবং সেনাপতি, উজীর ও রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান ও পতনের বর্ণনা—এসবেই আরব ঐতিহাসিকদের মনোযোগ ও দরদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের জনগণের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের কোন পর্যাপ্ত বিবরণ দেওয়ার আবকাশ তাঁদের ঘটে ওঠে নাই। তবে তাঁদের রচিত গ্রন্থে এখানে সেখানে দু'চারটি ঘটনার উল্লেখ মিলে। সাহিত্যিক কেতাবে এবং আজকের পরিবর্তন-বিমুখ মুসলিম-প্রাচ্যের সাধারণ জীবনের ঘটনাবলী হতে সে যুগের জনগণের জীবনের একটা খসড়া ছবি আঁকা যেতে পারে।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম মহিলারা যেমন প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করত, নবম-শতাব্দীর মহিলারাও তা-ই ভোগ করত; কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগে নারীর অবরোধ এবং নর নারীর মধ্যে পরিপূর্ণ বিভেদ-ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। আব্বাসীয় জামানার প্রথমভাগে আমরা দেখতে পাই, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা কেবল যে সাম্রাজ্য পরিচালন ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন ও প্রভাব বিস্তার করছে, এমন নয়—আরব কুমারীরা লড়াইয়ে যাচ্ছে, সৈন্য পরিচালনা করছে, কবিতা লিখছে এবং পুরুষদের সঙ্গে সাহিত্য-সাধনায় প্রতিযোগিতায় নামছে; অথবা তাদের হাস্যালাপ, তাদের সঙ্গীত প্রতিভায় বা কণ্ঠস্বরে মজলিস-মহফিলকে উজ্জীবিত করে তুলছে।

অবনতির যুগে উপপত্নী-সম্ভোগ অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে ওঠে—যৌন-পবিত্রতার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে, বিলাস-ব্যসন মাত্রা অতিক্রম করে। তখন নারীর আসন নিতান্ত নিম্নস্তরে নেমে যায়। আরব্য উপন্যাসে এই নারীর সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এ পুস্তকে দেখান হয়েছে যে, নারী সমস্ত ধূর্ততা ও ষড়যন্ত্রের প্রতিমূর্তি, সমস্ত হীনভাব ও হীন চিন্তার আকর।

মুসলিম জগতের প্রায় সর্বত্রই বিবাহ এক বড় কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে; অবিবাহিত থাকাকে বিশেষভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং সন্তানকে—

বিশেষ করে পুরুষ সন্তানকে আল্লাহ্র দান বলে মনে করা হয়েছে। স্ত্রীর প্রথম কর্তব্য ছিল স্বামীর সেবা, সন্তান পালন এবং এরপর যদি সময় থাকে তবে সে চরকা কাটবে এবং কাপড় বুনবে।

এ যুগের কবিদের প্রণয়-সংক্রান্ত ভাষা হতে মনে হয়, প্রাথমিক যুগে নারী-সৌন্দর্যের যে আদর্শ ছিল, এ যুগে তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। নারীর দৈহিক উচ্চতা বৃক্ষ-লতার মধ্যে বাঁশের মত হবে, তার মুখ হবে পুর্ণিমার চাঁদের মত গোলাকার, তার চুল হবে রাতের চেয়ে অন্ধকার, তার গাল হবে সাদা ও গোলাপী—তাতে থাকবে একটি তিল। তার চোখ হবে অত্যন্ত কালো এবং বন্য-হরিণের চোখের মত ডাগর, তার চোখের পাতা হবে ঘুমলো, তার মুখ হবে ছোট, তার দাঁত প্রবালের উপর বসানো মুক্তার মত হবে, তার বুক হবে ডালিমের মত, তার নিতম্ব হবে চওড়া এবং তার সরু আঙ্গুল লতিয়ে যাবে—আর সে আঙ্গুলের ডগা হবে মেহেদী রঞ্জিত।

মহিলাদের ফ্যাশান-সম্মত শিরস্ত্রাণ ছিল, মাথা-চোখা টুপী; টুপীর নিম্নভাগে একটি ছোট্ট বৃত্ত ছিল। কেউ কেউ হীরা-জহরতে এ বৃত্ত সাজিয়ে রাখত। নারীদের সজ্জিত হওয়ার অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ছিল মল ও বালা। পুরুষদের পোশাক এখন যা আছে, তখন মোটামুটি তা-ই ছিল। লেবানন ও সিরিয়াতে প্রচীনেরা এখনো সেই পোশাকই পরিধান করে। সাধারণ শিরস্ত্রাণ ছিল কালো উঁচু চূড়া-যুক্ত পশমের টুপী। পোশাকের মধ্যে ছিল পারস্য-ফ্যাশানের ঢিলা পাজামা, সার্ট, ফতুয়া, ছোট কোর্তা এবং 'জুব্বা'। এই আরবী শব্দটিকে আমরা দশম শতাব্দীতেও স্পেনীয় ভাষার অভিধানে দেখতে পাই; স্পেনীয় ভাষার মারফত এই শব্দ রোমান্স ভাষার বাকী শাখাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান হতে ইংরেজী, স্ল্যাভনিক এবং জার্মান জাতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রবেশ করে।

বাড়ীর আসবাবপত্রের মধ্যে 'দিবান' ক্রমে সবচেয়ে বড় আসন দখল করে বসে। দিবান মানে কামরার তিন পাশ বরাবর প্রসারিত সোফা। উমাইয়াদের আমলেই চেয়ারের মত উঁচু আসনের প্রবর্তন হয়। কিন্তু মেঝের উপর পাতা ছোট চারকোণা মাদুরের উপর বিছানো গদীর চল রয়েই যায়। এ গদীর উপর একজন আরামের সঙ্গে আসন করে বসতে পারত। মাদুরের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ম্যাট্রেস' কথাটি আরবী 'মাতরাহ্' শব্দ হতে উদ্ভূত। হাতে বোনা গালিচায় মেঝে ঢাকা থাকত। পিতলের বড় গোলাকার খাঞ্চায় খানা সাজিয়ে তা দিবান কিংবা মেঝের গদীর সামনে একটি নিচু টেবিলের উপর রাখা হত। ধনীদের বাড়ীতে রূপার খাঞ্চা এবং আব্লুশ কাঠ, মতি বা কচ্ছপের খোলস খচিত-কাঠের টেবিল ব্যবহার করা হত। অমন টেবিল এখনো দামেস্কে তৈরি হয়ে থাকে।

একদা যারা বিচ্ছু, গোবরে পোকা এবং বেজীকে অতি উপাদেয় খাদ্য মনে করত, ভাতকে বিবেচনা করত বিষাক্ত খাদ্য এবং রুটী পাতলা করে তার উপর লিখত—এই সময়ের মধ্যে তাদের খানার রুচি এত উন্নত হয়ে উঠেছিল যে, সভ্য জগতের অতি উপাদেয় খাদ্য ছাড়া আর কিছু তাদের মুখে ভালো লাগত না। তাদের খানার মধ্যে থাকত স্টু, মূল্যবান মিষ্টি ইত্যাদি ইরানী খানার বিভিন্ন দফা। তাদের মুরগীকে খাওয়ান হত জলপাই, দুধ, নারিকেল ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালে বরফ দ্বারা ঘর ঠাণ্ডা রাখা হত। পান করার জন্য পরিবেশন করা হত মাদকতাহীন শরবত। পানিকে চিনি দিয়ে মিঠা ও গোলাব, কলা ইত্যাদির নির্যাস দিয়ে সুগন্ধ করে এই শরবত বানানো হত। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে কফি প্রচলিত হয় নাই এবং আমেরিকা অধিকারের আগে তামাক অজানা ছিল। নবম কি দশম শতাব্দীর একজন গ্রন্থকার তাঁর লিখিত একটি বইয়ে সে আমলের ভদ্রলোকের মেজাজ, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিবোধ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে গেছেন : 'ভদ্রলোকের ব্যবহার মোলায়েম, আত্মসম্মান-জ্ঞান পুরুষোচিত, আচার মার্জিত; সে হাল্‌কা তামাসা হতে বিরত থাকে, সৎলোকের সঙ্গ করে, একান্ত সত্যনিষ্ঠ, প্রতিজ্ঞা পালনে উদগ্রীব, অন্যের গোপন সত্য রক্ষা করে, অমলিন তালিহীন কাপড় পরে, খানার টেবিলে বসে ছোট ছোট লোকমা মুখে দেয়, কথা অল্প বলে, উচ্চস্বরে হাসে কম, তার খানা ধীরে চিবিয়ে খায়, আঙ্গুল চাটে না, পিয়াজ, রসুন খাওয়া পরহেজ করে, মুখ ধোয়ার কামরায়, গোসলখানায়, প্রকাশ্য সভায় এবং রাস্তাঘাটে খিলাল করা বন্ধ রাখে।'

প্রাইভেট ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থাতেই অনেক সময় মদ খাওয়া হত। আগানী ও আরব্য উপন্যাসের মত কেতাবে আমরা প্রমোদ-উৎসবের যে অসংখ্য কাহিনী দেখতে পাই এবং মদের প্রশংসায় যে অগণ্য কবিতা ও গান আছে, তাতে মনে হয় মদ খাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ সে নিষেধ বড় কেউ মেনে চলত না। এমন কি খলীফা, উজীর, শাহ্‌জাদা এবং বিচারক কাজীরাও ধর্মীয় আদেশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করত না। খেজুর হতে তৈরি 'খমর' প্রিয় পানীয় ছিল।

প্রমোদ উৎসবে কখনো কখনো মদের মহিমা-কীর্তনমূলক গান হত। এই সব মদের মজলিসে মেহমান ও মেজবান মেশ্‌ক অথবা গোলাব পানিতে তাদের দাড়ি সুগন্ধ করত এবং উজ্জ্বল রঙ্গের খাস পোশাক পরত। সুগন্ধ কাঠ পুড়িয়ে কামরা সৌরভময় করা হত। অনেক কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসব মজলিসের গায়িকারা প্রধানতঃ ছিল হয় বাঁদী, না হয় ভ্রষ্ট-চরিত্র নারী। যুগের তরুণদের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে এরা ছিল মারাত্মক ভয়ের কারণ। জনসাধারণ খৃস্টানদের মঠ অথবা ইহুদীদের পরিচালিত মদখানায় গিয়ে মদ খেতে পারত।

মহানবী বলেছেন, 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ'। এ কথা মুসলিম জগতের সবাই জানে। হযরত মুহম্মদের (সঃ) আগে আরবে কোন গোসলখানা ছিল বলে আমরা শুনি না। তিনি নিজেও নাকি গোসলখানার প্রসন্ন ছিলেন না এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকে কাপড় পরে কেবল গোসলের জন্য গোসলখানায় যেতে পারে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সরকারী গোসলখানা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—কেবল উৎসব উপলক্ষে বা স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নয়, আমোদ প্রমোদ ও বিলাসের স্থান হিসেবেও। বিশেষ রিজার্ভ করা দিনে মেয়েরাও সরকারী গোসলখানায় যেতে পারত। দশম শতাব্দীর আরম্ভে বাগদাদ ২৭ হাজার সরকারী গোসলখানার গর্ব করত। অন্য সময় নাকি গোসলখানার সংখ্যা ৬০ হাজারে গিয়ে পৌঁছে। অবশ্য আরবদের বর্ণিত বেশির ভাগ সংখ্যাতেই যেমন অতিরঞ্জন থাকে, এ সংখ্যাতেও তেমনি অতিরঞ্জন আছে। ১৩২৭ সালে একজন মুর ভ্রমণকারী বাগদাদে আসেন এবং তিনি দেখতে পান যে, শহরের পশ্চিম অংশের তেরটি বাড়ীর প্রত্যেক বাড়ীতে দুই হতে তিনটি ব্যাপকভাবে সজ্জিত গোসলখানা আছে এবং প্রত্যেক গোসলখানায় গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা আছে।

এখনকার মত কখনো গোসলখায় কয়েকটি কামরা থাকত। কামরাগুলির মেঝে মোজাইক করা এবং ভিতরের দিকের দেয়ালে মার্বেল বসানো থাকত। মাঝখানের একটি বড় কামরার চারপাশে এই কামরাগুলির স্থান ছিল। এই মাঝখানের কামরাটির উপরে একটি গম্বুজ; গম্বুজে উজ্জ্বল গোলাকার ছিদ্র থাকত, যাতে ঐ পথে আলো আসতে পারে। পানি গরম করে সেই পানির বাষ্পে এই ঘরকে গরম করা হত। উক্ত বাইরের কামরাগুলি বিশ্রাম, নাস্তা ও পান উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হত।

ইতিহাসে বরাবরই দেখা গেছে যে, চারুশিল্পের মত খেলা-ধুলাও ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতারই প্রকৃতিগত লক্ষণ—সেমিটিক সভ্যতার নয়। খেলা-ধুলায় কেবল খেলা-ধুলার জন্যই অনেক মেহনত করতে হয়। কবিত্ব-প্রবণ আরব সন্তানের চোখে এ এক অযৌক্তিক কাণ্ড। বিশেষতঃ নিতান্ত সঙ্গত কারণেই সে দিনের গরম এড়িয়ে চলতে চায়।

বাইরের খেলাধুলার মধ্যে দেখতে পাই তীরন্দাজী, পলো, বল, হকী, তলোয়ারবাজী, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় এবং সর্বোপরি শিকার। কেউ ভবিষ্যতে খলীফার প্রমোদসঙ্গী হতে চাইলে অন্যান্য গুণের মধ্যে তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হত তীরন্দাজী, শিকার, বল ও দাবা খেলায়। এসবের মধ্যে সঙ্গী তার রাজকীয় মনীবের সমকক্ষ হলেও তার বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। খলীফাদের মধ্যে বিশেষ করে পলোর ভক্ত ছিলেন আল- মুতাসিম। একদা

তাঁর তুর্ক সেনাপতি তাঁর বিপক্ষে খেলতে অস্বীকার করেন। বলেন ঃ 'এখন কি খেলার ব্যাপারেও আমি আমীরুল-মুমিনের বিপক্ষতা করতে চাই না।' এক রকম বল খেলার কৌতূহল-উদ্দীপক উল্লেখ পাওয়া যায়। এই খেলায় একখণ্ড কাঠ ব্যবহার করা হত। এ-কি টেনিসের শৈশব অবস্থার কথা? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, টেনিস শব্দটা ফরাসী ক্রিয়া 'টেনেজ' (মানে-খবরদার!) হতে উৎপন্ন; কিন্তু আসলে শব্দটা বোধহয় 'টিন্নিস' হতে এসেছে। মোহনায় অবস্থিত একটি মিসরীয় শহরের আরবী নাম ছিল টিন্নিস। মধ্যযুগে এই শহর পট্টবস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই পট্টবস্ত্রে টেনিস বল তৈরি হয়ে থাকবে।

সাধারণ শিকার, রাজপাখী দিয়ে শিকার এবং ফাঁদ ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক যুগের আরবীতে যত বই আছে তার সংখ্যা দেখে মনে হয়, এসব ব্যাপারে সবাই খুব আনন্দ পেত। বাজপাখী দিয়ে শিকার করার প্রথা পারস্য হতে আরবে আসে; এ শিকার সম্বন্ধে আরবীতে যে সব শব্দ আছে, তাতেই এ প্রমাণিত হয়। খলীফাদের যুগের শেষভাগে এবং ক্রুসেডের যুগে বাজ দিয়ে শিকার অতিপ্রিয় হয়ে ওঠে। আরব্য উপন্যাসে যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, মোটামুটি সেই নিয়মেই আজো পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ায় বাজ দিয়ে শিকার করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে যে, শিকার ধরার পরই মুসলমান তাকে জবেহ্ করে, নইলে তার গোশত্ হালাল হয় না।

সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদাতাদের মধ্যে সবার উপর স্থান ছিল খলীফা ও তাঁর পরিবারস্থ লোকের; তারপর সরকারী আমলা, তারপর উপরোক্তদের ভক্ত অনুগৃহীতদের দলের। এই শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ত সৈন্য, দেহরক্ষী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রমোদ সঙ্গী এবং চাকর-বাকর।

চাকরেরা প্রায় সবাই ছিল অমুসলমানদের মধ্য হতে সংগৃহীত গোলাম। এদের কেউ ছিল জোর করে ধরে আনা লোক, কেউ যুদ্ধবন্দী, কেউ বাজারে খরীদ। এদের কতক ছিল নিগ্রো, বাকীদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল তুর্ক, কিছুসংখ্যাক ছিল শ্বেতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ গোলামরা জাতে প্রায়ই ছিল গ্রীক, স্ল্যাভ, আর্মেনীয়ান ও বার্বার। কতক ছিল খোজা—এরা নিযুক্ত হত হেরেমের কাজে; আবার কতক ছিল 'গিলমান'—এরাও খোজা হতে পারত। তবে গিলমানরা মনীবের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিল। তারা দামী সুন্দর পোশাক পরত; এবং অনেক সময় মেয়েদের মত আতর-গোলাব মাখত। আর-রশীদের জামানার বইপত্রে আমরা গিলমানদের কথা পাই। কবিরা তাদের এ অস্বাভাবিক আকর্ষণকে তাদের রচনায় বর্ণনা করতে এবং এই 'শ্মশ্রুহীন বালকদের কাছে প্রেমপত্র লিখতে লজ্জাবোধ করত না।

কুমারী দাসীদের গায়িকা, নর্তকী বা রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করা হত। এদের কেউ কেউ তাদের খলীফা-মনীবের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে বসত। এমন একজন ছিল, 'তিল-ওয়ালা সুন্দরী।' আর-রশীদ তাকে ৭০ হাজার দেরেমে খরিদ করেন এবং পরে এক ঈর্ষান্ধ মুহূর্তে তাঁর এক চাকরকে দান করে দেন। আর-রশীদ আর একটি নর্তকী বালিকার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। সে নর্তকীর কবল হতে উদ্ধারের জন্য বেগম জোবায়েদা তাঁকে দশটি কুমারী উপহার দেন; এদের দুইজন পরে খলীফার মা হয়। আরব্য উপন্যাসে তাওয়াদ্দুদ নাম্নী একটি সুন্দরী ও প্রতিভাশালিনী বাঁদীর কাহিনী আছে। হারুনর-রশীদ তাকে ১ লক্ষ দিনারে খরিদ করতে চেয়েছিলেন; কারণ খলীফার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের সে চিকিৎসা, আইন, গ্রহ-বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত, গণিত, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, কবিতা, ইতিহাস ও কুরআন প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে। বাঁদীদের কারো কারো সাংস্কৃতিক স্তর কত উঁচু ছিল, এ কাহিনী হতে তা অনুমান করা চলে। আল আমিনের অন্যতম অবদান ছিল, একটি ছুক্‌রী বাহিনী গঠন। এ বাহিনীর ছুকরীরা বাবরীর মত করে চুল রাখত, বালকদের মত পোশাক পরত এবং রেশমী পাগড়ী মাথায় দিত। উঁচু নীচু উভয় সমাজে অল্পকাল মধ্যে এ প্রথা চালু হয়ে যায়। একজন চাক্ষুষ সাক্ষী বললেন যে, তিনি একদিন আল-মামুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন যে, আল-মামুনের সামনে বিশজন গ্রীক কুমারী সুসজ্জিত অবস্থায় এবং হাতে জলপাইর শাখা ও খেজুরের পাতা নিয়ে নাচছে। ৩ হাজার দিনার নর্তকীদের মধ্যে বিতরণ করে উৎসব সমাপ্ত করা হল।

রিপোর্টে পাওয়া যায়, খলীফা আল-মুতাওয়াকিলের ৪ হাজার উপপত্নী ছিল এবং আমাদের বিশ্বাস করতে বলা হয় যে, এদের সবাইর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হত। খলীফা বা উজীরকে গভর্নর ও সেনাপতিদের পক্ষ হতে নজর পাঠানের রীতি ছিল; এবং সে নজরের মধ্যে প্রজাদের মধ্য হতে সংগৃহীত বালিকা থাকত। এ রীতির ব্যতিক্রম হলে, তা রাজদ্রোহ বলে গণ্য হত। (এই সব কথার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকা স্বাভাবিক।)

জনসাধারণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অভিজাতদের কাছাকাছি স্থান দখল করত। এদের মধ্যে দেখতে পাই সাত্যিক, বিদ্বান সমাজ, শিল্পী, সওদাগর, কারিকর এবং পেশাদার শ্রেণী। জাতির অধিকাংশই ছিল নিম্ন শ্রেণীর লোক আর এদের মধ্যে ছিল কৃষক, পশুপালক এবং গেঁয়ে মানুষ। এই শেষোক্তরা ছিল দেশের আদত লোক (নেটীভ) এবং এরা এ সময় জিম্মীর অধিকার ভোগ করত।

সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তার এবং সভ্যতার উন্নত স্তর—এ উভয় কারণে ব্যাপক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রাথমিক যুগে খৃষ্টান, ইহুদী এবং জরোস্তরাই (জরোয়েস্ট্রীয়ান) সওদাগরী কাজ করত। কিন্তু পরবর্তী যুগে আরব ও অন্যান্য মুসলমানরা অনেকাংশে তাদের স্থান দখল করে; কারণ এরা কৃষিকাজকে ঘৃণা করলেও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘৃণা করত না। বাগদাদ, বসরা, সিরাজক, কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ার মত বন্দর স্থল ও জল-বাণিজ্যের কর্মব্যস্ত কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

পূর্ব দিকে মুসলিম সওদাগররা চীন পর্যন্ত গিয়ে হাজির হত। চীনের সঙ্গে রেশমের ব্যবসা চলত। পাশ্চাত্য জগতের প্রতি চীনের বহু অমূল্য অবদানের মধ্যে এটিই ছিল সর্বপ্রথম। এ রেশমের কারবার চলত সমরকন্দ ও চীনা তুর্কীস্তানের ভিতর দিয়ে। এই পথকে বলা হত, 'রেশমের রাজপথ'। অথচ আজকের সভ্য মানুষ পৃথিবীর মধ্যে এ অঞ্চলেই সবচেয়ে কম পরিভ্রমণ করে থাকে। সওদাগরী মাল একের পর আর—এমনি বহু দলে বহন করত। সাধারণতঃ একই কাফেলাকে সমস্ত পথ চলতে হত না। সামুদ্রিক বাণিজ্য ইসলামকে দূর দূরান্তরের দ্বীপসমূহে নিয়ে যায়। এদেরই কতকগুলি দ্বীপ ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশীয়া রিপাবলিক গঠন করে।

পশ্চিম দিকে মুসলিম সওদাগররা মরক্কো ও স্পেনে দিয়ে পৌঁছে। লেস্সেপের এক হাজার বছর আগে একজন আরব খলীফা (হারুনর-রশীদ) সুয়েজ যোজাকের ভিতর দিয়ে একটি খাল কাটার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের আরবদের বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। কৃষ্ণ সাগর ও বাণিজ্যের জন্য খুব নিরাপদ ছিল না; যদিও দশম শতাব্দীতে উত্তরে ভল্গা অঞ্চলের লোকের সঙ্গে স্থল পথে দস্তুরমত ব্যাপক ব্যবসা চলত। কিন্তু কাস্পীয়ান সমুদ্র ছিল পারস্য দেশীয় বহু বাণিজ্য কেন্দ্রের সন্নিকট এবং বোখারা, সমরকন্দের মত সমৃদ্ধিশালী শহরগুলিও দূরে ছিল না। কাজেই এই সমুদ্রই ছিল এ যুগের মুসলিম-বাণিজ্যের বিরাট আদান-প্রদান ক্ষেত্র। মুসলিম সওদাগররা সঙ্গে নিয়ে যেত খেজুর, চিনি, কার্পাস ও পশম-বস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি এবং কাচের জিনিস। আর তারা সুদূর এশিয়া হতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আমদানী করত : মসলা কর্পূর এবং রেশম, আর আফ্রিকা হতে হাতীর দাঁত, আবলুশ এবং নিগ্রো গোলাম-বাঁদী।

সে জামানার রথচাইলড্ ও রকফেলাররা কি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিল, তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে বাগদাদের জওহরী ইবনুল জাস্সাসের ঘটনা হতে। ইবনুল জাস্সাসের সম্পত্তি হতে খলীফা ১ কোটি ৬০

লক্ষ দিনার[১] বাজেয়াপ্ত করেন। তার পরও তিনি জওয়াহেরাতের সওদাগরমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে থাকেন। বসরার কয়েকজন সওদাগর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সওদাগরী জাহাজ পাঠাতেন। এঁদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ছিল দশ লক্ষ দেরেমের বেশি। বসরা ও বাগদাদের একজন নিরক্ষর যাঁতা-কলওয়ালা দৈনিক ১ শত দিনার গরীবকে ভিক্ষা দিতে পারত।[২] সীরাফ নগরে একজন সওদাগরের বাড়ী করতে গড়ে খরচ হত দশ হাজার দিনারের উপরে।[৩] কেউ কেউ ত্রিশ হাজার দিনারও[৪] খরচ করত এবং অনেক জাহাজী সওদাগরের প্রত্যেকে ৪০ লক্ষ দিনারের[৫] মালিক ছিল। এক দিনারের দাম ছিল প্রায় ২.৪০ ডলার।

সাম্রাজ্যের ভিতরে শিল্প ও কৃষির উপর নির্ভর না করে কোন বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপই এত ব্যাপকতা লাভ করতে পারত না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হস্তশিল্প প্রচুর উন্নতি লাভ করে। পশ্চিম এশিয়ায় এ শিল্প মারফত প্রধানতঃ উৎপন্ন হত কম্বল, কারুকার্যখচিত বস্ত্র, রেশম, সূতী ও পশমী কাপড়, সাটিন, কিংখাব, সোফা (সুফ্‌ফা হতে), গদীর ঢাকনী, ঘরের আসবাব ও বাবুর্চীখানার বাসনপত্র। পারস্য ও ইরাকে বহু তাঁত ছিল এবং সে তাঁতে বোনা গালিচা ও কাপড় অত্যন্ত উঁচুমান রক্ষা করে চলত। তাদের স্বতন্ত্র মার্কা ছিল। এক খলীফার মা ফরমাস দিয়ে ১৩ কোটি দেরেম খরচে একটি কম্বল তৈয়ার করান। এ কম্বলের গায় সব রকম পাখীর সোনায় তৈরী ছবি ছিল এবং রুবী ও অন্যান্য বহুমূল্য পাথর দিয়ে সে পাখীর চোখ বানানো হয়। আত্তাব নামক একজন উমাইয়া শাহজাদা বাগদাদের এক মহল্লায় বাস করতেন। তাঁর নাম অনুসারে উক্ত মহল্লারও নাম হয় আত্তাব। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম এইখানে এক রকম ডোরাদার কাপড় তৈরি হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় আত্তাবী। স্পেনের আরবরা এ কাপড়ের অনুকরণে কাপড় তৈরি করে এবং তাবী নামে সে কাপড় ফ্রান্স, ইতালী এবং ইউরোপের অন্য বহু স্থানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শব্দটা আজো 'টেব্‌বী' শব্দের মধ্যে বেঁচে আছে; টেব্‌বী মানে ডোরাদার বিড়াল। কুফায় রেশম ও রেশমে তৈরী মাথার রুমাল উৎপন্ন হত। এখনো 'কুফীয়া' নাম এ রুমাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দামেস্ক শহরে এক রকম ফুলদার কাপড় তৈরী হত; এই কাপড় দামাস্ক্‌ নামে পরিচিত হয়। সুসিয়ানার কয়েকটি কারখানা এই দামাস্ক কাপড়ে সোনার নক্‌সা তোলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার তৈরী পরদা, উট ও ছাগ পশমের কাপড় এবং রেশমী জামা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। শিরাজ নগরে তৈরী হত ডোরাদার পশমী জামা, সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র ও কিংখাব। মধ্যযুগের ইউরোপীয় মহিলারা তাঁদের দোকান হতে 'টাফেটা' নামে পারস্যের রেশমী কাপড় 'তাফ্‌তা' খরিদ করতেন।

---

(১) প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (২) প্রায় ৭২০ টাকা। (৩) প্রায় ৭২ হাজার টাকা। (৪) প্রায় ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। (৫) প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।

সিডন, টায়ার এবং লেবানন ও সিরিয়ার অন্যান্য শহরে তৈরী কাচ নিতান্ত স্বচ্ছ ও পাতলা বলে বিখ্যাত ছিল।

পৃথিবীতে মিসরই সর্বপ্রথম কাচ শিল্পের প্রবর্তন করে। তারপরই প্রাচীন ফিনিশীয়ানরা এ শিল্পে হাত দেয়। সিডন, টায়ার প্রভৃতি স্থানের কাচ শিল্পের মূল ছিল এই ফিনিশীয়ান শিল্প। ক্রুসেডের ফলে সিরীয় কাচের অনুকরণে ইউরোপের গীর্জায় গীর্জায় রঙ্গীন কাচ ব্যবহারের চল হয়। ব্যবহারের সুবিধা ও বিলাসদ্রব্য হিসেবে বাজারে সিরিয়ার কারুকার্য খচিত কাচ ও ধাতুর বাসনপত্রের যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

লেখার জন্য কাগজ উৎপাদন এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চীন হতে সমরকন্দে কাগজ আমদানী হয়। সমরকন্দের কাগজকে অতুলনীয় বিবেচনা করা হত। আমরা আগে দেখেছি যে, মুসলমানরা ৭০৪ সালে সমরকন্দ জয় করে। অষ্টম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বাগদাদে কাগজের প্রথম কল স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক কল জন্মলাভ করে। ৯০০ সাল বা তার আগেই মিসরে, ১১০০ সালের কাছাকাছি কালে মরক্কোতে, ১১৫০ সালের দিকে স্পেনে কাগজের কল দেখা দেয় এবং সাদা ও রঙ্গীন নানা রকম কাগজ উৎপন্ন হতে থাকে। মুসলিম-স্পেন ও ইতালী হতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজ-শিল্প খৃষ্টান ইউরোপে চলে যায় এবং সেখানে ১৪৫০—৫৫ সালে ছাপার কল আবিষ্কার হওয়ার ফলে ইউরোপ আমেরিকায় আজ আমরা এই বহু বিস্তৃত শিক্ষা দেখতে পাই।

আব্বাসীয় বংশের আগের দিকের খলীফারা কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান হন। প্রথম কারণ, তাঁদের রাজধানীই অবস্থিত ছিল অত্যন্ত উর্বর পলিমাটি অঞ্চলে; দ্বিতীয় কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজ্যের আয়ের বড় উৎসই হল কৃষিকাজ; তৃতীয় কারণ, চাষের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ রকমে দেশের আদিম বাসিন্দাদের হাতে ছিল এবং নতুন শাসকদের আমলে তাদের অবস্থার খানিক উন্নতি হয়েছিল। পরিত্যক্ত জোত-জমি ও বিধ্বস্ত গ্রাম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল; ক্রমে ক্রমে সেগুলির আবাদ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তাইগ্রীস-ইউফ্রেতীস উপত্যকার নিম্ন অঞ্চল ও কথিত ইডেন উদ্যান অঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ দেয়। এক মিসর ছাড়া সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে উক্ত উপত্যকার মত উর্বর স্থান আর কোথাও ছিল না। ইউফ্রেতীস নদী হতে নির্গত খাল দিয়ে এ-অঞ্চলের যেন একটা সত্যিকার জাল বোনা হয়েছিল। আরব ভৌগোলিকেরা মাঝে মাঝেই খলীফাদের নদী কাটা' বা নদীর মুখ খুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আসল কথা এই যে, ব্যাবিলনীয় যুগ হতে যে সব খাল

ছিল, তাঁরা প্রধানতঃ সেগুলিই পুনরায় কাটেন বা সেগুলির মুখ খুলে দেন। ইরাক এবং মিসর উভয় দেশেই খালসম্পর্কিত কাজ ছিল, প্রধানতঃ প্রাচীন পানি সেচ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখা। এমন কি মহাযুদ্ধের আগে যখন তুর্ক সরকার স্যার উইলিয়াম উইলকক্সকে ইরাকের সেচ সমস্যার অনুসন্ধান করতে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁর রিপোর্টে তিনি এই কথার উপরই জোর দেন যে, নতুন খাল কাটার চেয়ে পুরাতন খালগুলিকে চালু করাই এখানকার প্রধান কাজ। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আব্বাসীয় জামানা হতে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই বিরাট পলিময় প্রান্তরের চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে এবং তাইগ্রীস, ইউফ্রেতীস উভয় নদীই তাদের আসল প্রবাহ পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে।

আম, টমেটো, গোলআলু এবং তজ্জাতীয় লতা অল্পকাল আগে আমেরিকা ও সুদূর ইউরোপীয় উপনিবেশ হতে পশ্চিম এশিয়ায় আমদানী হয়েছে। এগুলি ছাড়া পশ্চিম এশিয়ায় আজকাল যে সব ফল ও সব্জীর আবাদ হয়,. তার প্রায় সবই সেকালে বর্তমান ছিল। কমলালেবুর আদি জন্মস্থান ছিল উত্তর পাক-ভারত ও মালয়; এখান হতে এ ফল পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ দেশ এবং অবশেষে আরবদের মারফত স্পেন দেশ হতে বাকী ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে আখের আবাদ ও সংশ্লিষ্ট পরিশোধনাগার দেখে প্রায় এই সময় উহা সিরিয়ার উপকূল ভূমিতে প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ক্রুসেডীয় যোদ্ধারা এখান হতে আখ ও চিনি ইউরোপে নিয়ে যায়। চিনির আদি জন্মস্থান হয়তো ছিল, বাংলাদেশ। সেই মিষ্টি দ্রব্যটি এমনিভাবে ধীরে ধীরে পশ্চিম পানে যাত্রা করে। আজ সভ্য মানুষের খাদ্যের অন্যতম উপকরণ হিসেবে চিনি কি অপরিহার্যই না হয়ে পড়েছে।

সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ লোকেরই পেশা ছিল কৃষিকাজ; কৃষকরাই রাজস্বের ছিল প্রধান উৎস। এরা দেশের আদিম বাসিন্দা ছিল। এদের সাথে বিজয়ীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার চুক্তি ছিল এবং সে সূত্রে এরা ছিল জিম্মী। আরবরা চাষের কাজকে তার মর্যাদাহানীকর মনে করত। জিম্মীরা প্রথমে ছিল কেবল কেতাবী জাতি খৃস্টান, ইহুদী ও সেবীয়ান। ক্রমে আরো কয়েকটি সম্প্রদায় এদের অন্তর্ভুক্ত হয়। পল্লীতে এবং তাদের গোলাবাড়ীতে জিম্মীরা তাদের প্রাচীনসংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকত এবং তাদের নিজ ভাষা রক্ষা করে চলত। মোটের উপর চুক্তি ভালভাবেই রক্ষিত হত; যদিও কোন সময় ধর্মীয় নির্যাতনও ঘটত।

শহরে খৃস্টান ও ইহুদীরা গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব সংক্রান্ত পদে, কেরানী পদেও পেশা সংক্রান্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এতে অবশ্য মুসলিম বাসিন্দাদের মনে হিংসার উদয় হত এবং এ সম্বন্ধে কোন কোন সময় নতুন আইনও হত কিন্তু এ

সব বিভেদমূলক আইন প্রায়শঃ কাগজেই থাকত; কর্যত এদের প্রয়োগ হত না।

উম্যাইয়া খলীফা দ্বিতীয় ওমর খৃষ্টান ও ইহুদীগণকে আলাদা পোশাক পরার হুকুম দেন এবং সরকারী পদ তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ করেন। হারুনর রশীদই বোধহয় প্রথম কতকগুলি পুরানো আইন পুনঃপ্রবর্তন করেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ৮৫০ ও ৮৫৪ সালে আইন করেন যে, খৃস্টান ও ইহুদীগণকে তাদের বাড়ীর সঙ্গে শয়তানের কাষ্টমূর্তি লাগিয়ে রাখতে হবে, তাদের কবর উচ্চতায় মাটির সমান স্তরে রাখতে হবে, তাদের বহির্জামার রং হলদে হতে হবে, তাদের গোলামের জামায় দুটি হলদে রঙ্গের তালি দিতে হবে—একটি পেছনে অন্যটি সামনে; তারা কেবল গাধা ও খচ্চরে কাঠের গদিতে চড়বে। এই বিভেদমূলক পোশাকের জন্য জিম্মীদের এক নাম হয় 'চক্করওয়ালা'। জিম্মীদের আর একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল এই যে, তৎকালীন মুসলিম আইনজ্ঞরা এক রায় দেন যে, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে খৃস্টান বা ইহুদীদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না; কারণ, কোরআনের মতে খৃস্টান আর ইহুদীরা তাদের ধর্ম পুস্তককে বিকৃত করেছে। কাজেই তাদের আর বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এসব বাধা সত্ত্বেও খলীফাদের অধীনে খৃস্টানরা যথেষ্ট পরিমাণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে আমরা খৃস্টান উজীরের কথাও শুনতে পাই। এ সব খৃস্টান উচ্চ আমলারা তাদের যথাযোগ্য সম্মান লাভ করত। খলীফাদের অধীনে খৃস্টান ধর্মের প্রাণশক্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল এবং এরই ফলে সুদূর পাক-ভারত ও চীন পর্যন্ত তারা মিশনারী পাঠিয়েছে।

কোরআনে ইহুদীদের সম্বন্ধে কয়েক স্থানে কঠোর মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও তাদের দিন খৃস্টানদের চেয়েও ভালভাবে গিয়েছে। আমরা কাগজপত্রে দেখি, কয়েকজন খলীফার অধীনে ইহুদীরা দায়িত্বপূর্ণ সরকারই পদ দখল করেছে। খাস বাগদাদের বুকে ইহুদীদের একটি সমৃদ্ধশালী উপনিবেশ ছিল এবং রাজধানীর পতনের আগ পর্যন্ত সে উপনিবেশ ভালভাবেই চলে। বেনজামিন নামক টুডেলার একজন ইহুদী ধর্মযাজক ১১৭০ সালে এই ইহুদী উপনিবেশ পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে দশটি ধর্মশিক্ষালয় এবং তেইশটি ধর্মমন্দির দেখতে পান। প্রধান ধর্মমন্দিরটি বিচিত্র মার্বেল পাথর ও সোনা-রূপায় বিশেষরূপে সজ্জিত ছিল। বেনজামিন পরম গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করেন যে, প্রধান ধর্মযাজক স্বয়ং দাউদ পয়গম্বরের বংশধর বলে সকলে তাঁকে অগাধ শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং ইহুদীরা সকলেই বাগদাদের খলীফার পরম অনুগত। প্রধান ধর্মযাজক একদা খলীফার সঙ্গে দেখা করতে রাস্তায় বের হন। তাঁর গায় ছিল

ফুলদার রেশমী পোশাক, তাঁর মাথায় ছিল মণি মানিক্যখচিত সাদা পাগড়ী এবং তাঁর সঙ্গে ছিল একদল অশ্বারোহী দেহরক্ষী। তাঁর আগে আগে এব নকীব হেঁকে চলছিল ঃ 'রাস্তা কর—আমাদের প্রভু দাউদ পুত্রের জন্য পথ কর।'

খলীফার রাজ্যের মানুষের এবং তাদের পরস্পর সম্বন্ধের দৃশ্য এই। আমরা এখন আরব বিজয়ের তৃতীয় মঞ্চে। প্রথম মঞ্চ ছিল সামরিক ও রাজনৈতিক— আরব সমর-বাহিনীর অভিযান। দ্বিতীয় মঞ্চ ছিল ধর্মীয়— প্রথম শতাব্দীতে ছিল এর আরম্ভ। এই যুগ সাম্রাজ্যের বেশীরভাগ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। তৃতীয় মঞ্চ ছিল—ভাষাগত ঃ বিজিত জাতিদের নিজস্ব ভাষার উপর আরবী ভাষার জয়লাভ। এইখানে বিজয়-রথ চলে সবচেয়ে ধীরগতিতে এবং বিজিত জাতিরা এই মঞ্চেই সবচেয়ে কঠিন বাধা দেয়। মনে হয়, মানুষ বরং তাদের রাজনৈতিক এমন কি ধর্মীয় আনুগত্য বিসর্জন করতে রাজী, তথাপি ভাষার আনুগত্য ত্যাগ করতে রাজী নয়।

মাতৃভাষা হিসেবে আরবী ভাষার জয়লাভের আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে তার জয়লাভ ঘটে। আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি, কিরূপে গ্রীক-সংস্কৃতি এবং পারস্য ও পাক-ভারত হতে নব নব চিন্তার ধারা এসে ৮০০ সালের দিকে বাগদাদে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশের সূচনা করে। এখন আরবী ভাষা আরব সভ্যতার বাহন হিসেবে জয়লাভ করেছে। এই বিজয় ইসলামের জ্ঞানাত্মক সোনার-যুগের আগমন-বার্তা ঘোষণা করছে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

আমরা এখন সেই যুগে উপস্থিত হয়েছি যখন আরবী ভাষা কেবল দর্শন. ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও সাহিত্যে নয়—চিকিৎসা, গৃহ-বিজ্ঞান, আলকিমিয়া (রসায়ন শাস্ত্রের আরম্ভ ও অগ্রগামী), ভূগোল ও গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়েও নতুন মৌলিক গ্রন্থ লেখার উপযুক্ত বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তরজমার যুগ ৭৫০ হতে ৮৫০ পর্যন্ত মোটামুটি একশ' বছর চলে। এরপর নবম শতাব্দীর শেষার্ধে এই নয়া জামানার পত্তন হয়। এ যুগে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন একদল মনস্বীর আবির্ভাব হয়। আজকের পাশ্চাত্যের জনসাধারণ তাঁদের খবর কমই রাখে। কিন্তু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বান্বেষীরা তাঁদের অনেককেই জানে এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমাদের পরিচিত সভ্যতা ইসলামের যে সন্তানদের অজস্র অবদানে সমৃদ্ধ, আমরা তাঁদের মাত্র কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারব।

এই সময়ের মধ্যে আরবরা পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কেবল যে আত্মস্থ করে এমন নয়, সে নবলব্ধ জ্ঞানকে তারা নিজ প্রয়োজন ও চিন্তাধারা মোতাবেক খাপ খাইয়ে নেয়। তাদের তরজমা কয়েক শতাব্দী যাবত আরব-মনের পরশ পেয়ে স্বভাবতঃই আংশিক রূপায়িত হয় এবং আরবরা সেই জ্ঞান রূপান্তরিত অবস্থায় বহু নতুন অবদানসহ সিরিয়া, স্পেন ও সিসিলী মারফত ইউরোপে পৌছিয়ে দেয়। জ্ঞানের যে সব সূত্র মধ্যযুগীয় ইউরোপের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারই মারফত তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পৌছিয়ে দেওয়ার কাজ সৃষ্টি-কাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ যদি আরাস্তু, গ্যালেন ও টলেমীর গবেষণা হারিয়ে যেত, তবে জগত এত দরিদ্র হয়ে পড়ত যেন ওসব গবেষণা আদৌ কখনো হয় নাই। তরজমার কাজ আর মৌলিক কাজের সীমারেখা সবসময় স্পষ্ট করে আঁকা সম্ভব নয়। অনুবাদকদের অনেকেই মৌলিক দানও করে থাকেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি আরবদের অনুরাগ মহানবীর একটি বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন : 'বিজ্ঞানের দুই শাখা—ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র।' চিকিৎসক একই সময়ে দার্শনিক ও

জ্ঞানবীর ছিলেন। এই সময় আরবরা ঔষধের আরোগ্য বিষয়ক গবেষণায় অদ্ভুত সাফল্য লাভ করে। তারাই সর্বপ্রথম ঔষধ বিক্রেতার দোকান স্থাপন করে; তারাই সকলের আগে ঔষধ সংমিশ্রণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম ফার্মাকোপিয়ার স্রষ্টা তারাই। খলীফা আল-মামুনের আমলেই আমরা দেখতে পাই যে, ফার্মেসী ওয়ালাদের (ঔষধ মিশ্রণকারীদের) একটা পরীক্ষা পাশ করতে হত। ঔষধ বিক্রেতাদের মত চিকিৎসকগণকেও একটা পরীক্ষা দিতে হত। একটা অনাচারের ব্যাপার ধরা পড়ায় খলীফা ৯৩১ সালে একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসককে হুকুম দেন যে, উক্ত চিকিৎসক বাকী সমস্ত চিকিৎসককে পরীক্ষা করবেন এবং কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিদেরই সনদ দিবেন। বাগদাদে ৮৬০ জনের উপর চিকিৎসক এ পরীক্ষায় পাশ করে। রাজধানী হাতুড়ে ডাক্তারদের হাত হতে বেঁচে যায়। জনৈক উজীর এক রকম পল্লীস্বাস্থ্য সেবা-সংঘের পত্তন করেন। তিনি একদল চিকিৎসককে আদেশ দেন যে, তারা ঔষধ-পত্রসহ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে বিমারীদের আরোগ্যের ব্যবস্থা করবে। অন্য চিকিৎসকেরা রোজ জেলখানা পরিদর্শন করত। এসব ব্যবস্থা হতে দেখা যায় যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হত। তৎকালীন জগতে এমন ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে হারুনর-রশিদ পারস্যের আদর্শে মুসলিম জগতের প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন। এরপর কিছুকালের মধ্যেই মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে ৩৪টি হাসপাতাল গড়ে ওঠে। কায়রো তার প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করে ৮৭২ সালে। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ হাসপাতালটি টিকে ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় দেখা দেয়। মুসলিম হাসপাতালে নারীদের জন্য আলাদা বিভাগ ও ডিস্পেনসারী থাকত। কোন কোন হাসপাতালে থাকত—ডাক্তারী বইয়ের লাইব্রেরী এবং চিকিৎসা শিক্ষাদানের সুযোগ।

মনস্বী অনুবাদকদের যুগের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সব চিকিৎসাবিদ গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয়, তাঁরা জাতিতে ছিলেন পারসিক, ভাষায় ছিলেন আরব। এঁদের মধ্যে আবু আলী ইবনে-সীনা (সংক্ষেপে ইবনে সিনা) এবং আল-রাজীর চিত্র প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল-অব মেডিসিন-এর বিরাট সভাগৃহ অলঙ্কৃত করছে।

আল-রাজী (৮৬৫—৯২৫) কেবল মুসলিম জগতের মধ্যে নয়, সমস্ত মধ্যযুগের মধ্যে তীক্ষ্ণতম মৌলিক চিন্তাবিদ্‌ ও শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসাবিদদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাগদাদের বিশাল হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। কথিত আছে, এই হাসপাতালের জন্য স্থাননির্বাচনকালে তিনি

বিভিন্নস্থানে গোশ্‌তের টুকরা টানিয়ে রাখেন; যে স্থানের টুকরায় পচন ক্রিয়া সবচেয়ে কম দেখা যায়, সেই স্থানকে তিনি হাসপাতালের জন্য নির্বাচন করেন। সার্জারীতে তাঁকেই সিটনের আবিষ্কর্তা বলে মনে করা হয়। তাঁর লিখিত আলকিমিয়া সংক্রান্ত বইয়ের মধ্যে 'গোপনতত্ত্ব' নামক বইটি বহুজন দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার পর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রেমোনার অধিবাসী বিখ্যাত অনুবাদক জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই-ই ছিল রসায়ন জ্ঞানের প্রধান আকর। রোজার বেকন একে 'ডি-স্পিরিটিবাস-এট-করপোরিবাস' নামে তাঁর বইয়ে উদ্ধৃত করেন। আল-রাজীর এক-বিষয়ক বইয়ের মধ্যে বসন্ত ও হাম সম্পর্কিত বইটি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং উক্ত বিষয়ে এ-ই সর্বপ্রথম বই। নিতান্ত সঙ্গতভাবেই এ বইটিকে আরবী চিকিৎসা সাহিত্যের অন্যতম অলঙ্কার মনে করা হয়। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল 'আল-হাভী। এ একটি ব্যাপক আলোচনার বই। আনজু-র প্রথম চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতায় এ-গ্রন্থ ১২৭৯ সালে সিসিলীর ইহুদী চিকিৎসক ফারাজ-বেন-সলিম কর্তৃক সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ১৪৮৬ সাল হতে পরবর্তীকালের মধ্যে 'কনটিনেনস' নামে এই বইয়ের বহু সংস্কারণ হয়; এর পঞ্চম সংস্কারণ ১৫৪২ সালে ভেনিসে প্রকাশিত হয়। নামেই বোঝা যায়, লেখক এ বইটিকে চিকিৎসা-জ্ঞানের বিশ্বকোষ করতে চেয়ে ছিলেন। ঐ সময় গ্রীক, পারসিক ও হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরবরা যা কিছু জানত, আল-রাজী এ গ্রন্থে তার সংক্ষিপ্ত সার দেওয়ার পর তার সঙ্গে নিজ মৌলিক গবেষণার ফল যোগ করেছেন। যে যুগে পুস্তক-মুদ্রণ তার শৈশব অতিক্রম করে নাই, সেই যুগে আল-রাজীর এসব বই মুদ্রিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত ল্যাটিন-পাশ্চাত্যের মনের উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে। আরব চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাসে আল-রাজীর পরই ইবনে সীনার নাম ভুবন বিখ্যাত। তাঁর বিশ্বকোষ-সম গ্রন্থ 'ক্যানন' নামে অনূদিত হয়ে সে যুগের চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং ইউরোপের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই হিসাবে নির্বাচিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরের মধ্যে ল্যাটিনে এর পনেরটি এবং হিব্রুতে একটি সংস্করণ হয়। কিছুকাল আগে ইংরেজিতে এর আংশিক অনুবাদ হয়। এ গ্রন্থের মেটেরিয়া-মেডিকো বিভাগে ৭৬০টি ঔষধের গুণ বিচার করা হয়। দ্বাদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই গ্রন্থ প্রধান পথপ্রদর্শক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম-প্রাচ্যে এখনো মাঝে মাঝে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ডাক্তার উইলিয়াম ওসলার-এর ভাষায় ঃ 'এ গ্রন্থটি অন্য যে কোন গ্রন্থের চেয়ে দীর্ঘতর কাল পর্যন্ত মেডিক্যাল বাইবেল হিসাবে টিকে ছিল।'

দর্শন-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আরবদের প্রধান অবদান এই যে, তারা গ্রীক চিন্তার সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করে। এ বিষয়টি নিতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আরবদের বিবেচনায় মানুষের চিন্তা-শক্তির বলে যতখানি সম্ভব, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের সেই পরিমাণ জ্ঞানই হচ্ছে দর্শন শাস্ত্রের দান। এ মতবাদ আসলে গ্রীক মতবাদের মূলকথা। আরবদের এ মতবাদ বিজিত-জাতিদের চিন্তাধারা এবং অন্যান্য প্রাচ্য চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই পরিবর্তিত অবস্থায় আরবরা একে ইসলামের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ও আরবী ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে। গ্রীক-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আরবরা বিশ্বাস করত যে, আরাস্তু তাঁর গ্রন্থাবলীতে যাবতীয় দার্শনিক তত্ত্বকে সূত্ররূপে বিধিবন্ধ করেছেন। আর গ্যালেন তাঁর গ্রন্থাবলীতে যাবতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার দিয়েছেন। অবশ্য সে যুগে গ্রীক-দর্শন ও গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানই প্রতীচ্যের একমাত্র সম্বল ছিল। মুসলমান হিসেবে আরবরা বিশ্বাস করত যে, কোরআন ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে যাবতীয় ধর্মীয় আইন ও অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সার আছে। সুতরাং, তাদের মৌলিক অবদান এক দিকে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের, অন্য দিকে দর্শন ও চিকিৎসা–শাস্ত্রের মধ্যস্থ সীমান্ত ভূমিতে আবদ্ধ ছিল। একেশ্বরবাদ ছিল প্রাচীন সেমিটিক জগতের মহত্তম অবদান; আর গ্রীক দর্শন ছিল। প্রাচীন ইন্দো–ইউরোপীয় জগতের মহত্তম অবদান। মধ্যযুগীয় ইসলাম এই একেশ্বরবাদিতা ও গ্রীক-দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান দ্বারা অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করে। এইরূপে ইসলাম ইউরোপকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জয়যাত্রার পথে নিয়ে আসে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জগতে—বিশেষ করে মুসলিম জাহানে—জ্ঞান বিভিন্ন বিভাগে এখনকার চেয়ে অনেক কম বিভক্ত ছিল দার্শনিকরা গণিত ও সঙ্গীতবিদ হতে পারতেন; আবার জ্যোতির্বিদরা কবি হতে পারতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পাঠক ইসলামের শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্বিদদের মধ্যে প্রথিতযশা ওমর খইয়ামকে দেখে বিস্ময় বোধ করবেন; কারণ সুবিখ্যাত 'রুবাইয়াত' তাঁরই অমর লেখনীর অবদান। তিনি সত্যিকার ফারসী কবি ও স্বাধীন-চিন্তাবিদ ছিলেন; আবার সেই সঙ্গে তিনি প্রথম শ্রেণীর গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। আল-কিন্দীও এই শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি নিও-প্ল্যাটোনিকদের মত আফলাতুন ও আরাস্তুর মতবাদকে একীভূত করতে চেষ্টা করেন এবং লিও-পিথাগোরীয়ান গণিতকে সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি দার্শনিক ছাড়া আরো কিছু ছিলেন। তিনি জ্যোতিষী, কিমিয়াবিদ, চক্ষু-বিশেষজ্ঞ এবং সঙ্গীত-বিদ্যাবিদ ছিলেন। তিনি ২৬৫ খানা বই লেখেন বলে

কথিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এর বেশীর ভাগই হারিয়ে গেছে। চক্ষু সংক্রান্ত আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তাঁর প্রধান বইখানি ইউক্লিডের অপটিকস-এর উপর ভিত্তি করে লিখতে হয়। এ পুস্তক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং রোজার বেকনকে প্রভাবিত করে। । তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ হতে প্রতীয়মান হয় যে, ছন্দ ও তালযুক্ত সঙ্গীত খৃস্টান ইউরোপে প্রবর্তিত হওয়ার বহু শতাব্দী আগে মুসলিম জগতে প্রচলিত ছিল।

পাক-ভারতীয় গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত' ৭৭১ সালে বাগদাদে নীত এবং এরই প্রভাবে মুসলিম জগতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন শুরু হয়। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে মোটামুটি নির্ভুল যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম পর্যবেক্ষণ শুরু হয় এবং সে শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই খলীফা আল-মামুন বাগদাদের ভিতরে ও দামেস্কের বাইরে মান-মন্দির নির্মান করেন। সে যুগের উপকরণ ছিল উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (কোয়াডরেন্ট ও এস্ট্রোলেব) সূর্য ঘড়ি (ডায়াল) ও গোলক (গ্লোব)। এই খলীফার জ্যোতির্বিদারা একটা নিতান্ত সূক্ষ্ম হিসাবের কাজ করেনঃ অর্থাৎ পার্থিব ডিগ্রীর দৈর্ঘ্য পরিমাপ। এর উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীকে গোলাকার ধরে নিয়ে তার আয়তন নির্ণয় করা । ইউফ্রেতীসের উত্তরস্থ সমতল ভূমি ও পামীরার নিকট এই জরিপ কাজ সমাধা করা হয় এবং এ জরিপের ফলে মধ্যরেখার (মেরিডিয়ামের) এক ডিগ্রীর দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় ৫৬জত(২,৩) আরবী মাইল। আশ্চর্য রকম সূক্ষ্ম হিসাব; কারণ ওখানকার ডিগ্রীর যা প্রকৃত দৈর্ঘ্য, এ হিসাবে তার চেয়ে মাত্র ২৮৭৭ ফুট বেশী দেখান হয়।

যে সব জ্যোতির্বিদ এ কাজে সম্ভবতঃ শরীক হন, তাদের মধ্যে ছিলেন আল-খাওয়ারিজমী। ইনি ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম এবং মধ্যযুগীয় সমস্ত লেখকের চেয়ে ইনি গণিত-বিষয়ক চিন্তাকে অধিকতর প্রভাবিত করেন। তিনি সবচেয়ে আগে গ্রহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নির্ঘণ্ট সংকলন করেন, সবচেয়ে আগে অঙ্ক ও এলজেবরা সম্বন্ধে বই লেখেন। তার লিখিত এলজেবরা ল্যাটিনে অনূদিত হয় ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত গণিত সম্বন্ধীয় প্রধান বই হিসেবে পাঠ্য থাকে এবং ইউরোপে এইরূপে এলজেবরা বিজ্ঞানের প্রবর্তন হয়। তাঁরই গ্রন্থাবলী মারফত পাশ্চাত্যে আরবী সংখ্যাতত্ত্ব প্রবেশ লাভ করে এবং তাঁর নাম অনুসারে সে সংখ্যাতত্ত্বের নাম হয়, এলগোরিজম'। এই সময় শূন্য বা সাইফারও আরবী সিফার' প্রবর্তিত হয়।

মেটিরিয়ামেডিকা, গ্রহ-বিজ্ঞান এবং গণিতের পরই আরবদের শ্রেষ্ঠ দান রসায়ন-শাস্ত্রে। রসায়ন এবং অন্যান্য পদার্থ-বিজ্ঞান অধ্যয়নে তারা বাস্তব পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান শুরু করেন। গ্রীকদের অস্পষ্ট আন্দাজের চেয়ে এ

নিঃসন্দেহ রকমে উন্নতর পদ্ধতি ছিল। প্রকৃতির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহে অসাধারণ ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও আরবরা সহজে কোন উপযুক্ত হাইপথিসিস বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না। তাদের চরম দুর্বলতা দেখা দিত, কোন পদ্ধতির চরম বিশ্লেষণের বেলায়।

'আল কিমিয়াকে' আমরা আরবী শব্দ বলে জানি। আসলে শব্দটি ছিল অতি প্রাচীন যুগের একটি মিসরীয় শব্দ; মানে ছিল 'কালো।' গ্রীক ভাষার ভিতর দিয়ে শব্দটি আরবীতে আসে। আরবীয় আল-কিমিয়ার জনক ছিলেন জাবের-ইবনে-হাইয়ান। ৭৭৬ সালের কাছাকাছি কুফায় তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর মিসরীয় ও গ্রীক পূর্ববর্তীদের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, কোন রহস্যপূর্ণ দ্রব্যের সাহায্যে টিন, সীসা, লোহা ও তামা প্রভৃতি মৌলিক ধাতুকে সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত করে চলে এবং এই অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হন। পরীক্ষামূলকভাবে বিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্ব তিনি সে আমলে সমস্ত কিমিয়াবিদদের চেয়ে অধিতর স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন এবং রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে তার তত্ত্বগত ও কার্যগত অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য জগতে একটা বিশ্বাস চলে আসছে যে, তিনি কয়েকটি রাসায়নিক কমপাউন্ড আবিষ্কার করেন; কিন্তু যে বাইশটি আরবী বইয়ে লেখক হিসেবে তাঁর নাম আছে, তাঁর কোনটিতে এ আবিষ্কারের উল্লেখ নাই। একথা সত্য যে, আরবী ও ল্যাটিনে যে একশ' বই তাঁর নামে চলে, তার বেশীর ভাগই মেকি। তথাপি তাঁর নামে চলিত বইগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর পর এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রাসায়নিক আলোচনা পুস্তক ছিল। তাঁর কয়েকটি অবদান সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় রসায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া—ভস্মীকরণ (ক্যালসিনেশন) এবং উপাদান বিশ্লেষণ (রিডাকশন) বর্ণনা করেন। বাষ্পীভূতকরণ (ইভাপোরেশন), ঊর্ধ্বপাতন (সাবলিমেশান), দ্রবীভূতকরণ (মেলটিং) এবং জমাটভুক্তকরণ (ক্রিস্টালিজেশন) প্রক্রিয়ার তিনি উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি কাঁচা সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড তৈরী করে তা মিশিয়ে একোয়া রিজীয়া (পানির রাজা) উৎপাদন করতে জানতেন এবং সে একোয়া রিজীয়ায় সোনা ও রূপা গলান যেত। এই যে দাবী, এর কোন প্রমাণ নাই। ধাতুর উপাদান সম্বন্ধে আরাস্তুর মতবাদকে তিনি সংশোধন করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক রসায়নের আরম্ভের আগ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তনসহ তার সেই মতবাদ প্রচলিত থাকে।

হজ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, মক্কার দিক করে মসজিদ তৈরীর নিয়ম এবং নামাজের সময় কাবার দিকে সিজদাকরণ—এইসব কারণ মুসলমানকে ভুগোল

অধ্যয়নে উৎসাহিত করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের দরকার ছিল। জ্যোতিষও তার বৈজ্ঞানিক-প্রভাব বিস্তার করে। সপ্তম এবং নবম শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম সওদাগরেরা পূর্ব দিকে জল-স্থল উভয় পথে চীনে পৌঁছে; দক্ষিণ জাঞ্জিবার দ্বীপ ও আফ্রিকার দূরতম উপকূলে গিয়ে হাজির হয় এবং উত্তরে রাশিয়ায় গিয়ে প্রবেশ করে। পশ্চিম দিকে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় 'অন্ধকার সমুদ্রে' (আটলান্টিকের) অনন্ত বারিরাশি দ্বারা। প্রত্যাগত সওদাগরদের মুখের কাহিনী জনগণের মনে দূরদূরান্তের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক করত। টলেমীর ভূগোল সোজাসুজি কিংবা সিরীয় ভাষা মারফত আরবীতে কয়েকবার অনূদিত হয় এবং এর সাহায্যে বিখ্যাত খাওয়ারিজমী অন্যান্য ৬৯ জন পণ্ডিতসহ 'পৃথিবীর একটি রূপ-কল্প মূর্তি' মানচিত্র তৈরী করেন। এই-ই ছিল মুসলিম জগত ও পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানচিত্র। আরব ভৌগোলিকেরা পাক-ভারত হতে একটা ধারণা পেয়েছিল যে, পৃথিবীর একটা কেন্দ্রস্থল আছে। তারা এর নাম দিয়েছিল 'আরিন।' এ ছিল টলেমীর ভূগোলে উল্লেখিত একটি পাক-ভারতীয় শহরের নামের অপভ্রংশ। এ শহরে একটি মান-মন্দির ছিল এবং এই শহরের দ্রাঘিমা রেখার উপর নাকি স্থাপিত ছিল পৃথিবীর চূড়া। টলেমীর মত মুসলিম ভৌগোলিকেরা সাধারণতঃ প্রধান প্রাইম মেরিডীয়ান হতে দ্রাঘিমার মাপ-জোক করতেন। এখন যাকে ক্যানারী দ্বীপমালা বলে, এ মেরিডীয়ান তারই উপর দিয়ে গেছে।

দর্শন ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে যেমন গ্রীক প্রভাব সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ছিল, ইতিহাস এবং সাহিত্য রচনাতে তেমনি পারসিক প্রভাব সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ছিল। কিন্তু বিষয়ের উপস্থাপনে চিরাচরিত ইসলামী প্রথাই চলতে থাকে। প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বা সমসাময়িকদের কথায় বর্ণিত হয় এবং একের পর এক অনেকজন বর্ণনাকারীর মারফত শেষ বর্ণনাকারী গ্রন্থকারের নিকট পৌঁছে। এই পদ্ধতি অনুকরণ করায় ঘটনার সঠিকতা বৃদ্ধি পায়; আর এতে তারিখ ও একদম মাসের দিন পর্যন্ত দেওয়ার তাগিদ থাকে। কিন্তু বর্ণনাকারীরা অখণ্ড শৃঙ্খলে বর্ণনা করেছে কিনা এবং তারা বিশ্বাসযোগ্য ছিল কিনা, ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এর উপর যতখানি নির্ভর করা হত, আসল ঘটনার সূক্ষ্ম বিচারমূলক পরীক্ষার উপর ততখানি নির্ভর করা হত না। ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনাকারী নির্বাচন এবং তথ্যাবলী সাজানো ছাড়া ইতিহাসবেত্তা বিশ্লেষণ, সমালোচনা, তুলনা বা অনুমানশক্তির প্রয়োগ কমই করতেন।

আরব ঐতিহাসিকেরা সে যুগের ঘটনাবলী সম্বন্ধে যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে লিখলেও তাদের নিজস্ব প্রকৃতিসঙ্গত ঐতিহাসিক সাধনার ফল হচ্ছে, হাদীস বা

ধর্মীয় ঐতিহ্য-বিজ্ঞান। হযরত মুহম্মদের (সঃ) পর প্রথম আড়াই শতাব্দীর মধ্যে তাঁর কথা ও কাজের দলীল বহু পরিমাণে বেড়ে যায়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন সমস্যার উদ্ভব হলেই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলি মহানবীর কোন কথা বা রায় উদ্ধৃত করে নিজ নিজ মত সমর্থন করত, তা মহানবীর উদ্ধৃত কথা বা রায় সঠিকই হোক আর কৃত্রিমই হোক।

প্রত্যেক পূর্ণ হাদীস দুই অংশে বিভক্ত ঃ বর্ণনা-পরম্পরা ও মূল বিষয়। মূল বিষয় বর্ণনানুক্রমের পরে আসে এবং সোজাসুজি বলা হয় ঃ ক' আমার কাছে বর্ণনা করল যে খ' তার কাছে বর্ণনা করেছে; খ বলেছে গ এর উপর নির্ভর করে, আর গ বলেছে ঘ-এর উপর নির্ভর করে এবং ঘ বলেছে....।' এই একই আর্যা ফরমূলা সরকারী ইতিহাস ও 'জ্ঞান-সাহিত্যে' (উইজডম লিটারেচার) প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমালোচনা ছিল বাইরের জিনিস। কারণ, তা সীমাবদ্ধ ছিল বর্ণনাকারীদের সততা বিচারে—যাতে একটা সম্পূর্ণ বর্ণনানুক্রম স্বয়ং মহানবী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে।

রোমকদের পর মধ্যযুগীয় জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র আরবরাই আইন-বিজ্ঞান অনুশীলন করে একটা স্বতন্ত্র বিধানের বিকাশ সাধন করে। এর আসল ভিত্তি ছিল কোরআন ও হাদীস; তবে এর উপর গ্রীকো-রোমাক আইনের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইসলামের শরায়ী আইন মারফত কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর আদেশাবলী পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জ্ঞাত করানো হয়।

শরায়ী আইনের বিধান মুসলমানের-কি ধর্মীয়, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক—সমস্ত জীবনই নিয়ন্ত্রণ করে। এ আইন তার বিবাহ জীবন, তার নাগরিক জীবন এবং অমুসলমানের সঙ্গে তার ব্যবহারগত জীবন পরিচালনা করে থাকে। ধর্মীয় আইনের উপরই মুসলমানের নৈতিক আইনের ভিত্তি। আইনের দিক হতে মানুষের সমঃ কাজকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ ১. অপরিহার্য ফরয, — (অবশ্য পালনীয়) পালন না করলে শাস্তি; ২. প্রশংসনীয় পুণ্য কাজ ঃ করলে পুরস্কার না করলে শাস্তি নাই ৩. অনুমতি দেওয়া কাজ; আইন এ সম্বন্ধে উদাসীন; . না পছন্দ কাজ; অননুমোদিত—তবে শাস্তি নাই; ৫. হারাম কাজ ঃ করলে কঠোর শাস্তি।

কোরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে নীতিশাস্ত্রের যে সব বই লেখা হয়েছে, তার সংখ্যা প্রচুর হলেও আরবী সাহিত্যে নীতিঘটিত যত কথার আলোচনা আছে, তার সমস্ত ও-সব বইয়ে স্থান পায় নাই। এইসব দার্শনিক-গ্রন্থে আত্মসমর্পণ, সন্তোষ এবং সবরের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে; পাপ হচ্ছে, আত্মার ব্যারাম আর দার্শনিক তার চিকিৎসক।

১০০০ সালের কাছকাছি আরবী সাহিত্য উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে; কিন্তু পারস্যের প্রভাবের ফলে রচনা-রীতি কৃত্রিম ও অলঙ্কারবহুল হয়ে পড়ে। প্রাথমিক যুগের সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ এবং সহজ প্রকাশভঙ্গী চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। এর স্থান দখল করে এক মার্জিত সুন্দর উপমাবহুল ও ছন্দোময় রচনাশৈলী। পাশ্চাত্য জগত এ যুগের সাহিত্যের মধ্য হতে একখানি বই বেছে নিয়েছে—'আরব্য উপন্যাস' এবং তারই উপর এর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। আল-জাহশিয়ারী (মৃত্যু ৯৪২) একটি পারস্য দেশীয় কাহিনী অবলম্বন করে এর প্রথম খসড়া তৈরী করেন। পরে স্থানীয় গাল্পিকরা অন্যান্য কাহিনী ও নায়িকা শাহারজাদের নাম যোগ করে। যতই দিন যেতে থাকে ততই পাক-ভারতীয়, গ্রীক, হিব্রু, মিসরীয় এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার প্রাচ্য গল্প এর সঙ্গে যোগ হতে থাকে। হারুনর রশীদের কাল্পনিক দরবার অবলম্বনে অনেকগুলি রসাল গল্প ও ভালোবাসার কাহিনী জন্মলাভ করে। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে এ উপন্যাসে গল্পের সংযোজন শেষ হয় নাই। আশ্চর্যের কথা এই, আরব্য-উপন্যাস প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যে অনেক বেশী লোক-প্রিয়।

আরব্য উপন্যাস যখন আরবীতে শেষ আকার ধারণ করে, তখন সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মুসলমানদের সোনার যুগ শেষ হয়ে গেছে। আব্বাসীয় যুগের পর বিজ্ঞানের কোন বিভাগেই আর কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। আজকের মুসলমানেরা কেবল তাদের নিজের বইয়ের উপর নির্ভর করলে তাদের সেই সুদূর একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পুরুষদের চেয়ে নীচেই তাদের স্থান হবে। চিকিৎসা, দর্শন, গণিত, উদ্ভিদ-বিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রে মুসলমানরা একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত ওঠে। তারপর যেন মুসলিম-জগতের মন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম ও বিজ্ঞানঘটিত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ ভক্তি আরব-বুদ্ধিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলে; কেবল ইদানীং তারা শৃঙ্খল ভাঙ্গতে শুরু করেছে।

চারু শিল্প

সেমিটিক মনের অধিকারী আরব। কবিতার মত চারু-শিল্পের সে বস্তুর বিভিন্ন খণ্ড ও অন্তর্নিহিত আদর্শের দিকে নজর দিয়েছে বেশী—সমস্ত খণ্ডকে মিলিয়ে এক সুসমঞ্জস অখণ্ড সৃষ্টিতে তার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে কম। তবে বিজ্ঞানে যেমন সে খানিক দূর অগ্রসর হয়ে তার থেমে যায়—ভাস্কর্য শিল্পে, বিশেষ করে চিত্র-শিল্পে তেমন ঘটে নাই।

ভাস্কর্য শিল্পের যে-সব অতুল্য অবদান একদিন বাগদাদের শোভা বর্ধন করত, আজ তার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। মুসলিম ভাস্কর্য-প্রতিভার দুটি অমর সৃষ্টি এখনো বেঁচে আছে ঃ এ দুটি হচ্ছে, দামেস্কের মহান মসজিদ আর বায়তুল মোকাদ্দেসের প্রস্তর গম্বুজ। কিন্তু এ দুটিই আরো আগের জামানার কীর্তি। সেকালের বাগদাদের অদ্ভুত জাঁকজমকের কথা আমরা জানি; কিন্তু খলীফা আল-আমিন ও আল-মামুনের গৃহযুদ্ধ, ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের অনুষ্ঠিত ধ্বংসলীলা এবং স্বাভাবিক কারণ—সমস্ত মিলে শহরটির এমনি পরিপূর্ণ বিনাশ সাধন করেছে যে, আজ সে প্রাসাদসমূহের অবস্থান-ভূমি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

আল-মুতাওয়াক্কিলের আগ পর্যন্ত বাগদাদের বাইরের কোন বিধ্বস্ত আব্বাসীয় কীর্তির আনুমানিক তারিখ নির্ণয় কঠিন। মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭—৮৬১) সামাররার বিরাট মসজিদের নির্মাতা। এই জামে মসজিদটি ৭ লক্ষ দিনার খরচ করে তৈরী করা হয়। আকারে মসজিদটি চৌকোণ ছিল; এর জানালার বিচিত্র খিলান পাক-ভারতীয় প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগের যেসব আব্বাসীয় ভগ্ন-কীর্তি রাককায় পাওয়া যায়, তা এবং সামাররায় প্রাপ্ত কীর্তি-চিহ্ন এশিয়ার—বিশেষ করে পারসিক ভাস্কর্য-রীতির ঐতিহ্যের পরিচায়ক। উমাইয়া ভাস্কর্য-রীতি কিন্তু বাইজেন্টাইন-সিরিয়ান ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

আমরা আগেই বর্ণনা করেছি যে, একজন খলীফা তাঁর প্রাসাদশীর্ষে একটি বর্শাধারী অশ্বারোহী মূর্তি স্থাপন করেন। এ মূর্তি হয়তো দিক-নির্দেশক যন্ত্রের

কাজ করত। আর একজন খলীফা তাইগ্রিস বক্ষে প্রমোদ-বিহারের জন্য সিংহ, ঈগল ও শুশুক মূর্তির বজরা তৈরী করেন; এবং আরো একজন খলীফা তাঁর প্রাসাদের বিরাট পুকুরে সোনা-রূপায় তৈরী আঠারোটি শাখামুক্ত এক গাছ স্থাপন করেন। পুকুরের দুই পারে কিংখাবের পোশাক পরিহিত অশ্বারোহীর মূর্তি ছিল; তারা বর্শা হাতে নিয়ে এমনভাবে নড়াচড়া করত, যেন লড়াইয়ে মেতে আছে।

সামাররার নির্মাতা খলীফা আল-মুতাসীমের প্রাসাদ-দেয়াল নারীমূর্তি এবং শিকারের দৃশ্যে সজ্জিত ছিল। এগুলি হয়তো ছিল কোন খৃস্টান শিল্পীর কাজ। তার পরবর্তী দ্বিতীয় খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের আমলে এই অস্থায়ী রাজধানী সামাররা উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। আল-মুতাওয়াক্কিল তাঁর প্রাসাদ-প্রাচীরের রূপসজ্জার জন্য বাইজেন্টাইন চিত্রকর নিযুক্ত করেন। তাঁরা নানা চিত্রের মধ্যে পাদ্রীসহ একটি গীর্জার চিত্র সে সজ্জার অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

মুসলিম-জগতে চিত্র-বিদ্যাকে জোর করে কাজে লাগানো হয়েছে অনেক দেরীতে। বৌদ্ধ ও খৃস্টান-জগতে চিত্র-বিদ্যা যেমন সম্পূর্ণরূপে ধর্মের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে, মুসলিম-জগতে তেমন কখনো ঘটে নাই। জনৈক আরব ভ্রমণকারী নবম শতাব্দীর শেষভাগে চীনের দরবারে মহানবীর একটি ছবি দেখেন। এর আগের আর কোন ছবির দলীল নাই। তবে এ ছবি হয়তো নেস্টোরীয়ান খৃস্টানদের আঁকা ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভের আগে মুসলিম ধর্মীয় ছবি পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। স্পষ্টই মনে হয়, প্রাচ্যদেশীয় খৃস্টান গীর্জা—বিশেষ করে জ্যাকোবাইট ও নেস্টোরীয়ান খৃস্টানদের নিকট হতেই এ আদর্শ গ্রহণ করা হয়।

আরবরা পারসিক সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। পারসিকরা অতি প্রাচীনকালেই রং ও রূপ-সজ্জামূলক পরিকল্পনায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে। তাদের চেষ্টায় ইসলামে ব্যবসায়গত চিত্র-শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ফেরাউনীয় যুগের মিসরে গালিচা-শিল্পের সূচনা হয়। পারসিকদের হাতে এ শিল্পের অসাধারণ বিকাশ লাভ হয়। কম্বলের উপর সাধারণতঃ শিকার ও বাগানের ছবি আঁকা হত; রং পাকা করার জন্য তারা ফিটকারী ব্যবহার করত। মিসর ও সিরিয়ার হস্তচালিত তাঁতে যে সব কারু-কাজ করা রেশমী কাপড় উৎপন্ন হত, ইউরোপে তার কদর এত বেশী ছিল যে, ক্রুসেডার ও পাশ্চাত্যের ঋষি-দরবেশদের মাজার ও পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন ঢাকার জন্য এই কাপড়কেই সর্বাগ্রগণ্য মনে করা হত।

মৃৎ-শিল্প মিসর ও সুসার মতই প্রাচীন। মাটির বাসনের এ শিল্পে সৌন্দর্য-বিধানের কাজে মুসলমানেরা যে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে, তার চেয়ে

অধিক দক্ষতা তারা আর কোন শিল্পেই করে নাই। বাসনের গায়ে তারা মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা এবং জ্যামিতিক চিত্র আঁকত—কখনো-বা লিখত উদ্ধৃত কবিতা। চিত্রিত 'কাশানী টাইল' পারস্য হতে দামেস্কে আমদানী হয়। দালান-কোঠার ভিতর এবং বাইর সাজানোর জন্য এই টাইল ও মোজাইক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। আরবী বর্ণমালার হরফ অবলম্বন করেও একটি সুন্দর আর্টের সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক, ইসলামী চিত্র-শিল্প আরবী হরফ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে। এমনকি আরবী হরফ চিত্রণ ধর্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। যেসব শহরে ইনামেল করা ও কাচে সোনালী রং করার কাজ পূর্ণ বিকাশ লাভ করে, তার মধ্যে এনটিওক, আলেপ্পো, দামেস্ক এবং প্রাচীন ফিনিশীয় শহরের মধ্যে টায়ার ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লুভার, বৃটিশ মিউজিয়াম ও কায়রোর আরব মিউজিয়ামের বহু অমূল্য সংগ্রহের মধ্যে আছে সামাররা ও ফুসতাত হতে আনীত বাসন, পেয়ালা, ফুলদানী, সোরাহী এবং বাতিদানী (বাড়ী ও মসজিদ উভয় স্থানে ব্যবহারের জন্য)। অদ্ভূত উজ্জ্বল রঙে এগুলি চিত্রিত। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন তাতে ফুটে উঠছে রামধনুর পরিবর্তনমান রঙের সুন্দর আভা।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরীতে লিপি-শিল্পের উদ্ভব হয়। এ শিল্পে কোরআনের অনুমোদন ছিল। আর এর উদ্দেশ্যও ছিল আল্লাহর কালামকে রূপ দেওয়া। কাজেই অনতিকাল মধ্যেই এ একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ ছিল সম্পূর্ণ ইসলামী আর্ট এবং চিত্র-শিল্পের উপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জীবন্ত কোন সৃষ্টির ছবি আঁকতে পারত না বলে মুসলমানদের সৌন্দর্য-পিপাসা এই খাতে প্রবাহিত হয়।

চিত্র-শিল্পীর চেয়ে লিপি-শিল্পী উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ছিল। রাজা বাদশাহরা পর্যন্ত কোরআন নকল করে সওয়াব হাসিলের চেষ্টা করতেন। সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক আরবী গ্রন্থে কতিপয় লিপি-শিল্পীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ভাস্কর্য-শিল্পী, চিত্র-শিল্পী ও ধাতু-শিল্পীদের সম্পর্কে সেসব গ্রন্থ নিশ্চুপ। লিপি-শিল্পই একমাত্র আরব আর্ট, যার অনুশীলনে ইস্তাম্বুল, কায়রো, বৈরুত এবং দামেস্কে আজো খৃস্টান ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর বহু শিল্পী ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁদের হাতের কাজ রুচি ও সৌন্দর্যে প্রাচীনকালের যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। কোরআনের সঙ্গে যোগ থাকার ফলে কেবল লিপি-শিল্পই নয়, বিচিত্র রং ও চিত্রে বইয়ের অঙ্গ-সজ্জা ও বই বাঁধানোর সংশ্লিষ্ট শিল্পও যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। শেষ জামানার আব্বাসীয়দের অধীনে বই চিত্রিত করার শিল্প হয়, ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে।

শাস্ত্রকারদের সঙ্গীত সম্পর্কিত আপত্তি দামেস্কে যেমন কার্যকরী হয় নাই, বাগদাদেও তেমনি কার্যকরী হয় নাই। হারুনর রশীদের মার্জিত ও জমকালো দরবার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যেমন পৃষ্ঠপোষকতা করে, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতেরও তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা করে। কার্যতঃ সে দরবার আলা দরজার সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। গোলাম-বাঁদী, গায়ক-গায়িকাসহ বহু বেতনভোগী ওস্তাদ দরবারের সাহায্যে মান ইজ্জতের সঙ্গে বাস করত। এদেরই অবলম্বন করে বহু অদ্ভুত উপাখ্যান সৃষ্টি হয়ে আরব্য উপন্যাসে স্থান লাভ করে। খলীফার পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত একটি উৎসবে দুই হাজার গায়ক অংশগ্রহণ করে। তাঁর পুত্র আল-আমিন অনুরূপ একটি নৈশ উৎসবের ব্যবস্থা করেন। সে উৎসবে তাঁর প্রাসাদের আমলারা নর-নারী নির্বিশেষে ভোর পর্যন্ত নৃত্য করে।

সে আমলের গায়কদের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়, মুখারিকের মধ্যে। মুখারিক হারুনর-রশীদের আশ্রয়ে বাস করত। আদতে সে ছিল এক কশাইয়ের ছেলে। অল্প বয়সে একদা সে পিতার দোকানে বসে 'গোশত চাই'—চাই ভালো গোশত' ইত্যাদি বলে চীৎকার করছিল। তার সুন্দর ও শক্তিমান গলা শুনে একজন গায়িকা তাকে কিনে নেয়। পরবর্তীকালে সে হারুনর রশীদের আয়ত্তে এসে পড়ে। হারুন তাকে আযাদ করে একলক্ষ দিনার উপহার দেন এবং তাঁর নিজ পাশে তাকে স্থান দিয়ে তার ইজ্জত বাড়িয়ে দেন। একদা সন্ধ্যায় সে তাইগ্রিস নদীর বুকে গিয়ে ছেড়ে গান শুরু করে। তখনই দেখা যায় যে, বাগদাদের অলি-গলির চারদিক হতে প্রদীপ হাতে বহু লোক তার গান শোনার জন্য উতলা হয়ে ছুটে আসছে।

মুখারিক ও অন্যান্য বহু গুণী মানুষ সে উন্নতির যুগে খলীফাদের সাথী হিসেবে অমরত্ব অর্জন করেন। কিন্তু এঁরা কেবল গানের ওস্তাদ ছিলেন না, আরো কিছু ছিলেন। এঁদের তীক্ষ্ণ রস-জ্ঞান ও প্রবল স্মরণশক্তি ছিল। এঁরা বহু বাছা বাছা কবিতা ও রসাল উপাখ্যান বলতে পারতেন। এঁরা তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত গায়ক, রচক, কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। গুরুত্বের দিক দিয়ে এরপরই স্থান ছিল বাদকদের। বীণা সবচেয়ে লোক-প্রিয় ছিল। বেহালা (ভায়োল) সাধারণতঃ নিম্নস্তরের বাদকরা বাজাত। তারপর স্থান ছিল গায়িকা বালিকাদের। এরা প্রায়শঃ পরদার আড়ালে থেকে গাইত। এ শ্রেণীর গায়িকা বালিকারা ক্রমে হেরেমের অপরিহার্য সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে পরিগণিত হয়। এদের লালন ও শিক্ষা দান এক লাভজনক শিল্প হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি বালিকার জন্য মিসরের গভর্নর ৩০ হাজার দিনার দিতে চেয়ে দূত পাঠান; বাইজেন্টাইন সম্রাটের এক প্রতিনিধি ঐ পরিমাণ অর্থ দিতে চান; খোরাসানের

গভর্নর দিতে স্বীকার করেন ৪০ হাজার দিনার। বাঁদীর মালিক সবাইকে হার মানিয়ে তাকে আযাদী দিয়ে সাদী করেন।

আব্বাসীয়দের সোনার যুগে বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল সঙ্গীতের তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থ হতেই আরবরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লাভ করে এবং দেহের উপর শব্দ কি ক্রিয়া করে, সে সম্বন্ধে অবহিত হয়। কিন্তু সঙ্গীতের ব্যবহারিক ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণভাবে আরব-আদর্শের উপর নির্ভর করে। এর কাছাকাছি সময়ে আরবরা গ্রীক ভাষা হতে 'মিউজিকী' পরে (মিউজিকা—মিউজিক) শব্দটি ধার করে এনে সঙ্গীত বিজ্ঞানের কেবল তত্ত্বমূলক ভাগের জন্য ব্যবহার শুরু করে; ব্যবহারিক ভাগের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে পুরোনো আরবী শব্দ 'গীনা।' এর আগে গীনা শব্দে নাচ-গান উভয়ই বুঝাত। কিতার' (গিটার) এবং উরগুন' (অরগান) যন্ত্রের নাম হিসেবে ও অন্যান্য পারিভাষিক শব্দ এই সময় গ্রীক হতে এসে আরবী ভাষায় স্থান লাভ করে। 'অরগান' নিঃসন্দেহ রকমে বাইজেন্টাইনদের নিকট হতে আমদানী করা হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে পারিভাষিক গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগই হারিয়ে গেছে। 'নগম' ও 'ইকা' প্রভৃতি আরবী সঙ্গীতের উপকরণ কেবল মুখে মুখে শিখানো হত। শেষ পর্যন্ত এই দুই-ই লোপ পেয়েছে। আরবী সুরে (চ্যান্ট) স্বর-মাধুর্যের (মেলোডী) পরিমাণ কম; কিন্তু এ সুর ছন্দে শক্তিশালী। পুরোনো সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কয়খানা বই আছে, তা কোন আধুনিক পাঠক ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারে না বা ছন্দ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সেকালের মানে বোঝে না।

জগত-মণি কর্ডোভা

মুসলিম-সাম্রাজ্যের পূর্বভাগ যখন তার সোনার যুগের সীমান্তে উপনীত, সেই সময় সে সাম্রাজ্যের সুদূর পশ্চিমভাগও স্পেনে অনুরূপ জাঁকজমকের মধ্যে রাজ্য-শাসনে ব্যস্ত। আমাদের পক্ষে স্পেনের এ যুগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, আমরা যে সভ্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তার জন্ম হয় প্রাথমিক মধ্যযুগীয় খৃস্টান সংস্কৃতির অন্তঃস্থলে আরব সংস্কৃতির প্রবেশের ফলে; আর সে আরব সংস্কৃতি প্রধানতঃ এই স্পেন হতেই অগ্রসর হয়। নবম এবং একাদশ শতাব্দীর মাঝখানে এই পাশ্চাত্যে মুসলিম-সভ্যতা তার উচ্চতর শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার আগে আমাদিগকে আমাদের কাহিনী প্রসঙ্গে ৭৫০ অব্দে ফিরে যেতে হবে।

আমরা আগে দেখেছি যে, ৭৫০ সালে আব্বাসীয় বংশ উমাইয়া বংশকে উৎখাত করে। আমরা আরো দেখেছি, বিজয়ী বংশ পরাজিত বংশের যাকে যেখানে পেয়েছে, সেখানেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

অতিঅল্প সংখ্যক লোকই এই নৃশংস হত্যার কবল হতে রেহাই পায়; তার মধ্যে একজন ছিলেন বিশ বছরের একটি যুবক। নাম তার আবদুর রহমান। লম্বা, পাতলা, লালচুল, ঈগলের মত তীক্ষ্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অত্যন্ত সবল স্নায়ু, অসামান্য কর্ম-ক্ষমতা—নানাদিক দিয়েই অসাধারণ। ইনিই স্পেনে চলে যান—ইনিই লড়াই করে প্রভুত্ব অর্জন করেন, ইনিই প্রাচ্যে নিশ্চিহ্ন উমাইয়া বংশকে স্পেনে ক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

তাঁর পলায়নের কাহিনী রোমাঞ্চকর। তিনি ইউফ্রেতীস নদীর পশ্চিম পারে একটি বেদুঈন তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একদা আব্বাসীয়দের কৃষ্ণ পতাকাবাহী একদল অশ্বারোহী সেখানে আবির্ভূত হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর তেরো বছরের ভাই ছিল। ভাইকে নিয়ে তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মনে হয়, ভাই তাঁর সাঁতারে দক্ষ ছিল না। পার হতে লোকেরা চীৎকার করে ডাকতে থাকে, 'ফিরে এস—ফিরে এস। তোমার গায় হাত তুলব না।' আবদুর রহমানের নিষেধ সত্ত্বেও বালক ফিরে যায়। পারের লোকেরা তাকে তখনি হত্যা করে। আবদুর রহমান সাঁতরিয়ে অপর পারে গিয়ে ওঠেন।

বন্ধুহীন, কপর্দকহীন আবদুর রহমান পায় হেঁটে দক্ষিণ-পশ্চিম পানে চলেন এবং বহু কষ্টের পর ফিলিস্তিনে গিয়ে পৌছেন। এখানে একটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখান হতে আবার তিনি পশ্চিম পানে রওয়ানা হলো। এমনিভাবে তিনি গিয়ে পৌছেন উত্তর আফ্রিকায়। সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কোনরকমে বেঁচে যান। আজ এ কওমের কাছে গিয়ে কয়েক দিন থাকেন; কাল আর এক কওমের কাছে যান—পর তৃতীয় এক কওমের কাছে। এমনিভাবে যুবক ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আর নতুন বংশে গুপ্তচর তাঁর পেছনে লেগে থাকে। অবশেষে পাঁচ বছর পর তিনি সিউটায় গিয়ে পৌছেন। তিনি দামেস্কের দশম খলীফার পৌত্র ছিলেন এই অঞ্চলের বার্বাররা তাঁর মাতুল বংশ ছিল। তারা তাঁকে আশ্রয় দেয়।

সিওটা বরাবর প্রণালীর ওপারে দামেস্কের নিযুক্ত একদল সিরীয় সৈন্য অবস্থান করছিল। তিনি তাদের কাছে গিয়ে হাজির হন। তারা তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে নেয়। দক্ষিণের শহরগুলি একে একে তাঁর সামনে দুয়ার খুলে দেয়। সমস্ত স্পেন আয়ত্তে আনতে তাঁর আরো কয়েক বছর সময় লাগে; কিন্তু তিনি অবিরাম চেষ্টা করতে থাকেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা স্পেনের জন্য একজন গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান, যাতে তিনি আবদুর রহমানকে উৎখাত করে সেদেশে আব্বাসীয় শাসন কায়েম করতে পারেন। দুই বছর পর বাগদাদের খলীফা আবদুর রহমানের নিকট হতে একটি উপহার পান ঃ সেই গভর্নরের মস্তক—লবন ও কর্পূরে রক্ষিত, কালো পতাকা ও তাঁর নিযুক্তির সনদ দ্বারা আবৃত। দেখে খলীফা ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন : আল্লাহর দরগায় শুকরিয়া যে, তিনি আমার আর এমন দুশমনের মাঝখানে সমুদ্র স্থাপন করেছেন।' স্বয়ং শার্লেমেন একটি সংঘর্ষে তাঁর দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুর রহমানের শক্তি-পরীক্ষা করেন। সে সংঘর্ষের কাহিনী পাশ্চাত্য সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

শার্লেমেনকে আব্বাসীয় খলীফাদের মিত্র মনে করা হত। তাছাড়া, নতুন আমীর বা সুলতান স্বভাবতঃই তাঁর শত্রু মধ্যে গণ্য ছিলেন। শার্লেমেন ৭৭৮ সালে উত্তর-পূর্ব স্পেনের সীমান্ত পথে একদল সৈন্য পাঠান। তারা সারাগোসা পর্যন্ত এসে পৌছে। কিন্তু সারাগোসা আগন্তুক সৈন্যদের সম্মুখে নগর-দ্বার বন্ধ করে দেয়। ঠিক সেই সময়ই নিজ দেশে শার্লেমেনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে শত্রুদল মাথা তোলে। ফলে শার্লেমেনের সৈন্যদল সারাগোসা হতেই ফিরে যায়। পিরেনীজের পার্বত্য পথে যখন এরা প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, তখন বাস্ক এবং অন্যান্য পার্বত্যজাতি পেছন হতে এদের আক্রমণ করে। ফলে এদের বহু সৈন্য ও রসদ বিধ্বস্ত হয়। নিহত নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন, প্রখ্যাতনামা

বীর রোলেন্ড। 'চ্যানসন-ডি-রোলেন্ড' নামক গ্রন্থে তাঁর সে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানি কেবল ফরাসী-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন নয়— মধ্যযুগের একটি অপূর্ব সুন্দর মহাকাব্য।

৭৮৮ সালে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। তার দুই বছর আগে মক্কা ও বায়তুল মোকাদ্দেসের প্রতিদ্বন্দ্বী মসজিদ হিসেবে তিনি কর্ডোভায় একটি বিরাট মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তীরা এ মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ ও এর কলেবর বৃদ্ধি করেন। অল্পকাল মধ্যেই এ মসজিদ পাশ্চাত্য-ইসলামের উপাসনালয় হয়ে দাঁড়ায়। এর অসংখ্য উন্নত স্তম্ভ ও বিপুল অঙ্গন দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করত। ১২৩৬ সালে মসজিদটিকে গীর্জায় পরিণত করা হয়। আজো এ কীর্তি 'লা-মেজকিটা' (মসজিদ) নামে বেঁচে আছে। এ মসজিদ ছাড়া, রাজধানীতে এর আগেই গোয়াডেল কুইভার নদীর উপর একটি মস্ত সেতু নির্মিত হয়। পরে এর খিলান সংখ্যা সতেরোতে গিয়ে দাঁড়ায়। গোয়াডেল কুইভার নামটি আরবী নাম 'ওয়াদী-উল-কবীর' (বড় নদী) নামের অপভ্রংশ। কিন্তু উমাইয়া প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠাতা কেবল প্রজাপুঞ্জের সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না; তিনি বিভিন্ন উপায়ে আরব, সিরিয়ান, বার্বার, নুমিডিয়ান, হিস্পানো-আরব এবং গথ প্রভৃতি জাতিকে মিলিয়ে একজাতি গঠনের চেষ্টা করেন, যদিও তাঁর এ চেষ্টার সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল নিতান্ত অল্প। নবম হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুসলিম-স্পেনকে দুটি 'বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করে, সে আন্দোলনের সূত্রপাত কার্যতঃ তিনিই করেন।

খলীফা আবদুর রহমানের দরবার সমস্ত ইউরোপের সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ দরবারসমূহের অন্যতম ছিল। সে দরবারে বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং জার্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সের রাজাদের তরফ থেকে দূত আনাগোনা করত। তাঁর রাজধানী কর্ডোভার বাসিন্দা ছিল ৫ লক্ষ, মসজিদ ছিল ৭শ', সরকারী গোসলখানা ছিল ৩শ'। তৎকালীন জগতে বাগদাদ ও কনস্টানটিনোপল ছাড়া এমন আড়ম্বরপূর্ণ নগর আর একটিও ছিল না। ৪শ' কামরা, হাজার হাজার গোলাম-বাঁদী ও প্রাসাদ রক্ষীদের আবাসস্থানসহ রাজপ্রাসাদ শহরের উত্তর-পশ্চিমে সিয়েরা মোরেনার একটি শৈল-বাহুর উপর স্থাপিত ছিল। নীচে প্রবাহিত ছিল গোয়াডাল কুইভার। ৯৩৬ সালে আবদুর রহমান এই শাহী মনজিল নির্মাণ শুরু করেন। একটা কাহিনী প্রচলিত আছে যে, খলীফার একজন উপপত্নী মৃত্যুকালে অগাধ ধন রেখে ওসিয়ত করে যায় যে, খৃষ্টানদের দেশে কোন মুসলমান বন্দী থাকলে ঐ টাকায় যেন তাদের মুক্তি-মূল্য দেওয়া হয়। কিন্তু খৃষ্টানদের দেশে অমন কোন মুসলিম বন্দী না পাওয়া যাওয়ায় খলীফা আজ-

জাহরা নাম্নী তাঁর অন্য উপপত্নীর পরামর্শ ও নাম অনুসারে এই প্রাসাদের পত্তন করেন। এ মনজিলের জন্য মার্বেল আনা হয় নুমিডীয়া ও কার্থেজ হতে এবং সোনার মূর্তিসহ স্তম্ভ (খরিদা সূত্রে বা উপহার হিসেবে) আনা হয় কনস্টানটিনোপল হতে। ১০ হাজার শ্রমিক ১৫০০ ভারবাহী পশু সহ বিশ বছর কাল এর নির্মাণ কাজে মোতায়েন থাকে। পরবর্তী খলীফারা এর বিস্তৃতি ও সৌন্দর্য বিধান করেন। ফলে একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শাহী মহল্লা। ১৯১০ সালে এবং তার পরে মাটি খুঁড়ে আজ-জাহরার কতকাংশকে বের করা হয়েছে।

আজ-জাহরা প্রাসাদে যখন খলীফা বসতেন, তখন ৩,৭৫০ জন 'স্লাভ' দেহরক্ষী তাঁকে ঘিরে থাকত। তাঁর একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। দেহরক্ষীরা তাদের আগে চলত। জার্মান এবং অন্যান্য জাতি স্লাভোনিক জাতিসমূহের মধ্য হতে লোক বন্দী করে এনে আরবদের কাছে বিক্রি করত। কেবল এদেরই স্লাভ বলা হত। পরবর্তীকালে ফিরিঙ্গী, গ্যালিসীয়ান, লম্বার্ড ও অন্যান্য বিদেশীদের মধ্য হতে যত গোলাম খরিদ করা হত, তাদের সবাইকে স্লাভ নাম দেওয়া হয়। এদের সাধারণতঃ অল্প বয়সে খরিদ করে 'আরবায়িত' করা হত। স্পেনের এই 'জেনিসারী' বা মামলুকদের সাহায্যে কেবল যে রাজদ্রোহ ও দস্যুতা দমন রাখা হত এমন নয়, প্রাচীন আরব অভিজাত সমাজের প্রভাবকেও আয়ত্তে রাখা হত। এ-সময় কৃষি ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়; রাজকোষ ফেঁপে ওঠে। আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার দিনার; সৈন্যদের বেতন ও জনহিতকর কাজের জন্য এর এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ই যথেষ্ট ছিল। বাকী এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত তহবিলে যেত। এর আগে কোন সময়ই কর্ডোভা এত সমৃদ্ধিশালী, আন্দালুসীয়া এমন সম্পদের আকর এবং রাষ্ট্র এত শক্তি-দৃপ্ত ছিল না। একজন লোকের প্রতিভা বলে এ অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়। তিনি ৭৩ বছর বয়স মহাপ্রয়াণ করেন। কথিত আছে, মৃত্যুর আগে তিনি বলেন যে, তাঁর সমস্ত জীবনে মাত্র চৌদ্দদিন সুখে কেটেছিল।

প্রাচ্যে হোক আর পাশ্চাত্যেই হোক, মুসলিম-জগতের সর্বত্র যে কোন বংশের অধীনে রাজপদ অনিশ্চিত ছিল। প্রথম আবদুর রহমানের সময় হতে স্পেনে উমাইয়া বংশ নামতঃ রাজ্যশাসন চালিয়ে যাচ্ছিল। এ বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসনকর্তা তৃতীয় আবদুর রহমান যখন ৯১২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন গৃহ-বিবাদ, কওমী বিদ্রোহ এবং আমীরদের রাজনৈতিক অযোগ্যতা—সমস্ত মিলে স্পেনের সুসংবদ্ধ রাজ্যের সীমানাকে সংকীর্ণ করতে করতে কর্ডোভা ও তার উপকণ্ঠে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল।

তৃতীয় আবদুর রহমান প্রখ্যাতনামা পূর্ববর্তী আবদুর রহমানের মতই শাসন-ভার গ্রহণকালে ২৩ বছরের যুবক ছিলেন এবং তাঁর মতই এঁরও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল। একে একে তিনি বিজিত প্রদেশগুলি পুনর্জয় করেন, রাজ্যময় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সঙ্গে শাসন চালাতে থাকেন। তিনি পঞ্চাশ বছরকাল ৯১২—৯৬১ রাজত্ব করেন। সে যুগের হিসেবে এ অত্যন্ত দীর্ঘকাল। স্পেনে তিনিই প্রথম নিজকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। তাঁরই সময় হতে স্পেনে উমাইয়া বংশীয় খিলাফত শুরু হয়। তাঁর এবং তাঁর লাগ পরবর্তী দুইজন খলীফার আমলে পাশ্চাত্যে মুসলিম-শাসন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। এই যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি দশম শতাব্দীতে কর্ডোভা সমস্ত ইউরোপের মধ্যে সংস্কৃতির দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত শহর এবং বাগদাদ ও কন্সটানটিনোপলের সঙ্গে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি সংস্কৃতিকেন্দ্রের অন্যতম ছিল। কর্ডোভার পরিবার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার, শহরতলী ছিল ২১টি, কুতুবখানা ছিল ৭০টি, বইয়ের দোকান, মসজিদ ও প্রাসাদ ছিল অসংখ্য। স্বভাবতঃই এর খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর দৃশ্য ভ্রমণকারীদের মনে বিস্ময়-সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। শহরে বহু মাইল বিস্তৃত ইটে বাঁধানো পাকা রাস্তা ছিল এবং দুই পাশের বাড়ীর দীপের প্রভায় গলিসমূহ আলোক-উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এ "সময়ের ৭০০ বছর পর লন্ডনে একটিও সরকারী বাতি দেখা যায়নি। আর এর অনেক শতাব্দী পর পর্যন্ত প্যারিসে কোন বৃষ্টির দিনে কেউ সিঁড়ি বেয়ে ঘরে উঠলে তাকে এক হাঁটু কাদা নিয়ে উঠতে হত।"

নর্ডিক জাতীয় বার্বারদের সম্বন্ধে আরবরা যে মনোভাব পোষণ করত, তা টলেডোর সুবিজ্ঞ বিচারক সাইদের কথায় বুঝা যায়। তিনি বলেন ঃ 'যেহেতু সূর্য এদের মাথার উপর সোজাসুজি কিরণপাত করে না, সেই জন্য এদের দেশের আবহাওয়া ঠাণ্ডা আর আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন। সুতরাং, এদের মেজাজও ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে—আর এদের ব্যবহার হয়ে পড়েছে অমার্জিত। এদের দেহ স্থূল, গায়ের রং পাতলা এবং চুল লম্বা। সূক্ষ্ম রস-জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এদের একান্ত অভাব; নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি আছে এদের প্রচুর।' লিয়ন, ন্যাভার অথবা বার্সোলোনার শাসনকর্তার যখনই একজন সার্জন, রাজমিস্ত্রী, গানের ওস্তাদ অথবা উচ্চশ্রেণীর দরজীর দরকার হত, তখনই তাঁরা কর্ডোভায় লোক পাঠাতেন। এ মুসলিম-রাজধানীর যশোঃগাথা সুদূর জার্মানী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং তথাকার একজন মঠবাসিনী কর্ডোভা সম্পর্কে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেন : 'কর্ডোভা দুনিয়ার মণি।'

খলীফাদের শাসনাধীন স্পেন ইউরোপের সমৃদ্ধতম দেশসমূহের অন্যতম ছিল। ঘন বসতির দিক দিয়েও এ দেশ কোন দেশেরই পেছনে ছিল না।

রাজধানীতে ১৩ হাজার বস্ত্র-বয়ন শিল্পী ও একটি উন্নত চামড়ার কারখানা ছিল। চামড়া পাকা করা ও চামড়ার উপর উন্নত হরফে লেখার বিদ্যা স্পেন হতেই মরক্কোতে যায় এবং এ উভয় দেশ হতে যায় ফ্রান্সে ও ইংল্যান্ডে। পশম ও রেশমের কাপড় কর্ডোভা ছাড়া মালাগা, আলমেরিয়া ও অন্যান্য কেন্দ্রেও বোনা হত। গুটি পোকার চাষ প্রথমে চীনের একচেটিয়া ছিল। মুসলমানরাই এ-বিদ্যা চীন হতে স্পেনে নিয়ে যায়। স্পেনে গুটি পোকার চাষের বেশ উন্নতি হয়। আলমেরিয়াতে কাচ ও পিতলের জিনিস তৈরি হত। ভ্যালেনসিয়ার অন্তর্গত পেটারনা মৃৎ-শিল্পের কেন্দ্র ছিল। জায়েন ও আলগার্ভে সোনা-রূপার খনির জন্য, কর্ডোভা লোহা ও সীসার খনি এবং মালাগা রুবীর জন্য বিখ্যাত ছিল। দামেস্কের মত টলেডো তলোয়ারের জন্য বিশ্ব-ব্যাপী পরিচিত ছিল। ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুর উপর সোনা-রূপার কাজ ও ফুল তোলার বিদ্যা দামেস্ক হতে স্পেনে আসে। এ শিল্প স্পেন ও বাকী ইউরোপের কোন কোন শহরে বেশ উন্নতি লাভ করে। স্পেনীয় আরবরা পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত কৃষি-পদ্ধতি আমদানী করে। তারা খাল কাটে, আঙ্গুরের আবাদ করে এবং অন্যান্য ফল-মূলের মধ্যে নতুন প্রচলন করে—ধান, খুবানী, পীচ, ডালিম, কমলালেবু, আখ, কার্পাস ও জাফরান। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সমতল ভূমি আবহাওয়া ও উর্বরতার দিক দিয়ে উন্নত ছিল; এ-স্থান নানারকম কৃষি-শিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার ভাগ-চাষীরা প্রচুর পরিমাণে গম ও অন্যান্য শস্য এবং বিভিন্ন রকম ফল উৎপাদন করত।

কৃষির এই উন্নতি মুসলিম-স্পেনের এক পরম গৌরব এবং এই দেশের পক্ষে আরবদের একটি অমর অবদান ছিল। কারণ, আজো স্পেনের বাগানগুলিতে মুরীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'জেনারলাইফ' স্পেনের একটি অতি বিখ্যাত বাগান। নামটি আরবী 'জান্নাতুল আরিফ' (পরিদর্শকের বেহেশত) নামের অপভ্রংশ। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কীর্তি এবং আলহামরার বাইরে একটি ইমারত এর বিশ্রামাগার ছিল। সুবিস্তৃত ছায়া, ঝর্ণা এবং মৃদু হাওয়ার জন্য এ বাগান বিখ্যাত ছিল। এর আকার ছিল অনেকটা বৃত্তাকার। কয়েকটি ছোট নদী এর পানি-সেচের উৎস ছিল। নদীগুলি মাঝে মাঝে জল-প্রপাত সৃষ্টি করে ফুল, লতা ও গাছের মধ্যে হারিয়ে যেত। আজ সেখানে কেবল কয়েকটি বিরাট আকারের সাইপ্রেস ও মাটল গাছ বিদ্যমান।

মুসলিম-স্পেনের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বাসিন্দাদের ব্যবহারের পর উদ্বৃত থাকত। সেভিল নদীতীরস্থ এক মস্ত বন্দর ছিল। এখান হতে কার্পাস, জলপাই এবং তেল রফতানী হত এবং এখানে আমদানী হত মিসরের কাপড় ও গোলাম

এবং ইউরোপ ও এশিয়া হতে গায়িকা-বালিকা। মালাগা ও জায়েন হতে রফতানী হত জাফরান, ডুমুর, মার্বেল এবং চিনি। আলেকজান্দ্রিয়া ও কনস্টানটিনোপল মারফত, স্পেনের উৎপন্ন দ্রব্য সুদূর ভারত ও মধ্য-এশিয়ার বাজারসমূহে গিয়ে পৌঁছত। দামেস্ক, বাগদাদ এবং মক্কার সঙ্গে এর তেজারতি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। আধুনিক জগতের নৌ বিদ্যাঘটিত আন্তর্জাতিক শব্দসমূহের মধ্যে এডমিরাল, আরসেনাল, এভারেজ, ক্যাবল, শেলোপ ইত্যাদি আরবী-অদ্ভূত শব্দের অস্তিত্ব হতেই বোঝা যায়, এককালে সমুদ্রের উপর আরব জাতির প্রভুত্ব কত ব্যাপক ছিল।

সরকার রীতিমত ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা পরিচালনা করত। রাষ্ট্রের মুদ্রা প্রাচ্য আদর্শে তৈরী হত। দিনার ছিল সোনার আর দেরহেম ছিল রূপার মুদ্রা। উত্তরের খৃস্টান দেশগুলিতে আরব-মুদ্রা চালু ছিল; কারণ, প্রায় চারশ' বছর পর্যন্ত আরব ও ফরাসী মুদ্রা ছাড়া এদের নিজস্ব কোন মুদ্রা ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া রাজধানীতে একটি প্রথম শ্রেণীর কুতুবখানা ছিল। আল-হাকাম একজন গ্রন্থ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁর প্রতিনিধিরা পাণ্ডুলিপি খরিদ বা নকল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক ও বাগদাদের বইয়ের দোকান তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াত। এইরূপে সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা নাকি অবশেষে চার লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। সে বইয়ের ক্যাটালগ ছিল চুয়াল্লিশ বালাম। আর এইসব বালামের প্রত্যেকটির বিশ পাতা জুড়ে নাম ছিল কেবল কবিতার বইয়ের। মুসলিম খলীফাদের মধ্যে আল-হাকামই বোধহয় সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন। তিনি নিজে লাইব্রেরীর অনেকগুলি বই ব্যবহার করতেন এবং সে সবের মার্জিনে তিনি যে নোট লিখে রাখতেন, পরবর্তী সংগ্রাহকরা তাকে অত্যন্ত মুল্যবান মনে করত। আলইসবাহানী নামক উমাইয়াদের একজন বংশধর ইরাকে বসে 'আগানী' লিখছিলেন। এ গ্রন্থের প্রথম কপি সংগ্রহের জন্য আল-হাকাম গ্রন্থকারকে এক হাজার দিনার পাঠিয়ে দেন। এ সময় আন্দালুসীয়ায় সংস্কৃতির সাধারণ মান এত উঁচু স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সুবিখ্যাত ওলন্দাজ পণ্ডিত ডোজী মুগ্ধকণ্ঠে মন্তব্য করেন ঃ 'প্রায় প্রত্যেকেই লেখাপড়া জানত।' অথচ এ সময় খৃস্টান-ইউরোপে প্রাথমিক লেখাপড়ার সামান্য চল ছিল এবং তাও সীমাবদ্ধ ছিল পাদ্রী-পুরোহিতদের মধ্যে।

পাশ্চাত্য-জগতে আরবের অবদান

মুসলিম-স্পেনের কলেজগুলির ফটকের গায় সাধারণতঃ একটি লিপি উৎকীর্ণ দেখা যেত। সে উৎকীর্ণ লিপিটি এই ঃ 'মাত্র চারটি বস্তু পৃথিবীর ভার বহন করে ঃ বিজ্ঞের বিদ্যা, মহতের হক-বিচার, সত্যাশ্রয়ীর এবাদাত আর সাহসীর পরাক্রম।'

বিশেষ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, মুসলিম-আদর্শের এই ইউরোপীয় বর্ণনায় বিদ্যার সাধনা সকলের পুরোভাগে স্থান পেয়েছে। আরবের বাহু-বল পাশ্চাত্য জগতের মনে গভীর দাগ কাটে। তবে সে দাগ বেশী দিন টিকে নাই। কিন্তু মুসলমানদের বিদ্যা ও জ্ঞান বহুপথে পাশ্চাত্য চিন্তার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়। মধ্যযুগের জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে মুসলিম-স্পেন একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করে। আমরা আগে দেখেছি, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ—এ দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে আরবী ভাষা-ভাষীরাই পৃথিবীর সর্বত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকার প্রধান বাহক ছিল। তাদেরই মাধ্যমে প্রাচীন দর্শক ও বিজ্ঞান পুনর্জীবন ও পুষ্টি লাভ করে এবং সম্প্রসারিত হয়। আর এরই ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁর জন্মলাভ সম্ভব হয়। মুসলিম-স্পেনের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তানায়ক ছিলেন আলী-ইবনে-হাজম (৯৯৪—১০৬৪)। তিনি মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক বইয়ের লেখক এবং দুই বা তিনজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন বিদ্বানের অন্যতম ছিলেন। তাঁর জীবনী লেখকেরা বলেন, তিনি ইতিহাস, ধর্ম-বিজ্ঞান, হাদীস, তর্ক-শাস্ত্র, কবিতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ৪০০ বই লিখেন। তাঁর যেসব বই এখন পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে, ধর্মের তুলনামূলক বিচার বিষয়ক গ্রন্থ। এক্ষেত্রে তিনিই জগতে প্রথম গবেষক পণ্ডিত। এই গ্রন্থে তিনি বাইবেলের কাহিনী সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে যে উন্নত শ্রেণীর সমালোচনা উদ্ভব হয়, তাঁর আগে বাইবেলীয় কাহিনীর উক্ত অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে আর কেউ কোন শব্দ করেন নাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে উপকথা, গল্প ও নীতি কাহিনী ঘটিত যে সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে, তাতে পূর্ববর্তী আরবী গ্রন্থরাজির প্রভাব ও পরিচয় নিঃসন্দেহ রকমে বর্তমান। এসব আরবী গ্রন্থের ভিত্তি আবার অনেকাংশে ছিল ইন্দোপারসিক। কালীলা ও দিমনা'র চিত্তাকর্ষক উপকথাগুলি ক্যাস্টাইল-লিয়নের সুবিজ্ঞ এলফনসোর জন্য (১২৫২—১২৮২) স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়। কিছুকাল পর খৃস্টধর্মে দীক্ষিত একজন ইহুদী ল্যাটিনে এর অনুবাদ করেন। ফারসীতে এর যে অনুবাদ ছিল, ফরাসী ভাষা মারফত তাই 'লা ফনটেইন' গ্রন্থের অন্যতম মূল ছিল। কবি নিজে একথা স্বীকার করেছেন। 'মাকামা' ছন্দোময় গদ্যে লিখিত গ্রন্থ। এতে শব্দ-বিন্যাসের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক অলংকার রয়েছে। কোন সুন্দরীর দেহরক্ষী বীরপুরুষের দুঃসাহসী কাজের বর্ণনার মারফত এতে নৈতিক উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। 'মাকামার' সঙ্গে স্পেনীয় ভাষার বর্ণনামূলক উপন্যাসগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু আরবী ভাষা তার প্রকাশ-ভঙ্গী দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করে, ইউরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তাই তার শ্রেষ্ঠ অবদান। এ প্রভাব ইউরোপীয় সাহিত্যকে তার চিরাচরিত প্রথার নির্মম সংকীর্ণতা হতে উদ্ধার করে। স্পেনীয় সাহিত্যের ভাব-ঐশ্বর্যের মূলে আছে আরবী-সাহিত্যের আদর্শ। উদাহরণ স্বরূপ, সারভেনটিস লিখিত 'ডন কুইকজটের' পরিহাস রসের কথা বলা যায়। গ্রন্থকার একদা আলজিয়ার্সে বন্দী ছিলেন এবং তামাসা করে বলতেন যে, আরবীতে তাঁর বইয়ের একটা মূল কপি আছে। যখনই যেখানে আরবী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তখনই সেখানে কবিতা রচনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে। অসংখ্য কবিতা মুখে মুখে চলত এবং ছোট বড় সবারই প্রশংসা লাভ করত। শব্দের সৌন্দর্য ও শ্রুতি-মাধুর্যের এই যে অনিবার্য আকর্ষণ ও আনন্দ, এ আরবী ভাষাভাষীদের প্রকৃতিগত। স্পেনীয় ভাষাতেও এ বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। প্রথম উমাইয়া-শাসনকর্তা কবি ছিলেন। তাঁর পরবর্তী কতিপয় খলীফারও কবিতা রচনার সুনাম ছিল। বেশীর ভাগ খলীফার দরবারেই রাজ-কবি থাকত এবং ভ্রমণ বা যুদ্ধকালে খলীফারা কবিদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেভিল সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কবির গর্ব করত। তবে এ কবিতার মশাল অনেক আগে কর্ডোভায় প্রজ্জ্বলিত হয় এবং গ্রানাডা যতকাল মুসলিম-শক্তির অধিষ্ঠান ভূমি ছিল, ততকাল তথায় এ মশাল জ্বলতে থাকে।

ইবনে-জায়দুন (১০০৩—১০৭১) একজন প্রতিষ্ঠাবান কবি ছিলেন। এক আরব অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি প্রথমে কর্ডোভা রাজ-শক্তির বিশ্বস্ত

প্রতিনিধি ছিলেন। পরে তিনি রাজ-অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হন। জনৈক খলীফার কবি কন্যা ওয়াল্লাদার প্রতি জায়দুনের প্রবল আসক্তিই বোধহয় তাঁর পতনের কারণ ছিল। কয়েক বছর কারাগার ও নির্বাসনে থাকার পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং উজিরে আজম ও সিপাহসালারের যুক্ত পদে নিযুক্ত হন। তাঁর উপাধি হয় 'দুই ওজাতের অধিকর্তা'—কলমের ওজরত আর তলোয়ারে ওজারত। উক্ত সুন্দরী এবং প্রতিভাশালিনী ওয়াল্লাদাকে মৃত্যু ১০৮৭ অপরূপ সৌন্দর্য ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা উভয় দিক দিয়ে গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন গীতি-কবি স্যাফফো'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। কবিতা ও সাধারণ-সাহিত্য উভয়ের প্রতি স্পেনীয় আরব নারীর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল।

সনাতন রীতির আওতা হতে আংশিক মুক্তি লাভ করে স্পেনীয় আরবী কবিতা নব নব প্রকাশ-ভঙ্গী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি প্রায় আধুনিক মনোভাব গড়ে তোলে। মধ্যযুগীয় দুঃসাহসিক বীরত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গী আগেই আরবী লোক-গাথা ও প্রেম-গীতির অভিনব ভাব-লালিত্যে আত্ম-প্রকাশ করে। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সঙ্গীতই বরাবর কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করে চলত।

আরবী কবিতা সাধারণভাবে ও এর গীতি কবিতাংশ বিশেষভাবে দেশীয় খৃস্টানদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে এবং উভয় সংস্কৃতির মিলনে সাহায্য করে। ক্যাস্টাইলের লোক-প্রিয় 'ভিলানসিকো' কবিতা আরবী গীতি-কবিতা হতে গড়ে ওঠে। এ কবিতা খৃস্টানদের প্রার্থনার—বিশেষ করে বড় দিনের আনন্দ-সঙ্গীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।

অষ্টম শতাব্দীতে স্পেনীয় সাহিত্যে প্ল্যাটোনিক (নিষ্কাম) প্রেমের যে একটা বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গী বিকাশ লাভ করে, তা আরবী কবিতারই প্রভাবের ফল। দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রথম 'প্রভেনকাল' কবিদের আবির্ভাব ঘটে একাদশ শতাব্দীতে এবং তারা পুরাদস্তুর নিপূণ কাব্যকারের মত অদ্ভুত এবং অপূর্ব কল্পনা বিনাসের বিচিত্র লীলায় তাঁদের অদম্য প্রে কে রূপদান করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'ট্রাবেডুরদের' অভ্যুদয় হয় এবং তাঁরা তাদের দক্ষিণ অঞ্চলে সমসাময়িক গজল-গায়কদের অনুকরণ করেন। 'চ্যানসন-ডি-রোল্যান্ড' প্রাথমিক যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের মহত্তম কীর্তি। ১০৮০ সালের আগে রচিত এ গ্রন্থ এক নতুন সভ্যতার সূচনা করে। এই সভ্যতাই পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা। এ গ্রন্থের উদ্ভব হয় মুসলিম-স্পেনের সঙ্গে এক সামরিক সংঘর্ষের ফলে।

আমরা দেখেছি, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। আর সব মুসলিম দেশের মত এখানেও কোরআন এবং আরবী ব্যাকরণ ও কবিতার উপর প্রাথমিক

শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষিত মহলে নারীর যে ইজ্জত ছিল, তাতে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা লিখতে পারে না বলে যে প্রবাদ ছিল তা আন্দালুসিয়াতে পালিত হয় নাই। উচ্চশিক্ষার বুনিয়াদ ছিল কোরআনের তফসীর, হাদীস, ফেকা, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, অভিধান রচনা-রীতি এবং আরবী ব্যাকরণ। প্রধান শহরগুলি অনেকটিতেই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। সেসবকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। এ শহরগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কর্ডোভা, সেভির, মালাগা এবং গ্রানাডা। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম-শাস্ত্র ও আইন-শাস্ত্র ছাড়া জ্যোতিষ, গণিত এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়ানো হত। এখানে নিশ্চয়ই হাজার হাজার ছাত্র ছিল এবং এখানকার সনদের দৌলতে রাজ্যের বড় বড় চাকরী পাওয়া যেত। গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের তালিকায় ছিল ধর্ম শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র, রসায়ন, দর্শন এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র ক্যাস্টিলিয়ার এবং অন্যান্য বিদেশী ছাত্র এখানে লেখাপড়া করত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে কুতুবখানা উন্নতি লাভ করে। কর্ডোভার রাজকীয় কুতুবখানা সর্বাপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ ছিল। অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহও ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন নারীকেও দেখা যায়। রাজনৈতিক সভা ও থিয়েটার গ্রীস ও রোমের জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলিম-জগতে এ দুইয়ের একান্ত অভাব হেতু বই-ই তাদের জ্ঞানার্জনের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়।

বাগদাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, ইউরোপে কাগজ আমদানী সে মহাদেশের প্রতি ইসলামের মহত্তম অবদানসমূহের অন্যতম ছিল। আন্দালুসিয়াতে এই কাগজ উৎপন্ন হত। আর ওখানে কাগজ উৎপন্ন না হলে আন্দালুসিয়াতে এত বই স্তূপীকৃত করা সম্ভবপর হত না। কাগজ তৈরীর বিদ্যা প্রাচ্য হতে প্রথমে মরক্কোতে যায় এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে স্পেনে প্রবেশ করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি আজো ইংরেজি 'রীম' শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে। শব্দটি আসলে ছিল আরবী 'রিজমা'। স্পেনীয় ভাষায় গিয়ে শব্দটি হয় 'রেসমা।' আর স্পেন হতে ফরাসী ভাষায় গিয়ে শব্দটি হয় রেইম'। তারপর ফরাসী ভাষা হতে ইংরেজিতে 'রীম' শব্দের আকারে নব-রূপ গ্রহণ করে। সিসিলীর মুসলিম-প্রভাব ইতালীতে বিস্তৃত হয় এবং স্পষ্টতঃই সেই প্রভাবের ফলে ১২৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইতালীতে কাগজ তৈরীর শিল্প প্রবর্তিত হয়। কেউ কেউ বলেন, ক্রুসেডাররা ফিরে এসে ফ্রান্সে প্রথম কাগজের কল স্থাপন করে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। আসলে ফ্রান্স প্রথম কাগজের কলের জন্য মুসলিম-স্পেনের নিকট ঋণী। এইসব দেশ হতে কাগজ-শিল্প বাকী

ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আবদুর রহমানের এক সেক্রেটারী নিজ বাড়ীতে বসে চিঠিপত্র লিখতেন। তারপর কপি করার জন্য সেগুলি এক বিশেষ অফিসে পাঠানো হত। এ ছিল এক রকম প্রিন্টিং। এখান হতে পত্রের কপি সরকারের বিভিন্ন দফতরে বিলি হত।

স্পেনে মুসলিম-শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ার পর দুই হাজার বালামেরও কম বই রক্ষা পায় এবং সেসব বই দ্বিতীয় ফিলিপ (১৫৫৬—১৫৯৮) ও তাঁর পরবর্তীরা বিভিন্ন আরব লাইব্রেরী হতে সংগ্রহ করেন। এইসব বই দিয়েই এসকুরিয়াল লাইব্রেরী শুরু হয়। আজো সে লাইব্রেরী মাদ্রিদের অদূরে অবস্থিত আছে। এ লাইব্রেরীর সঙ্গে অন্যান্য 'বালাম' কিভাবে এসে যুক্ত হয়, তার একটা মজার কাহিনী আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মরক্কোর সুলতান রাজধানী হতে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর কুতুবখানাটি এক জাহাজে পাঠিয়ে দেন। জাহাজের ভাড়া পুরোপুরি অগ্রিম না পাওয়ায় জাহাজের কাপ্তান বইগুলি নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিতে অস্বীকার করে। মার্সাই যাওয়ার পথে জাহাজটি স্পেনীয় জলদুস্যর কবলে পড়ে। লূণ্ঠিত বইগুলি সংখ্যায় তিন হতে চার হাজার—তৃতীয় ফিলিপের হুকুম মোতাবেক এস্কুরিয়াল লাইব্রেরীতে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে এস্কুরিয়াল লাইব্রেরী আরবী পাণ্ডুলিপির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ইবনুল খতীব ও ইবনে খালদুন ছিলেন দুই বন্ধু। সাহিত্যিক পারদর্শিতা এবং ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার দিক দিয়ে এঁরা দুইজন পাশ্চাত্য-ইসলামের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ছিলেন। ইবনুল খতীব উজীর ছিলেন। কোন দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি ১৩৭১ সালে গ্রানাডা হতে পলায়ন করেন। এর তিন বছর পর ব্যক্তিগত কলহের ফলে কাছ নামক স্থানে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে গ্রানাডা—হয়তো সমস্ত স্পেনই তাঁর শেষ কৃতী সাহিত্যিক, কবি ও রাজনীতিজ্ঞকে হারায়। কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিষয়ে তিনি ৬০ খানা বই লেখেন। তার মধ্যে ২০ খানা এখনো পাওয়া যায়। এ সবের মধ্যে গ্রানাডার ইতিহাস আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বই।

ইবনে খালদুন তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মুকাদ্দামার' জন্য বিখ্যাত। মুকাদ্দামা ইতিহাসের ভূমিকা বিষয়ক বই। দেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও আবহাওয়া এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এ সমস্তই যে ইতিহাসের বিকাশ-ধারাকে প্রভাবিত করে, এ মতবাদ তিনিই প্রথম এ পুস্তকে ব্যক্ত করেন। তিনি জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অবনতির আইন খুঁজে বের করতে সাধনা করেছেন। এ হিসেবে তাঁকে ইতিহাসের প্রকৃত ক্ষেত্র ও প্রাকৃতিক আবিষ্কর্তা বলা চলে। তিনি নিজেও এ দাবী

করেছেন। অন্ততঃপক্ষে তাঁকে সমাজ-বিজ্ঞানের প্রকৃত স্থাপয়িতা বলতেই হবে। ইতিহাসের এমন ব্যাপক ও দার্শনিক ধারণা তাঁর আগে কখনো কোন আরব, এমন কি কোন ইউরোপীয়ানের কল্পনায় আসে নাই। ১৪০৬ সালে ইবনে খালদুনের মৃত্যু হয়। সমস্ত সমালোচক সমবেত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ইবনে খালদুন ইসলামের সবচেয়ে বড় এবং জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিকদের অন্যতম ছিলেন।

আরবদের ভৌগোলিক গবেষণা পাশ্চাত্যের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে নাই। তবে পৃথিবী যে গোল, তারা এ প্রাচীন ধারণাকে জিইয়ে রাখে। আমরা আগেই বলেছি, হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা পৃথিবীর যে অর্ধাংশকে জানি তার একটা মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্র আছে; চারদিক হতে এই কেন্দ্র সমদূরে অবস্থিত। ১৪১০ সালে প্রকাশিত একটি ল্যাটিন বইয়ে এই 'আরিন' মতবাদ প্রবেশ লাভ করে। এই বই হতে কলম্বাস তাঁর মতবাদ গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী আকারে নাশপতির মত এবং পূর্ব গোলার্ধের 'আরিন' -এর ঠিক উল্টা দিকে পশ্চিম গোলার্ধেও একটি 'আরিন' আছে।

গ্রহ-বিজ্ঞান ঘটিত ভূগোল ও গণিতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-জ্ঞানভাণ্ডারে কয়েকটি নতুন ধারণা দান করা হয়। দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগের পর স্পেনে দস্তুরমত গ্রহ-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন শুরু হয় এবং কর্ডোভা, সেভিল ও টলেডোর শাসনকর্তারা জ্ঞানের এ-শাখাকে যথেষ্ট প্রীতির চোখে দেখতে থাকেন। আন্দালুসীয়ার অধিকাংশ গ্রহ-বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করতেন যে, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানের বেশীর ভাগ ঘটনার উপরই গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সক্রিয়। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা হতেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এই শাস্ত্র অনুশীলনের জন্য অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার হিসেব মোতাবেক পৃথিবীর সকল স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইরূপে জ্যোতিষ-শাস্ত্র হতে গ্রহ-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। ল্যাটিন-পাশ্চাত্য স্পেনের মারফতই প্রাচ্য পণ্ডিতগণ গ্রহ-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র ঘটিত প্রেরণা লাভ করেন। স্পেনে মুসলমানদের গ্রহ-বিজ্ঞানের প্রধান বইগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দশম এলফনসো যে এলফোনসাইন নির্ঘণ্ট তৈরী করেন, তা আরব গ্রহ-বিজ্ঞানের উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আরবদের নক্ষত্র বিষয়ক গবেষণার ফলে আমরা তাদের নিকট হতে স্ফিরিকাল ও সরল ত্রিকোণমিতির প্রথম অধ্যায় পেয়েছি। কারণ, এলজাবরা ও বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির মত ত্রিকোণমিতিও অনেকাংশে আরবরা উদ্ভাবন করে। একটা সাধারণ আকাশ-গোলকে যেসব তারার নাম থাকে, তার দিকে একটু চাইলে যে কেউ বুঝতে

পারবে যে, আরব গ্রহ-বিজ্ঞানীরা আকাশের গায় তাঁদের সাধনার অমর-চিহ্ন রেখে গেছেন। ইউরোপীয় ভাষায় তারার যে সব নাম আছে, তার অধিকাংশই আরবী ভাষা হতে উদ্ভূত। যেমন—আকরাম (আকরাব—বিছা), অ্যালগেডী (আল-জোদী—ছাগল ছানা), অ্যালটেয়ার (আল-তায়ের—উড়নেওয়ালা), ডেনের (ধানব—লেজ), ফারকাড (ফারকাদ—বাছুর)। এছাড়া অনেক পরিভাষাও আরবী হতে নেওয়া হয়েছে। যথা : এজিমুথ (আস-সুমুত), নাদির (নাজির), জেনিথ (আল-সামত)। এসব থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইসলাম খৃস্টান-ইউরোপকে কি অজস্র দানই না করেছে।

আরবী হতে যেসব গণিত-ঘটিত শব্দ ধার নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নিতান্ত কৌতূহল-উদ্দীপক একটি শব্দ হচ্ছে, 'সাইফার' বা জিরো (শূন্য)। আরবরা শূন্য আবিষ্কার করে নাই বটে, কিন্তু তারা আরব-সংখ্যার সঙ্গে 'শূন্য' ইউরোপে আমদানী করে এবং ইউরোপীয়দের এর ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এরই ফলে জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে গণিতের ব্যবহার সম্ভব হয়।

অমুসলিম-ইউরোপে আরবী সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম ধীরগতিতে বিস্তৃতি লাভ করে। সমস্ত একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর কতকাংশ পর্যন্ত খৃস্টান গণিতবিদরা কোমর বেঁধে সেকেলে রোমক সংখ্যা ব্যবহার করতে থাকে; অবশ্য মাঝে মাঝে আপোষ সূত্রে তারা রোমক সংখ্যা ও নতুন আল গোরিজম পাশাপাশি ব্যবহার করত। ইটালীতেই সর্বপ্রথম এই নতুন সংখ্যা ব্যবহারিক জীবনে খাটানো শুরু হয়। পাইসার লিওনার্ডো ফিবোনাকসি মুসলিম ওস্তাদের নিকট শিক্ষালাভ করে উত্তর আফ্রিকায় পরিভ্রমণ করেন। তিনি একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বই-ই আরবী সংখ্যা প্রবর্তনে সবচেয়ে বেশী সাহায্যে করে। তারো চেয়ে বড় কথা এই যে, এই বই হতেই ইউরোপীয় গণিত শুরু হয়। পুরাতন সংখ্যার সাহায্য কোন কোন ক্ষেত্রে গণিতের অগ্রগতি অসম্ভব হত। আমরা বর্তমানে যে হিসাব-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, তার মূলে ছিল আরবী সংখ্যা ও শুণ্য।

গ্রহ-বিজ্ঞান ও গণিতের মত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও পাশ্চাত্য মুসলিমরা তাঁদের গবেষণা দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা খেজুর গাছ ও শন প্রভৃতি বৃক্ষ-লতার যৌন-পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেন। বৃক্ষ-লতাকে তাঁরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন : যথা—যে সব উদ্ভিদ কলম হতে জন্মে, যে সব বীজ হতে জন্মে আর যে সব (তাঁদের বিবেচনায়) আপনা-আপনি জন্মে। সেভিলের ইবনুল আওয়াম দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষি সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। এই বইখানি সমগ্র মুসলিম-জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তো ছিলই, উক্ত বিষয়ে

মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠতম বইসমূহেরও অন্যতম ছিল। কতকটা পূর্ববর্তী গ্রীক ও আরব গবেষণা ও কতকটা স্পেনের মুসলিম কৃষকদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এ বইয়ে ৫৮৫টি উদ্ভিদ এবং পঞ্চাশটির অধিক ফল গাছ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। গাছে কলম করা, বিভিন্ন রকম জমি ও সারের গুণাগুণ, আঙ্গুর ও অন্যান্য গাছের ব্যারামের লক্ষণ এবং সে ব্যারামের সহজ প্রতিকার ইত্যাদির উপর নতুন আলোকপাত করা হয়।

ইবনুল বায়তার স্পেনের—হয়তো সমগ্র মুসলিম-জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ও ঔষধ-মিশ্রণ বিজ্ঞানী ছিলেন। ১২৪৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লিখিত 'সহজ প্রতিকার' মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ ছিল।

স্পেনীয় আরব চিকিৎসকদের বেশীর ভাগেরই চিকিৎসা ছিল একটা অতিরিক্ত পেশা। আসল পেশা ছিল অন্যকিছু। ইবনুল খতীব আরো অনেক চিকিৎসকের মত উজীরের পদে সমাসীন ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালো মৃত্যু' ইউরোপকে উৎসন্ন করতে থাকে। খৃস্টান চিকিৎসকরা এ ব্যারামকে আল্লাহর গজব মনে করে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তখন গ্রানাডার এই মুসলিম চিকিৎসক সংক্রমণবাদের বাস্তব দিক বিশ্লেষণ করে একখানি বই লিখেন। বইখানিতে একটি সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, যথা ঃ 'কেউ কেউ বলেন, সংক্রমণবাদকে কি করে স্বীকার করতে পারি?' তাঁদের আমরা বলি ঃ 'অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য এবং নির্ভরযোগ্য দলীল সমস্তই সংক্রমণের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কাজেই আমাদের যুক্তি নির্ভুল। যখন কেউ নিজ চোখে দেখে যে, ব্যারামীর কাছে গেলেই ব্যারাম হয়, আর দূরে থাকলেই ব্যারাম হয় না এবং কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন ও কানের গয়না মারফত কি রকমে ব্যারাম ছড়িয়ে পড়ে, তখন আর সংক্রমণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ থাকে না।'

স্পেনে মুসলিম-আধিপত্যের প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য সংস্কৃতি উন্নততর স্তর হতে আন্দালুসীয়াতে প্রবাহিত হতে থাকে। স্পেনের জ্ঞানীরা বিদ্যার অন্বেষণে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং ট্রান্স অকসিয়ানা ও চীন পর্যন্ত চলে যেতেন। কিন্তু একাদশ শতাব্দী হতে শুরু করে পরবর্তী শতাব্দীসমূহে স্রোতের গতি ফিরে যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্রোত এত ফেঁপে ওঠে যে, তা ইউরোপেও গড়িয়ে পড়ে। আরব চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রচার করার কাজে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং স্পেন—বিশেষ করে টলেডো উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে। এই টলেডোতেই ক্রেমোনার জিয়ার্ড এবং মাইকেল স্কট কাজ করতেন। এইভাবে মুসলিম, খৃস্টান ও ইহুদী চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে এবং

ভবিষ্যৎ মিলনের পথ প্রশস্ত হয়। এই উপায়ে এবং কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ মারফত কতকগুলি আরবী পরিভাষা ইউরোপীয় ভাষায় প্রবেশ করে। যথা ঃ 'জুলেপ'— (আরবী জুলাব), ফারসী গুলাব—(গোলাব পানি) ঔষধ মিশ্রিত সুগন্ধ পানীয়; 'সীরাপ' (আরবী শরাব)—সরকারী ফরমূলা মোতাবেক তৈরী চিনির শরবত—অনেক সময় ঔষধ মিশ্রিত। 'সোডা'—মধ্যযুগীয় ল্যাটিনে এর মানে ছিল মাথাধরা; আর সোডানাম'-এর মানে ছিল মাথা-ধরার ঔষধ। আসলে এ শব্দের মূল আরবী হচ্ছে, 'সুদা'—মাথার তীব্র বেদনা। আরবী হতে যেসব রাসায়নিক শব্দ ল্যাটিন মারফত ইউরোপীয় ভাষায় চলে গেছে, তার মধ্যে 'অ্যালকোহল', 'এলেমবিক', 'অ্যালকালী' এবং 'অ্যানটিমনী' উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেই স্পেনীয় আরবরা মহত্তম কীর্তি অর্জন করে। গ্রীক-দর্শনকে স্পেনীয় ও প্রাচ্য দেশীয় মুসলিম মনীষীদের হাতে প্রয়োজন মোতাবেক—বিশেষ করে বিশ্বাসও যুক্তি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে রূপান্তরিত করা হয় এবং সেই রূপান্তরিত জ্ঞান পাশ্চাত্যে প্রেরিত হয়। যে দর্শন গ্রীক মনীষীর সাধনায় এবং যে একেশ্বরবাদ-মূলক তত্ত্ব হিব্রু পয়গম্বরদের সাধনার বিকাশ লাভ করে, দুনিয়ার প্রতি প্রাচীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেই ছিল শ্রেষ্ঠতম অবদান।

পশ্চিম ইউরোপে এইরূপে যে নতুন ভাবধারা প্রথম প্রবেশ করে, তা প্রধানতঃ ছিল দর্শন ও চিকিৎসা ঘটিত এবং এই ভাবধারাই 'অন্ধকার যুগের' অবসান এবং তত্ত্ব-সাধকদের যুগের আগমন সূচনা করে। ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকরা আরবদের সংস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে এবং গ্রীক জ্ঞানের নব পরিচয়ে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে অল্পকাল মধ্যে নিজেরা স্বাধীনভাবে জ্ঞান-সাধনা শুরু করেন। আজো আমরা তারই ফল ভোগ করছি।

আমরা এখানে মুসলিম স্পেনের কৃতী দার্শনিকদের মাত্র কয়েক জনের নাম করতে পারি। 'এদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন ইবনে তোফায়েল (মৃত্যু ১১৮৫)। 'হায়য়ী-ইবনে-ইয়াকজান' (জাগ্রত জনের পুত্র জীবন্ত ব্যক্তি) নামক দার্শনিক উপখ্যান তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। এ গ্রন্থের মূলকথা এই যে, মানুষের ধারণা শক্তি বাইরের কোন সহায়কের আনুকৌল্য ছাড়াও উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং সে যে সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীল, ক্রমে ক্রমে তাও সে আবিষ্কার করতে পারে। কাহিনীটি মধ্যযুগীয় সাহিত্যে একটি মনোরম এবং মৌলিক অবদান। কেউ কেউ মনে করেন যে, রবিনসন ক্রুসোর মূল উৎস এই গ্রন্থ। বইটি ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ছোট (ইয়াঙ্গার) এডওয়ার্ড পোক'ক কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। এরপর ইউরোপের অন্যান্য বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়;

যথা—১৬৭২ খৃস্টাব্দে ডাচ ভাষায়, ১৯২০ খৃস্টাব্দে রুশ ভাষায় এবং ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে স্পেনীয় ভাষায়।

সুবিখ্যাত মনীষী চিন্তানায়ক ইবনে রুশদ ১১২৬ সালে কর্ডোভা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রহ-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং আরাস্তুর ভাষ্যকার ছিলেন। পাশ্চাত্য-জগতের উপর তিনি যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন, সে হিসেবে তাকে মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক বলতে হয়। ইবনে রুশদের বড় অবদান একটি চিকিৎসা-পুস্তক। এতে তিনি বলেন যে, বসন্ত একজনকে একাধিকবার অক্রমণ করে না। তিনি রেটীনা'র কাজ নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন। ইহুদী ও খৃস্টান জগতে কিন্তু তিনি প্রধানতঃ আরাস্তুর ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মধ্যযুগের ভাষ্যকার মানে ছিল, সেই ব্যক্তি যিনি পূর্ববর্তী চিন্তাবিদের লেখাকে পটভূমি করে কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বই লিখতেন। এই নিয়ম অনুসারে ইবনে রুশদ এক সিরিজ বই লেখেন এবং তাতে তিনি আংশিকভাবে আরাস্তুর বইয়ের নাম ব্যবহার করেন এবং তাঁর লেখার ব্যাখ্যা করেন। তিনি এশিয়া বা আফ্রিকার ছিলেন যতখানি, তার চেয়ে বেশি ছিলেন ইউরোপের। পাশ্চাত্য-জগতের চোখে আরাস্তু যেমন ছিলেন 'প্রকৃত শিক্ষক,' ইবনে রুশদ তেমনি ছিলেন 'প্রকৃত ভাষ্যকার।' মধ্যযুগীয় ইউরোপের খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতদের মনে ইবনে রুশদ যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন, এমন আর কোন গ্রন্থকারই করতে পারেন নাই। ইবনে রুশদের বই প্রথমে স্পেনের গোঁড়া মুসলমানদের মনে, পরে তালমুদীদের মনে এবং সর্বশেষে খৃস্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ষোড়শ শতাব্দীর অবসান কাল পর্যন্ত চিন্তা-জগতে ইবনে রুশদের মতবাদই প্রবল থাকে। ইবনে রুশদ যুক্তিবাদী ছিলেন এবং ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট আদেশ-নিষেধ ছাড়া সব বস্তুরই স্বাধীনভাবে যুক্তির সাহায্যে বিচারের অধিকার দাবী করতেন। কিন্তু অনেকে যে মনে করে তিনি স্বাধীন চিন্তা ও কুফরের জনক এবং ধর্মের শত্রু ছিলেন, তা মোটেই সত্য নয়। প্রাথমিক মুসলিম আরাস্তুবাদীরা নিও-প্যাটোনিক ধরনের কতকগুলি বই সহ অনেকগুলি প্রক্ষেপ-দুষ্ট বইকে নির্ভাজ বলে মনে করেন। ইবনে রুশদের দর্শন সে সব বর্জন করে অকৃত্রিম ও বিজ্ঞানসম্মত আরাস্তুবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পাদ্রীদের দ্বারা আপত্তিকর অংশ বাদ দেওয়ার পর তাঁর লেখা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবইরূপে নির্বাচিত হয়। এ লেখার যত নিন্দা ও ভুল ব্যাখ্যাই থাক, তবু আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের আগ পর্যন্ত ইবনে রুশদের প্রবর্তিত চিন্তাধারাই ইউরোপীয় চিন্তা-জগতে জীবন্ত শক্তিরূপে ক্রিয়া করতে থাকে।

ইবনে রুশদের পর এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম স্থানের দাবীদার হচ্ছেন, তাঁর সমসাময়িক কর্ডোভার মনীষী ইবনে মায়মুন। ইনি মোশেহ মায়মুন বা মায়মুনাইডিস বলেও বিখ্যাত। সমস্ত আরবীয় অগ্রগতির যুগের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ইহুদী চিকিৎসক ও দার্শনিক ছিলেন। ১১৩৫ সালে ইনি কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর পরিবার ১১৬৫ সালে কায়রোতে চলে যায়। কেউ কেউ বলেন যে, স্পেনে ইবনে মায়মুন প্রকাশ্যে নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতেন; কিন্তু নিজ গৃহে গোপনে ইহুদী ধর্ম পালন করতেন। ইদানীং গবেষকরা সকলে এ মত সমর্থন করতে পারেন নাই। কায়রোতে তিনি বিশ্ববিশ্রুত সালাহউদ্দীন ও তাঁর পুত্রের সরকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১১৭৭ সাল হতে তিনি কায়রোর ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। এইখানে ১২০৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ওসিয়ৎ মোতাবেক যে পথে একদা হযরত মুসা চলেছিলেন, সেই পথে তাঁর লাশ হাতে বহন করে টাইবেরিয়াসে সমাহিত করা হয়। আজো সেখানে তাঁর অনাড়ম্বর সমাধির পাশে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সমবেত হয়ে থাকে। কায়রোতে রাব্বী মোশে-বেন-মায়মুনের যে গীর্জা (সিনাগগ্) আছে, আর সংলগ্ন ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে দূর দূরান্তর হতে দরিদ্র ইহুদী বিমারীরা এসে ভিড় করে এবং তথায় রাত্রি যাপন করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। ইহুদী সমাজে যে তিনি কত বড় শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে আসছেন, তা সে সমাজে প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটিতেই বোঝা যায় ঃ 'মুসা হতে মুসা পর্যন্ত মুসার মত কেউ ছিল না?'

ইবনে মায়মুন গ্রহ-বিজ্ঞানী, ধর্ম-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং সর্বোপরি দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ত্বক-ছেদন পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন, কোষ্ঠ কাঠিন্যকে হেমোরাইডস ব্যারামের কারণ বলে রায় দেন এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নত ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থের নাম 'দালালাতুল হায়রিন' (বিভ্রান্তদের পথ-প্রদর্শক)। এ পুস্তকে তিনি ইহুদী ধর্ম-শাস্ত্রের সঙ্গে মুসলিম আরাস্তুবাদ অথবা ব্যাপক অর্থে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। এইদিক হতে অন্ততঃ তিনি বাইবেলের স্বতঃসিদ্ধবাদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাহসী সমর্থক ছিলেন। ফলে তিনি গোঁড়া শাস্ত্রবিদদের রোষ-ভাজন হন। এরা তাঁর বইয়ের নাম দেয়, 'দালালাহ'-(গোমরাহকরণ)। স্বাধীনভাবে গবেষণা করলেও তাঁর দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ইবনে রুশদের মতবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইবনে রুশদের মত তিনিও গ্রীক ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে আরবী অনুবাদের উপর নির্ভর করতেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি অনু-মতবাদ (আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা) আর নিও-প্ল্যাটোনিক ও আরাস্তুর দার্শনিক মতবাদ। একটি ছাড়া ইবনে মায়মুনের সব বই

আরবী ভাষায় লিখিত হয় এবং শীঘ্রই সে সব বই হিব্রুতে ও পরে আংশিকভাবে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। তাঁর মতবাদের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থাবলীই ইহুদী চিন্তাকে জেনটাইলদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রধান মাধ্যম ছিল। আধুনিক সমালোচকেরা তাঁর প্রভাবের পরিচয় বহু জনের মধ্যে দেখতে পান : যেমন— ডমিনিকান, ডান স্কোটাস, স্পিনোজা, এমন কি ক্যান্ট। এ যুগের মরমীবাদীদের মধ্যে ইবনে আরাবী প্রধান ছিলেন। সমগ্র ইসলামী সুফী-জগতে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী চিন্তাবিদ ছিলেন। ইবনে আরবী সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৪০ সালে দামেস্কে তাঁর মৃত্যু হয়। আজো তাঁর মাজার তথায় বিদ্যমান। তাঁর একখানা বইয়ে তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) নৈশ ভ্রমণ ও আসমানে যাওয়ার কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেন। এতে দান্তের মহাকাব্যের পূর্বাভাব মিলে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আরব-বিজ্ঞান ও দর্শনের ইউরোপ গমন সমাপ্ত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই স্রোত টলেডো হতে পিরেনীজ পর্বতের আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে প্রোভেন্স এবং আল্পসের গিরি-পথে লোরেইন, জার্মানী এবং মধ্য-ইউরোপে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখান হতে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে হাজির হয়। ফ্রান্সে মার্সাই, তুলো, নারবোঁন এবং মন্টপেলিয়ার আরব চিন্তার কেন্দ্রস্থল ছিল। পূর্ব ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লুনিতে একটি বিখ্যাত মঠ ছিল; এই মঠে কয়েকজন স্পেনীয় পাদ্রী ছিলেন। ফলে দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্থান আরব-জ্ঞান প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার পিটার ভেনারেবল নামক মঠাধ্যক্ষ ১১৪১ সালে অন্যান্য বহু পুস্তিকা ছাড়া কোরানের প্রথম ল্যাটিন অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এসব ইসলামের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে লোরেইন বা লোথারিনজীয়াতে আরবী-বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করে। তার ফলে পরবর্তী দুই শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান বৈজ্ঞানিক প্রভাবের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়। লোথারিনজীয়ার শহরগুলির মধ্যে লীজ, গোরজ এবং কোলন আরবী জ্ঞানের অঙ্কুর উদগমের জন্য একান্ত উর্বর-ভূমি ছিল। লোরেইন হতে এ জ্ঞানের আলোক জার্মানীর চারদিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং লোরেইনবাসী বা লোরেইনে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক দ্বারা নর্মান যুগের ইংল্যান্ডে নীত হয়।

এভাবে স্পেনীয় আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আর এর মাধ্যম হিসেবে স্পেনের ব্রতও সাধিত হয়।

ক্রুস হেলালকে উৎখাত করে

যে অত্যদ্ভূত দ্রুতগতিতে আরবের মরু সন্তানেরা হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যে তৎকালীন সভ্য-জগতের অধিকাংশ জয় করে ফেলে, তার সঙ্গে সঙ্গে তুলনীয় যদি কিছু থাকে, তবে তা হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পর তৃতীয় শতকের মধ্য হতে চতুর্থ শতকের মধ্য পর্যন্ত কালের ভিতর আরব-আধিপত্যের দ্রুত অধঃতন। ৮২০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময় বাগদাদের খলীফার একক হাতে যে প্রভুত্ব-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, তা অন্য কোন জীবিত লোকের হাতে ছিল না। ৯২০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সেই ক্ষমতা তাঁর পরবর্তীদের হাতে এত খর্ব হয়ে পড়ে যে, তাঁর নিজ রাজধানীতেও সে ক্ষমতা বিশেষ অনুভূত হত না। ১২৫৮ সালে বাগদাদ শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ শহরের সঙ্গে আবার প্রভুত্বও চিরবিদায় গ্রহণ করে এবং সত্যিকার খিলাফতের ইতিহাস খতম হয়ে যায়।

বাইরের কারণের মধ্যে মঙ্গোল বা তাতারদের মত বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণ জাঁকজমকপূর্ণ হলেও আসলে তা ছিল আরবজাতির শেষ পতনের অন্যতম কারণ। খিলাফতের কেন্দ্রভূমি ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে যে অসংখ্য বংশ ও উপবংশের উত্থান হয়, তাতে রোগের লক্ষণই প্রকাশ পায়; ও গুলিকে রোগের কারণ বলা চলে না। পাশ্চাত্যের রোমক সাম্রাজ্যের মত, রুগ্ন মানুষটি ইতিপূর্বেই তার শেষ শয্যায় শায়িত ছিল—এমন সময় চোর এসে দুয়ার ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এবং তার রাজকীয় উত্তরাধিকারের ভাগ কেড়ে নিয়ে সরে পড়ে।

খিলাফত খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। প্রথম যুগের অনেকগুলি বিজয় কেবল নামে বিজয় ছিল। তাছাড়া, শাসন-পদ্ধতি স্থায়িত্বের অনুকূলে ছিল না। প্রায় সর্বত্রই শোষণ ও অতিরিক্ত কর-ভারে প্রজাপুঞ্জ পীড়িত ছিল। আরব-অনারব, আরব-মুসলমান, অনারব-মুসলমান, মুসলমান-জিম্মী—এদের মধ্যে বিভেদ রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। স্বয়ং আরবদের মধ্যেই উত্তর-আরব আর দক্ষিণ-আরবের মধ্যকার প্রাচীন রেষারেষি তেমনি তীব্রভাবে বিদ্যমান ছিল। ইরানের পারসিকতরা, তুবাণের তুর্করা আর হেমিটিক বার্বাররা সেমিটিক আরবদের সঙ্গে কখনো এক অভিন্ন জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। কোনো

আত্মবোধই এই বিভিন্ন জন-সংঘকে একত্রে বেঁধে রাখতে পারে নাই। ইরানের সন্তানেরা কখনো তাদের জাতির অতীত গৌরব-মহিমা ভুলতে পারে নাই এবং কখনো এ নতুন শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আপনভাবে গ্রহণ করে নাই। সিরিয়ার লোকেরা বহুকাল পর্যন্ত আশান্বিত চোখে চেয়ে ছিল যে, তাদের কোন নেতা আবির্ভূত হয়ে আব্বাসীয়দের অধীনতার বন্ধন হতে তাদের মুক্ত করবে। বার্বাররা সুযোগ মিললে যে কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দিত এবং অস্পষ্টভাবে হলেও এর থেকে বুঝতে বাকী থাকত না যে, তারা তাদের কওমী দৃষ্টি-ভঙ্গী বা আরবদের সঙ্গে তাদের বিভিন্নতা কিছুতেই ভোলে নাই। রাজনীতি ও সমর ক্ষেত্রে যেমন—ধর্মেও তেমনি বিভেদ রেখা ফুটে ওঠে এবং তার ফলে অদ্ভূত হয় শীয়া, কারমাতী, ইসমাইলী, খারেজী ইত্যাদি মাযহাব। এইসব সম্প্রদায়ের কতকগুলি ধর্মীয় দল ছাড়া আরো কিছু ছিল। সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্ত কতকগুলো ধর্মীয় দল ছাড়া আরো কিছু ছিল। সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্ত কারমাতীদের আঘাতে টলে ওঠে; ফাতেমীরা অনতিকাল মধ্যে পশ্চিম ভাগ অধিকার করে নেয়। খিলাফত যেমন ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহকে মিলিয়ে এক স্থায়ী অখণ্ডরাজ্য গড়ে তুলতে পারে নাই, ইসলামও তেমনি তার বিভিন্ন অনুবর্তীদের এক অখণ্ডজাতির বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারল না।

এরপর সামাজিক ও নৈতিক প্রভাবও সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের অনুকূল ছিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বিজেতা জাতিসমূহের রক্ত বিজিতদের রক্তের সঙ্গে মিশে পাতলা হয়ে পড়ে; ফলে বিজেতারা তাদের বিশিষ্ট গুণ ও আধিপত্যের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আরব জাতীয়-জীবনের পতনের সঙ্গে আরবদের সহন-শক্তি ও মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য বিজিতদের সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। শাহীমঞ্জিলে হেরেম ও তার সংশ্লিষ্ট অসংখ্য খোজা, বালক-বালিকা গোলাম-বাঁদী, গিলমান (এসব নারী-পুরুষ উভয়কে পতনের শেষ পর্যায়ে নিয়ে পৌছায়), অগণ্য উপপত্নী ও সতেলা ভাইবোন, তাদের হিংসা ও ষড়যন্ত্র, মদ ও সঙ্গীত-প্রধান বিলাসময় জীবন—এই সমস্ত এবং অনুরূপ অন্যান্য শক্তি মিলে পারিবারিক জীবনের প্রাণ-শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অন্তহীন কলহ দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অবস্থা আরো অনিশ্চিত করে তোলে।

অর্থনৈতিক অবস্থাও সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে প্রতিকূল ছিল। কর বসানো ও আঞ্চলিক শাসন শাসক-শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হওয়ায় কৃষি ও শিল্প পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে না। শাসকরা যে পরিমাণে ধনী হয়ে ওঠে, জনসাধারণ সেই পরিমাণেই গরীব হয়ে পড়ে। জমিদারীর অধীনে উপ-জমিদারীর সৃষ্টি হয় এবং শেষোক্ত প্রথার মালিকরা প্রজা-সাধারণকে লুট করে খেত। ঘন ঘন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ফলে লোক-সংখ্যা কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত-খামার

অনাবাদী পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে মেসোপটেমিয়ার নিম্ন অঞ্চলে বন্যা ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু করতঃ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দুর্ভিক্ষ, বহু এলাকা প্লেগ, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যারামের মড়কে উজাড়-প্রায় হয়ে যেত। আরব ইতিহাসে বিজয়ের প্রথম চার শতাব্দীতে চল্লিশটি ব্যাপক মড়কের বিবরণ পাওয়া যায়। যে সব কারণে প্রাচ্যে এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে মুসলিম-শক্তি ভেঙ্গে পড়ে, মোটামুটি তদ্রূপ কারণেই স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে মুসলিম-শক্তির পতন ঘটে। তফাতের মধ্যে এই ছিল যে, এখানে মঙ্গোলদের বদলে খৃষ্টানরা মৃত্যুবাণ হানে।

১০৩১ সালে কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফতের পতন হয়। এর ধ্বংসস্তূপ হতে ছোট ছোট এক ঝাঁক রাজ্যের উদ্ভব হয়। এসব রাজ্য ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি করে নিজেদের শক্তি-ক্ষয় করে। বিশটি শহর ও অঞ্চলে এমন বিশটি রাজ্যের উত্থান হয়। গ্রানাডার পরই সেভিলের ছিল গৌরবময় স্থান। কিন্তু শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সেভিল এক নতুন উদীয়মান শক্তির হাতে পড়ে। এ শক্তি ছিল, মরক্কো হতে আগত এক বার্বার বংশ। এমনিভাবে স্পেনে বার্বার প্রভুত্বের সূচনা হয়।

এ বার্বার বংশের নাম ছিল আল-মোরাভাইড। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন উভয়ই এদের আয়ত্তে ছিল। বংশের নামটি ছিল এক আরবী শব্দের অপভ্রংশ—মানে 'যোদ্ধা-দরবেশ দল।' এরা প্রথমে এক সামরিক ভ্রাতৃসংঘ ছিল এবং সে সব কওমের পুরুষেরা চোখের নীচে মুখমণ্ডলের বাকী অংশ পরদায় ঢেকে রাখতো, এরা তাদের মধ্য হতে লোক সংগ্রহ করত। তাদের বংশধর 'তুয়ারেগ' কওম এখনো অমন পরদা পরে। এই জন্য এদের অন্য নাম হয় 'পরদা পরনেওয়ালা।' আল-মোরাভাইডদের পর আরো একটি বার্বার বংশের অভ্যুদয় হয়। আরব বংশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, গ্রানাডার নাসরিদ বংশ। এই বংশেরই মুহম্মদ আল-গালিব বিশ্ব-বিখ্যাত আলহামরা নির্মাণ করেন।

মুসলিম-শক্তির পতনকালে প্রাচ্য বা পাশ্চত্য জগতে যে সব ছোট ছোট রাজ্যের উত্থান-পতন হয়, তাদের ইতিহাস নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না। তবে সে কাহিনীর একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের থাকা দরকার। বিশেষ করে ইউরোপে মুসলিম-শক্তির শেষ দিকের ঘটনাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যখন তারা পরস্পরকে ধ্বংস করতে ভীষণভাবে লিপ্ত, তখনো তারা তাদের সংস্কৃতির বিস্তার-সাধনের কথা ভোলে নাই। কোন মানুষের পক্ষে তার জ্ঞান ও শিল্পকে অপরের মধ্যে প্রসারিত করার যে শক্তি, তা-ই তার সভ্যতার গৌরব ও বেঁচে থাকার ক্ষমতার পরিচায়ক।

একাদশ শতাব্দীতে যখন উমাইয়া খেলাফতের পতন হয়, তখনই খৃস্টান-শক্তি কর্তৃক স্পেনের পুনর্জয়ের যুগ শুরু হয়। ৭১৮ সালে কোভাডোঙ্গার লড়াইয়ে অস্টুরিয়ান নেতা পিলায়ো মুসলিম অগ্রগমন রোধ করেন। স্পেনীয় ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধ-জয়কেই স্পেন পুনর্জয়ের আরম্ভ মনে করে থাকেন। যদি মুসলমানরা অষ্টম শতাব্দীতে পর্বতাকীর্ণ উত্তর অঞ্চলের খৃস্টান-শক্তির শেষ দীপ নিভিয়ে দিত, তবে স্পেনের পরবর্তী ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদাভাবে লিখিত হতে পারত। উত্তরের খৃস্টান দলপতিদের মধ্যে প্রথম ভয়ঙ্কর আত্মকলহ থাকায় পুনর্জয়ের কাজে বাধা সৃষ্টি হতে থাকে; কিন্তু ১২৩০ খৃস্টাব্দে কেস্টাইল ও লিয়ন সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মুসলিম শক্তির পতন দ্রুত গতিতে চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্রানাডা ছাড়া পুনর্জয় কার্যতঃ শেষ হয়ে যায়। ১০৮৫ সালে টলেডোর, ১২৩৬ সালে কর্ডোভার এবং ১২৪৮ সালে সেভিলের পতন হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর দুটি বড় কাজ শুরু হয় ঃ স্পেনকে খৃস্টানীকরণ ও তার ঐক্য বিধান। এককালে, স্পেনের যে অংশে সেমিটিক ও কার্থেজেনীয় সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটেছিল, কেবল সেই অংশে ইসলাম শিকড় গাড়ে। সিসিলীতেও ঐ ব্যাপারই ঘটে। এ ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীনকালে পিউনিক ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার মধ্যে যে পর্যায়ের বিভেদ ছিল, ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের মধ্যের বিভেদ মোটামুটি সেই পর্যায়ে বরাবরই বিদ্যমান ছিল। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বহু মুসলমান বিজিত হয়ে বা সন্ধি-সূত্রে খৃস্টান শাসনাধীনে চলে যায়; কিন্তু তারা অন্যান্য ব্যাপারে তাদের আইন ও ধর্ম রক্ষা করে চলতে থাকে। এইসব মুসলমানকে বলা হত 'মুদেজার।' 'পোষ মানা' অর্থবোধক একটি আরবী শব্দ হতে এই শব্দটি উদ্ভূত। বহু মুদেজার এই সময় আরবী ভুলে গিয়ে কেবল রোমান্স ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে এবং খৃস্টানদের সঙ্গে অনেকটা এক হয়ে যায়।

স্পেনে অবশেষে ঐক্য-সাধনার কাজ ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে চলতে থাকে। এই সময় খৃস্টান আধিপত্য কেস্টাইল ও আরাগন রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৪৬৯ খৃস্টাব্দে আরাগনের ফার্ডিন্যান্ড ও কেস্টাইলের ইসাবেলার মধ্যে বিয়ে হয় এবং উভয় রাজ্য চিরতরে এক হয়ে যায়। এই মিলন মুসলিম-স্পেনের ধ্বংসের পথ অবারিত করে দেয়। এই ক্রমবর্ধমান বিপদের সম্মুখীন হওয়া নাসরিদ বংশের সাধ্যাতীত ছিল। এ বংশের শেষ সুলতান এক রক্তক্ষয়ী আত্মকলহে লিপ্ত হন এবং তাঁর অবস্থা আরো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ১২৩২ হতে ১৪৯২ পর্যন্ত যে একুশজন সুলতান রাজত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে ছয়জন দুইবার এবং একজন তিনবার রাজত্ব করেন। যে সময় আমেরিকার ইতিহাসের সূচনা, ঠিক সেই ১৪৯২ সালে এক দীর্ঘ অবরোধের পর খৃস্টান সৈন্যদের হাতে গ্রানাডার পতন

ঘটে—'ক্রুস হেলালকে উৎখাত করে।' উদার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা আত্ম-সমর্পণের শর্ত পালন করলেন না।

১৪৯৯ সালে রানী ইসাবেলার ধর্মগুরু কার্ডিনাল জিমেনেজ-ডি-সিসনারো'র নেতৃত্বে জোর করে ধর্মান্তর কর গ্রহণের অভিযান শুরু হয়। কার্ডিনাল প্রথম চেষ্টা করেন ইসলাম বিষয়ক সমস্ত আরবী বই পুড়িয়ে ফেলতে। গ্রানাডার আরবী পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর উৎসব শুরু হয়। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিধর্মী-উচ্ছেদ আদালত (ইনকুইজিশন)! এর কাজ জোরে-শোরে চলতে থাকে। গ্রানাডার পতনের পর যেসব মুসলমান স্পেনে রয়ে যায়, তাদের সবাইকে এখন থেকে বলা হয়, 'মরিসকো' (স্পেনীয় ভাষায় এর মানে ছোট মু'র)। রোমকরা পশ্চিম-আফ্রিকাকে বলত, 'ম'রেটানিয়া আর বাসিন্দাদের বলত 'ম-রী' (মনে হয়, আসলে ফিনিশীয় শব্দ—মানে 'পাশ্চাত্য')। এই ম'রী হতে স্পেনীয় মোরো এবং ইংরেজি মুর শব্দের উৎপত্তি। বার্বাররাই প্রকৃত মুর ছিল। কিন্তু স্পেন ও উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত মুসলমানকেই মুর বলা হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পাঁচ লাখ মুসলমান আছে; এদের বলা হয়, মোরো। মেগেলান কর্তৃক ১৫২১ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হওয়ার পর স্পেনীয়রা তথাকার মুসলমানদের এ নাম দেয়।

মুসলিম স্পেনীয়রা একটি রোমান্স উপভাষায় কথা বলত। কিন্তু ব্যবহার করত আরবী হরফ। বেশীর ভাগের না হলেও অনেক মরিসকোরই পূর্বপুরুষ স্পেনীয় ছিল। কিন্তু এখন সবাইকে 'মনে করিয়ে' দেওয়া হয় যে, তাদের পূর্বপুরুষরা খৃস্টান ছিল; কাজেই তাদের হয় আবার খৃস্টান হতে হবে, নইলে তার ফল ভোগ করত হবে। মুদেজারদের মরিসকোদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এদের অনেকে প্রকাশ্যে খৃস্টান ধর্ম স্বীকার করত; কিন্তু গোপনে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। কেউ কেউ খৃস্টানী মতে বিয়ে করে বাড়ী এসে গোপনে ইসলামী মতে ফের বিয়ে করত। অনেকে বাইরে খৃস্টানী নাম রাখত—আর বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য আরবী নাম রাখত। ১৫০১ সালে কেস্টাইলে এক রাজকীয় আদেশে ঘোষণা করা হয় যে, কেস্টাইল আর লিয়নের সব মুসলমানকে হয় খৃস্টান হতে হবে, না হয় স্পেন ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে মনে হয়, এ ঘোষণা অনুযায়ী যথাযথ কাজ হয় নাই। ১৫২৬ সালে আরাগনের মুসলমানদের উপর ঐ একই আদেশ জারী হয়। ১৫৫৬ সালে দ্বিতীয় ফিলিপ এক আইন জারী করেন যে, বাকী মুসলমানদের অনতিবিলম্বে তাদের ভাষা, নামাজ-রোজা, অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং জীবনযাত্রা প্রণালী ত্যাগ করতে হবে। তিনি এমন আদেশ দিয়ে বসেন যে, স্পেনীয় গোসলখানাগুলিও

বিধর্মীদের চিহ্ন; কাজেই সেগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। গ্রানাডা-অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় (এই দ্বিতীয় বার) এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে। তবে সে বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৬০৯ সালে তৃতীয় ফিলিপ মুসলিম-বিতাড়নের শেষ হুকুম-নামায় দস্তখত করেন। এর ফলে স্পেনের সমস্ত মুসলমানকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। কথিত আছে, প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান আফ্রিকা বা অন্য কোন মুসলিম দেশে যাওয়ার জন্য জাহাজে উঠতে বাধ্য হয়। প্রধানতঃ এই মরিসকোদের মধ্য হতেই পরে পয়দা হয় মরক্কোর জল-দস্যুদল। হিসেবে দেখা যায় যে, গ্রানাডার পতন ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমান হয় নির্বাসিত, না হয় নিহত হয়। স্পেনের মুর-সমস্যার এইভাবে চিরসমাধান ঘটে। আরবী-সভ্যতা যেখানে একবার শিকড় গেড়েছে, সেখানেই চিরস্থায়ী হয়েছে—স্পেন এই সাধারণ নিয়মের স্পষ্ট ব্যতিক্রম। 'মুররা নির্বাসিত হল। খৃষ্টান-স্পেনকে ধার-করা আলো নিয়ে কিছুকাল চাঁদের মত উজ্জ্বল প্রতীয়মান হল। তারপর নেমে এল অন্ধকার। সেই হতে স্পেন অন্ধকারে ঘুরে মরছে।'

স্পেনে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য-শিল্পের সমস্ত কীর্তি ধ্বংস পেয়েছে। একমাত্র টিকে আছে কর্ডোভার মহান মসজিদ। ৭৮৬ সালে একটি পুরোনো গীর্জার অবস্থান-ভূমিতে এ মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। গীর্জায় আগে এখানে ছিল একটি রোমক মন্দির। চতুষ্কোণ মিনার সম্বলিত এর প্রধান অংশের কাজ ৭৯৩ সালে শেষ হয়। মিনারগুলি আফ্রিকার ভাস্কর্য-রীতি মোতাবেক নির্মিত হয়। আফ্রিকান রীতির মূল ছিল সিরীয়-রীতি। [illegible]টি স্তম্ভ এর ছাদ ধারণ করত। গীর্জার ঘণ্টা দিয়ে তৈরী পিতলের বাতি মসজিদের আলো দিত। 'একটি বাতির ঝাড়ে এক হাজার আলো জ্বলত; সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ঝাড়েও জ্বলত বারোটি।' সিরিয়ার উমাইয়া মসজিদ নির্মাণে যেমন বাইজেন্টাইন রাজমিস্ত্রী মোতায়েন করা হয়, এখানেও তেমনি তারা নিযুক্ত হয়। এর স্থাপয়িতা গথদের নিকট হতে লুণ্ঠিত ৮০ হাজার দিনার মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করেন। ১০০০ সাল পর্যন্ত মুসলমানেরা এর মেরামত ও সম্প্রসারণ করেন। আজ এ মসজিদ একটি গীর্জা।

ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষ স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে সেভিলের আলকাজার (আরবী শব্দ) এবং গ্রানাডার আলহামরার ধ্বংসাবশেষ অপূর্ব সুন্দর। এর কারু-সজ্জা ছিল বহাল—কিন্তু বিচিত্র ও রমনীয়। সেভিলের আল-কাজারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ টলেডোর একজন স্থপতি ১১৯৯—১২০০ সালে জনৈক আল-মোয়াহেদী গভর্নরের জন্য তৈরী করেন।

মুসলিম স্পেনে আল-মোরাভাইডদের পর আল-মোয়াহেদীরা দ্বিতীয় বার্বার শাসক বংশ ছিল। আরবীতে একেশ্বরবাদী অর্থবোধক একটি শব্দ হতে এদের ঐ নাম হয়। নিষ্ঠুর রাজা পিটারের জন্য ১৩৫৩ সালে মুদেজার স্থপতিরা মুসলিম স্টাইলে আল-কাজার পুননির্মাণ করে। কিছুদিন আগেও এ ইমারত রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হত। কর্ডোভা, টলেডো ও অন্যান্য বহু স্পেনীয় শহরে আল-কাজার ছিল; তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল সেভিলের আল-কাজার এবং একমাত্র এই প্রাসাদটিই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। টলেডোর আল-কাজারটি শেষ গৃহযুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আল-হামরা প্রাসাদে হিস্পানো-মুসলিম রূপসজ্জার চরম উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রানাডার এই অ্যাক্রপলিসটি বিরাট আকারে নির্মিত এবং মোজাইক ও উৎকীর্ণ বচনে ব্যাপকভাবে সজ্জিত হয়। জনৈক নাসরিদ সুলতান ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে এর পত্তন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

পাশ্চাত্য মুসলিম স্থাপত্যে ঘোড়ার নালের আকারের খিলান এই স্থাপত্যের স্বাভাবিক লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য নিকট প্রাচ্যে ইসলামের আগেও এ স্থাপত্য রীতির চল ছিল। ঘোড়ার গোলাকার নাল আকারে এ রীতি দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত রীতি স্পেনে 'মুরীশ খিলান' নামে পরিচিত হয়। আরব বিজয়ের আগেও স্পেনে এ রীতি নিঃসন্দেহ রকমে বিদ্যমান ছিল; তবে স্পেনীয়—বিশেষ করে কর্ডোভার মুসলমানরা এর গঠন ও আলংকারিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচলন করে। আরব অধ্যুষিত কর্ডোভার স্থপতিরা ইউরোপের ভাণ্ডারে আরো কতিপয় মৌলিক দান করে। স্থাপত্য বিদ্যার এইসব নব নব বৈশিষ্ট্য মোজারাবদের দ্বারা কর্ডোভা হতে টলেডো এবং উপদ্বীপের উত্তর অঞ্চলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নীত হয়। এখানে মুসলিম ও খৃষ্টান রীতির মিলন হতে এক নব রীতি জন্মলাভ করে। ঘোড়ার নাল আকারে খিলান ও খিলান করা ছাদ এই রীতির প্রায় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল। মুদেজার মিস্ত্রীদের হাতে এই রীতি যথেষ্ট উন্নত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে স্পেনের জাতীয় রীতি হিসেবে গণ্য হয়।

গ্রানাডার পতনের বহুকাল পর পর্যন্ত মুরীয় নর্তক ও গায়কগণ স্পেন ও পর্তুগালের জনসাধারণকে আনন্দ বিতরণ করে। রাইবেরার ইদানিং যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, কেবল স্পেনের নয়—সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দী ও তার পরের সাধারণ সঙ্গীত, সে অঞ্চলের গীতি-কবিতা ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত আন্দালুসীয়া হতে উদ্ভূত এবং তার আগে

তা আরবী মারফত পারসিক, বাইজেন্টাইন ও গ্রীক মূল হতে আসে। দর্শন, গণিত ও চিকিৎসা-শাস্ত্র যেমন গ্রীস ও রোম হতে যায় বাইজেনটিয়াম, পারস্য এবং বাগদাদে—আবার বাগদাদ হতে যায় স্পেনে এবং স্পেন হতে যায় সমস্ত ইউরোপে, তেমনিভাবে সঙ্গীতের তত্ত্ব ও অনুশীলন সম্পর্কিত কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে।

স্পেন বাদেও ইউরোপের মধ্যে একমাত্র সিসিলীতে মুসলমানরা শক্তভাবে আসন গেড়ে বসে। ৬৫২ সাল হতে সিসিলীতে মাঝে মাঝে আক্রমণ চলতে থাকে। ৮২৭ সালে এর বিজয় শেষ হয়। এরপর ১৮৯ বছর পর্যন্ত দুর্দান্ত আরব আমীরদের অধীনে সিসিলী আংশিক বা ষোল আনা রকমে আরব জগতের একটি প্রদেশ হয়ে থাকে। এর রাজধানী ছিল পালারমো।

উত্তর অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা ও অস্থায়ী বিজয়ের যেমন স্পেন ঘাঁটি বিশেষ ছিল—ইটালী সম্পর্কে সিসিলীয় তেমনি ঘাঁটি ছিল। আমীর দ্বিতীয় ইব্রাহীম তিউনিসিয়া হতে আগত আগলাবী ছিলেন। তিনি সিসিলীও শাসন করতেন। ৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি জেহাদ করতে করতে প্রণালী পার হয়ে 'ইটালীর পায়ের আঙ্গুল' কেলাবরিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। ইনিই কিন্তু প্রথম আরব আক্রমণকারী ছিলেন না। পালারমো অধিকার করার অল্পকাল পরেই উত্তর আফ্রিকার অন্য আগলাবী সেনাপতিরা দক্ষিণ ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বী লম্বার্ডদের কলহে হস্তক্ষেপ করে। তখনো ইটালীর গোড়ালী ও পায়ের আঙ্গুল বাইজেন্টাইনদের অধীনে। ৮৩৮ সালে যখন নেপলস আরব সাহায্যের জন্য আবেদন করে, তখন আরবদের যুদ্ধধ্বনি ভিসুভিয়াসের প্রান্তভূমি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। এর প্রায় চার বছর পর আদ্রিয়াতিকের তীরে অবস্থিত বারী মুসলমানরা অধিকার করে বসে। এরপর প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত এই বারী ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। প্রায় এই সময়ই বিজয়ী মুসলমানরা ভেনিসের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। ৮৪৬ সালে একদল আরব সৈন্য রোম আক্রমণে উদ্যত হয়। ওসটীয়াতে এই সৈন্যদল অবতরণ করে এবং রোমের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়ে ভ্যাটিকানের পার্শ্ববর্তী সেন্টপিটার গীর্জা ও প্রাচীরের বাইরের সেন্টপল গীর্জা পুড়িয়ে দেয়। তিন বছর পর একটি মুসলিম নৌ-বাহিনী ওসটীয়াতে পৌছে; কিন্তু ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ও ইটালীর নৌ-বাহিনীর প্রতিরোধের সামনে বিধ্বস্ত হয়। র‍্যাফেলের একটি চিত্রে এই নৌ-যুদ্ধ ও রোমের বিস্ময়করভাবে উদ্ধারের কাহিনী রঙের ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু ইটালীর উপর মুসলমানদের প্রভাব এমনি অপ্রতিহত হয় যে, পোপ অষ্টম জন (৮৭২—৮৮২) দুই বছর পর্যন্ত তাদের কর দেওয়া সমীচীন বোধ করেন।

আগলাবীরা ইটালীর উপকূলে অভিযান করেই ক্ষান্ত হয় নাই। ৮৬৯ সালে তারা মালটা দখল করে। দশম শতাব্দীতে ইটালী ও স্পেন হতে আল্পস পর্বতের ভিতর দিয়ে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত লুণ্ঠন চলতে থাকে। আল্পাস পর্বতমালায় কতকগুলি দুর্গ ও দেয়াল আছে; পর্যটকদের পথনির্দেশ পুস্তকে বর্ণিত তথ্য (টুরিস্টস গাইড) অনুসারে এগুলি আরব আক্রমণের ফল। সুইজারল্যান্ডের 'গ্যাবী', 'আলগ্যাবী' প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের নাম বোধহয় আরবী হতে উদ্ভূত।

৮৭১ সালে খৃস্টানদের দ্বারা বারী'র পুনর্দখল মুসলমানগণ কর্তৃক ইটালী ও মধ্য ইউরোপে আক্রমণ আশঙ্কার সমাপ্তির সূচনা করে। বারীতে সেনাপতিরা এতদূর যায় যে, তারা পালারমোর আমীরের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করে। ৮৮০ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট ১ম বেসিল মুসলমানদের নিকট হতে টারানটো কেল্লা পুনর্দখল করেন এবং তার কয়েক বছর পর কালাব্রিয়া হতে অবশিষ্ট আরবগণকে বহিষ্কৃত করেন। আড়াইশ' বছর আগে সুদূর আরবে যে বিস্তৃতি শুরু হয়েছিল, এইরূপে তার সমাপ্তি ঘটে। যে সব আরব স্তম্ভ' হতে সিসিলী বা আফ্রিকার আরব নৌ-বাহিনীর আগমন বার্তা ঘোষণা করা হত, আজো তা নেপলস-এর দক্ষিণ অঞ্চলে উপকূল ভাগের সৌন্দর্য বর্ধন করছে। ট্যানক্রেড-দ্য-হটেভিলের পুত্র কাউন্ট রোজার ১০৬০ সালে মেসিনা অধিকার করেন। এইরূপে নর্মানদের দ্বারা সমগ্র সিসিলী দখলের সূচনা হয়। ১০৭১ সালে পালারমো এবং ১০৮৫ সালে সিরাকিউস অধিকৃত হয়। ১০৯১ সালে অধিকার-কার্য সমাপ্ত হয়। ১০৯০ সালে রোজার মালটা দখল করেন। মূল ভূখণ্ডে আগেই নর্মানদের একটা শক্তিশালী রাজ্য ছিল; এই বার তারা তাদের নব-বিজিত দেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়।

সিসিলী দ্বীপ নর্মানদের অধীনে থাকাকালে সেখানে খৃস্টান ও মুসলমানদের কৃষ্টির সংমিশ্রণে এক নতুন তমদ্দুনের উদ্ভব হয়। সিসিলী আগে হতেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনে সমৃদ্ধ ছিল। আরব শাসনাধীনে থাকাকালে প্রাচ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা এখানে প্রবেশ করতে থাকে এবং আগের জামানার গ্রীক ও রোমক সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে মিশে গিয়ে নর্মানদের আমলে নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে এবং নর্মান সংস্কৃতি এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যে ফুটে ওঠে। এতকাল পর্যন্ত আরবরা যুদ্ধ-বিগ্রহে এমন গভীরভাবে লিপ্ত ছিল যে, তারা শান্তি কালোপযোগী কোন শিল্পের বিকাশ সাধন করার অবকাশ পায় নাই। এক্ষণে তাদের প্রতিভা আরব-শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অপূর্ব সাফল্য সম্পদে ফুটে উঠল।

প্রথম রোজার নিজে অশিক্ষিত খৃস্টান ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বেশীর ভাগ পদাতিক সৈন্য মুসলমানদের মধ্য হতে সংগ্রহ করেন। তিনি আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহ দিতেন, প্রাচ্য দেশীয় দার্শনিক, জ্যোতিষী এবং চিকিৎসক দ্বারা

পরিব্রত থাকতেন এবং অখৃস্টানদের আচার অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা দিতেন। ফলে মনে হত, পালারমোর দরবার মুখ্যত: প্রাচ্যদেশীয় এবং গৌণতঃ পাশ্চাত্যদেশীয় ছিল। এর একশত বছরেরও পর সিসিলীতে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যেত ঃ দেখা যেত, এ খৃস্টান রাজ্যের কতকগুলি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠান করছে মুসলমান কর্মচারী।

ইউরোপ মহাদেশে প্রাপ্ত কাগজে-লিখিত প্রাচীনতম দলীল হচ্ছে গ্রীক ও আরবীতে লেখা একটি হুকুমনামা। সম্ভবতঃ ১১০৯ সালে প্রথম রোজারের পত্নী এই আদেশ জারী করেন। মনে হয়, এ কাগজ সিসিলীতে উৎপাদিত হয় নাই—সিসিলীর আরবরা প্রাচ্য দেশ হতে আমদানী করে।

প্রথম রোজার যে আরব-সিসিলীর মৈত্রীর সূচনা করেন, তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় রোজার (১১৩০—১১৫৪) এবং দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মধ্যে। দ্বিতীয় রোজার মুসলমানের মত পোশাক পরতেন। তাঁর সমালোচকরা তাঁকে বলত 'আধা-বিধর্মী রাজা'। তাঁর পোশাকে পূর্ণাঙ্গ আরবী সাজ-সজ্জার বৈশিষ্ট্য ছিল। এমনকি তাঁর পৌত্রের আমলেও একজন ভ্রমণকারী পালারমোর মহিলাগণকে মুসলিম পোশাক পরতে দেখে।

দ্বিতীয় রোজারের দরবারের প্রধান অলঙ্কার ছিলেন আল-ইদরিসী। সমস্ত মধ্যযুগের মধ্যে তাঁর মত কৃতী ভৌগোলিক ও মানচিত্রবিদ আর একজনও ছিলেন না। তাঁর পুরানাম ছিল আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল ইদরিসী। ১১০০ সালে সিউটার এক স্পেনীয় আরব পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ১১৬৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় রোজারের পৃষ্ঠপোষকতায় পালারমো শহরে থেকে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা করেন। তাঁর রোজারীয় গ্রন্থে তিনি টলেমী, আল-মাসুদী প্রমুখ ভৌগোলিকদের মতের সংক্ষিপ্ত সার দিয়েই তুষ্ট হন নাই; বরং যে সব লোক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়, তাদের প্রদত্ত মূল বিবরণের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করেন। এই সব তথ্যের তুলনমূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণে তিনি দৃষ্টির অসামান্য প্রসারতা প্রদর্শন করেন এবং পৃথিবী যে গোল, তা' এবং তদ্রূপ বহু মৌলিক তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি নীলনদের উৎপত্তি স্থান নির্দেশ করেন, যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে এ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ গ্রন্থ তাঁর এক অমর কীর্তি। এছাড়া তিনি তাঁর নর্মান পৃষ্ঠপোষকের জন্য রূপ দিয়ে মহাশূন্যের একটি ম্যাপ ও পৃথিবীর একটি ম্যাপ তৈরী করেন। সিসিলীর দ্বিতীয় 'খৃস্টান-সুলতান' ছিলেন দ্বিতীয় রোজাবের পৌত্র হোহেনস্টফেনের দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনি সিসিলী ও জার্মানী উভয় দেশই শাসন করতেন। ১২২০ সালের পর তিনি 'পবিত্র রোমক সম্রাজ্যের অধিপতি' উপাধি গ্রহণ করেন এবং

ব্রিয়েনের ইসাবেলাকে বিয়ে করে বায়তুল মোকাদ্দেসের রাজা হন। সুতরাং, ধর্মের বিষয়াদির বাইরে সম্রাট ফ্রেডারিক খৃস্টজগতের উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই বিয়ের তিন বছর পর তিনি এক ক্রুসেডে বের হন। এর ফলে ইসলামী আদর্শে তিনি আরো প্রভাবান্বিত হন।

ব্যক্তিগত ও সরকারী জীবনে ফ্রেডারিক অর্ধ-প্রাচ্যপন্থী ছিলেন। তিনি হেরেম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দরবারে দীর্ঘ দাড়ি ও দোলায়মান পোশাক নিয়ে সিরিয়া ও বাগদাদের দার্শনিকরা বিরাজ করত, প্রাচ্যদেশ হতে নর্তকী বালিকা এসে হাজির হত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চল হতে ইহুদীরা আসত। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সূত্রে তিনি মুসলিম জগত—বিশেষতঃ মিসরের সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলতেন। সূর্য কিরণে উটপাখীর আণ্ডা ফুটানোর পন্থা পরীক্ষা করার জন্য তিনি মিসর হতে বিশেষজ্ঞ আনেন। সিরিয়া হতে তিনি দক্ষ বাজপালক এনে উক্ত পাখীকে শিকার শিক্ষা দেওয়ার কাজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং বাজের চোখ পরীক্ষা করে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, বাজ কেবল গন্ধের সাহায্যে তার খাদ্য খুঁজে বের করতে পারে কিনা। থিওডো এনটিওক একজন জোকোবাইট খৃস্টান ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্র জানতেন এবং ফ্রেডারিকের দোভাষীর কাজ করতেন। সম্রাটের আদেশে তিনি বাজপাখী দ্বারা শিকার সম্বন্ধীয় বই লেখেন। এই-ই ছিল প্রকৃতির ইতিহাস বিষয়ক প্রথম আধুনিক পুস্তক। থিওডোরের আগে মাইকেল স্কট ফ্রেডারিকের দরবারের জ্যোতিষী ছিলেন। ১২২০ হতে ১২৩৬ সাল পর্যন্ত মুসলিম-স্পেনের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হতেন। সম্রাটের জন্য স্কট আরবী হতে ইবনে সিনার ভাষ্য সম্বলিত আরাস্তুর শরীর-তত্ত্ব ও পশু-পাখী তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বইয়ের অনুবাদ করে বইখানি সম্রাটের নামে উৎসর্গ করেন। এই অনুসন্ধান স্পৃহা এবং এই পরীক্ষামূলক নীতি ও গবেষণা ফ্রেডারিকের দরবারের বৈশিষ্ট্য ছিল আর এখান হতেই ইটালীর রেনেসাঁর সূচনা হয়।

কিন্তু ফ্রেডারিকের একক মহত্তম অবদান ছিল তাঁর নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১২২৪)। সুস্পষ্ট সনদ অনুসারে স্থাপিত এই-ই ছিল ইউরোপের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তিনি সংগৃহীত বহু আরবী পাণ্ডুলিপি মওজুদ করেন। আরাস্তু ও ইবনে রুশদের গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করেন। এই অনুবাদের কপি তিনি প্যারিস ও বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন টমাস একুইনাস। চতুর্দশ শতাব্দী হতে শুরু করে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্যারিস, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—মুসলিম দেশসমূহের জন্য মিশনারী তৈরী করা।

সিসিলী দুই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের মিলনভূমি হিসেবে প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় জ্ঞান আদান-প্রদানের এক অপূর্ব মাধ্যমে পরিণত হয়। এর বাসিন্দাদের মধ্যে কতক ছিল জাতিতে গ্রীক, তারা গ্রীক ভাষায় কথাবার্তা বলত; কিছুসংখ্যক ল্যাটিন জানা পণ্ডিত ছিল। এ তিনটি ভাষাই সরকারী কাগজে, রাজকীয় সনদে এবং পালারমোর জনসাধারণের কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হত।

সিসিলীর নর্মান রাজারা তাঁদের পরবর্তীদেরসহ কেবল সিসিলী নয়, দক্ষিণ ইটালীও শাসন করতেন। এইরূপে সিসিলী হতে মুসলিম সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ সমগ্র ইটালী ও মধ্য ইউরোপে যাওয়ার জন্য তাঁরা সেতু-বন্ধ স্বরূপ ছিলেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আল্পস পর্বতের উত্তর অঞ্চলে মুসলিম তমদ্দুনের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দান্তের পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা কোন নির্দিষ্ট আরবী বই থেকে না নেওয়া হতে পারে, কিন্তু একথা নিশ্চিতই মনে হয় যে, সে ধারণার মূল ছিল প্রাচ্য দেশে, যদিও কবি তা' ইউরোপীয় লোক-কাহিনী হতে গ্রহণ করেন। প্রাচ্য দেশ হতে নানা পথে এই অনুপ্রবেশ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে। সিসিলী ও ইটালীর দক্ষিণ ভাগ খৃস্টান শাসনে চলে যাওয়ার বহুদিন পরেও মুসলিম কারিগর ও শিল্পীদের আদর ছিল। প্যালেটাইন চ্যাপেলে তাদের মোজাইক ও লিপি-শিল্পই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। পালারমো রাজপ্রাসাদে মুসলিম শাসকরা যে বিখ্যাত বয়ন-শিল্পাগার স্থাপন করেন, তা হতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম কাপড় (আরবী লিপি-শিল্পের অলংকারসহ) ইউরোপীয় রাজপরিবারসমূহের পোশাকের অভাব পূরণ করত। প্রাচ্যে বোনা কাপড়ের চাহিদা এত প্রবল ছিল যে, তার অন্ততঃ এক প্রস্থ না থাকলে কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোকই স্বস্তিবোধ করতেন না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিস অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে মুসলিম ফ্যাশন গ্রহণ ও চারদিকে বিস্তার করতে থাকে। এই সময় ইটালীর দফতরিখানায় বাঁধা এই আরবী চেহারা গ্রহণ করতে শুরু করে। আরব দফতরিদের বাঁধানো বইয়ে পাতার সামনের প্রান্ত রক্ষার জন্য ফ্ল্যাপ থাকত। খৃস্টানদের বইয়ে এই ফ্ল্যাপসহ আরব বাঁধাইয়ে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। সেই সঙ্গে চামড়ার খাপ কারুকার্য খচিত করার বিদ্যাও ইটালীর বিভিন্ন শহরের মুসলিম কারিগরদের নিকট হতে শিক্ষা করা হয়। ভেনিস আরো একটি আরব-শিল্পের কেন্দ্র ছিল—পিতলের উপর সোনা, রূপা অথবা লাল তামার কাজ। মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তারে স্পেনের পরই সিসিলীর স্থান এবং ক্রুসেডের যুগে তার স্থান ছিল সিরিয়ার উপরে।

মুসলমানদের শেষ চিহ্ন যখন ইউরোপের বুক হতে মুছে যাচ্ছিল, তখন বাগদাদের খিলাফত ষড়যন্ত্র ও রক্তপাতের দরীয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে। এর পরের অবস্থা কি হবে এবং কোন্ পথে সে নতুন অবস্থার আগমন ঘটবে, নবম শতাব্দীতে তুলুনিদ বংশের প্রতিষ্ঠায় তার আংশিক পরিচয় পূর্বাহ্নেই পাওয়া

যায়। খিলাফতের বুকের মধ্যে যে তুর্করা বাসা বেঁধে এতকাল নীরব ছিল, এ বংশের প্রতিষ্ঠায় তাদেরই রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে ওঠে। এরপর আরো শক্তিশালী তুর্ক বংশ রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। খিলাফতের ধ্বংসের উপর যে সব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে আহমদ ইবনে তুলুন-এর রাজ্য অন্যতম। আহমদ ৮৬৮ সালে ক্ষমতা হস্তগত করেন। এইসব রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রকমে ছিন্ন করে এবং কেবল নামেমাত্র বাগদাদের খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে। কোন উচ্চাভিলাসী অধীনস্থ কর্মচারী তার আপন বাহুবলে এবং গোলাম ও অনুচরদের সাহায্যে অমন বিরাট রাজ্যের বুকে কি করে সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে, আহমদ তার প্রমাণ। কিন্তু যে রাজ্যের উপর তুলুনিদ ও তদ্রূপ অন্যান্য বংশ শাসন-ক্ষমতা পরিচালন করত, সে রাজ্যের ভিতর তাদের জাতীয় ভিত্তি ছিল না। তাদের দুর্বলতার মূল ছিল, রাজ্যে তাদের স্বজাতীয় ঐক্যবদ্ধ কোন দলের সমর্থনের অভাব। শাসকরা ছিল অনধিকার প্রবেশকারী। তাদের দেহ-রক্ষীরাই ছিল তাদের সৈন্য এবং এ দেহ-রক্ষীদের তারা বাইরের বিজাতীয়দের মধ্য হতে সংগ্রহ করত। কেবল অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকই এমন শাসন চালাতে পারে। এদের সবল বাহু দুর্বল হয়ে পড়া মাত্রই চারদিকে ভাঙ্গন শুরু হয়। ইবনে তুলুন যে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তা রাজ্যের চতুর্থ উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্রের আমলে ৯০৫ সালে আব্বাসীয় খলীফাদের হাতে ফিরে যায়।

আর একটি স্বতন্ত্র বংশ দুইশ' বছরের উপর শাসন পরিচালনা করে এবং ইতিহাসে একটা পাতা যোগ করে। এদের দিকে এখন আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। এ ছিল ফাতেমীয় খলীফাদের বংশ—মুসলিম-জগতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য শীয়া খিলাফত। বাগদাদের খলীফারা মুসলিম-জগতের যে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল, তারই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ৯০৯ সালে তিউনিসে এর প্রতিষ্ঠা হয়। অল্পকাল মধ্যেই এরা মিসর ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকার উপর আধিপত্য স্থাপন করে এবং তাদের অধীনে কায়রো শহর নব গৌরব মহিমায় উন্নীত হয়। কিন্তু সাময়িকভাবে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও এরা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে নাই। নীলনদের যে পানি তীর ছাপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, তারই উপর বাসিন্দারা তাদের রুটির জন্য নির্ভরশীল ছিল; সুতরাং তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল একান্ত অনিশ্চিত। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও খাজনা আদায়কারীদের অত্যাচার, ষড়যন্ত্র ও অনাচারের সেই পুরানো কাহিনী—সমস্ত মিলে ফাতেমীয়দের দুর্বল করে ফেলে। ক্রুসেডের আমলে ১১৭১ সালে বিশ্ব বিখ্যাত সালাহ্উদ্দীন এ খিলাফতের অবসান করেন।

রাজনৈতিক দিক হতে ফাতেমীয় বংশ মিসরে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ফেরাউনদের পর মিসর এই প্রথম একটা সার্বভৌম এবং জীবন্ত শক্তির অধীশ্বর হয়। একজন পারসিক মিশনারী ১০৪৬—১০৪৯ সালে মিসরে ভ্রমণ করতে আসেন এবং উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ একটি বিবরণ রেখে যান। খলীফার প্রসাদে ৩০ হাজার লোক থাকত; তার মধ্যে চাকর ছিল ১২ হাজার, অশ্বারোহী এবং পদাতিক ১০ হাজার। ভ্রমণকারী একদা এক উৎসব উপলক্ষে তরুণ খলীফাকে দেখেন। তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। চেহারাটি সুন্দর—দাড়ি ছাটা। পরনে কেবল একটি সাদা জামা আর পাগড়ী—তাঁর মাথার উপর প্রসারিত বহু মূল্য রত্ন খচিত ছত্র। রাজধানীতে খলীফার ২০ হাজার বাড়ী ছিল— বেশীর ভাগই ইটে তৈরী ও পাঁচ হতে ছয় তলা। তাঁর দোকানও অনুরূপ সংখ্যক ছিল; প্রত্যেক দোকান মাসে দুই হতে দশ দিনার হারে ভাড়া দেওয়া হত। প্রধান রাস্তাগুলির ছাদ ও ছাদের নীচে বাতি ছিল। দোকানদাররা একদামে জিনিস বিক্রি করত। কোন দোকানদার গ্রাহককে ঠকালে তাকে উটে চড়িয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হত আর অপরাধী অনবরত তার অপরাধ স্বীকার করতে থাকত। এমন কি মনিকার ও বাট্টাদারদের দোকানও খোলা রেখে যাওয়া হত। সমস্ত দেশব্যাপী এমন নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি ভ্রমণকারীর নজরে পড়ে যে, তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'আমি এ দেশের ধন-সম্পদের কোন পরিমাণই করতে পারলাম না ঃ আমি আর কোথাও এত সমৃদ্ধির নিদর্শন দেখি নাই।'

ফাতেমীয়রা যখন মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করে, তখন বাগদাদের পুরানো সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। সালজুক তুর্করা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং তুগরীল নমে তাদের একজনকে ১০৩৭ সালে রাজধানীতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। নতুন নতুন তুর্কী উপজাতীয় কওমের লোক এসে এদের সৈন্যদল পুষ্ট করতে থাকে। সালজুকরা তাদের রাজ্যও চারদিকে বাড়াতে থাকে। আবার পশ্চিম এশিয়া এক সাম্রাজ্যে একীভূত হয় এবং ইসলামের বাহু-বলের বিলীয়মান গৌরব ফিরে আসে। ইসলামের বিশ্ব-নেতৃত্বের সংগ্রামে মধ্য এশিয়া হতে এক নতুন জাতি এসে রক্তের খেলায় মেতে ওঠে। এই বর্বর অবিশ্বাসীরা কি করে পয়গম্বরের অনুচরদের ঘাড়ে পা রাখে—আবার তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করে সে ধর্মের একনিষ্ঠ রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়, ইসলামের বিচিত্র ইতিহাস তার কাহিনী নতুন নয়। তাদেরই জ্ঞাতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গোলরা এবং তাদের অন্য জ্ঞাতি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ওসমানীয় তুর্করা তো এই একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে। রাজনৈতিক ইসলামের সর্বাপেক্ষা দুর্দিনে ধর্মীয় ইসলাম তার কতিপয় শ্রেষ্ঠতম বিজয় অর্জন করে।

ইসলামের আসমানে সত্যি তখন ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। ১২১৬ সালে চেঙ্গীজ খাঁ ষাট হাজার দুর্ধষ মঙ্গোল যোদ্ধার এক ভয়াবহ বাহিনী নিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অদ্ভুত ধনুক হাতে চারিদিকে ত্রাস সৃষ্টি আর নিষ্ঠুর ধ্বংসের আগুন জ্বালাতে বের হন। এদের হামলার তাণ্ডবে প্রাচ্য ইসলামের তামদ্দুনিক কেন্দ্রগুলির অস্তিত্ব মুছে যায়; তাদের স্থান রয়ে যায় উষর নির্মম মরুভূমি; অথবা যেখানে ছিল মস্ত বড় বড় ইমারত ও কুতুবখানা, সেখানে পড়ে থাকে বিকট ধ্বংসস্তূপ। তাদের পেছনে লোহিত দাগ রেখে চলে বিশুষ্ক রক্ত প্রবাহ। হিরাটের ১ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে বেঁচে যায় মাত্র ৪০ হাজার। বোখারার সুবিখ্যাত মসজিদগুলিকে বর্বররা তাদের ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে। বলখ ও সমরকন্দের বাসিন্দাদের অধিকাংশকে নির্মমভাবে হত্যা করে অবশিষ্টদের বন্দী করে নেয়। খাওয়ারিজমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। শীঘ্রই বাগদাদের পালা আসে। বোখারা দখল করে নাকি চেঙ্গীজ খাঁ ঘোষণা করেন : 'আমি আল্লাহর গজব, পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।' যে লোকদের তিনি পরিচালন করেন, তারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীন হতে আদ্রিয়াতিক পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ওলোট পালোট করে তোলে। রাশীয়া আংশিকভাবে অধিকৃত হয় এবং তারা মধ্য ইউরোপের পূর্ব প্রুশীয়া পর্যন্ত প্রবেশ করে। ১২৪১ সালে চেঙ্গীজ খাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হয় বলে পশ্চিম ইউরোপ মঙ্গোল হামলাকারীদের হাত হতে বেঁচে যায়। কিন্তু বাগদাদের রেহাই ছিল না।

হালাকু খাঁ ছিলেন চেঙ্গীজ খাঁর অন্যতম পৌত্র। ১২৫৩ সালে এক বিপুল বাহিনীসহ হালাকু খিলাফত ধ্বংসের জন্য মঙ্গোলীয়া হতে নির্গত হন। এমনিভাবে মঙ্গোল যাযাবরদের দ্বিতীয় তরঙ্গ এগিয়ে আসতে থাকে। বাগদাদ সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ হতে যে সব ছোট ছোট রাজ্য মাথা তুলে উঠেছিল, হালাকুর সৈন্য প্রবাহে তাদের সবগুলি ভেসে যায়। ১২৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে হালাকুর দুর্বার মঙ্গোল তরঙ্গ বাগদাদের প্রাচীরে প্রাচীরে ভেঙ্গে পড়ে। রাজধানীর দেয়াল সে তরঙ্গের অভিঘাত সইতে পারে না; ভগ্নপথে মঙ্গোল প্রবাহ প্রবেশ করে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হালাকুর একজন খৃস্টান স্ত্রী ছিল; সেই ভরসায় খলীফার উজীর নেস্টোরীয়ান ধর্মযাজককে সঙ্গে নিয়ে হালাকুর শিবির দুয়ারে পৌঁছে সন্ধির শর্ত জিজ্ঞাসা করে পাঠান। কিন্তু হালাকু তাঁকে সাক্ষাত দান করতে রাজী হন নাই। কেউ কেউ গিয়ে হুঁশিয়ারীর বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ 'বাগদাদ শান্তির শহর। অতীতে এ শহর যারা আক্রমণ কিংবা আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংস করতে এসেছে, তারা নিপাত গিয়েছে।' কিন্তু হালাকুর মনে ভয়ের রেখাপাত মাত্র হয় না। কেউ কেউ গিয়ে বলে—'খলীফাকে হত্যা করলে সমস্ত বিশ্বে বিপ্লব শুরু হবে; সূর্য তার মুখ লুকাবে, বৃষ্টিপাত থেমে যাবে, গাছ-পালার জন্ম বন্ধ হবে।' কিন্তু হালাকুর সাথে জ্যোতিষী ছিল এবং

তাঁরা তাঁকে জয়ের পক্ষে নিশ্চয়তার পরামর্শ দেয়। হালাকু অবিচলিত থাকেন। দশই ফেব্রুয়ারী তক তাঁর বর্বর অনুচরেরা শহর ভরে ফেলে। হতভাগ্য খলীফা তাঁর তিনশ' সভাসদসহ এসে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। দশ দিন পর তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হয়। শহর আগুন আর লুণ্ঠনের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। খলীফার পরিবারের লোকজনসহ বেশীর ভাগ বাসিন্দাকেই কতল করা হয়। পথের পাশে পাশে লাশ পঁচে গলে যায়; তাঁর দুর্গন্ধে হালাকু কয়েক দিনের জন্য শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। বাগদাদে তাঁর বাস করার ইচ্ছা ছিল বলে অন্যান্য বিজিত শহরের মত বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় নাই। নেস্টোরীয়ান যাজক-পতি বিশেষ ভাষার অনুশীলন, অনুগ্রহ পান। কয়েকটি মসজিদ এবং মাদ্রাসা বেঁচে যায় বা পুনর্নির্মিত হয়। জুমার নামাজে যাঁর নামে খোতবা পড়া চলে, এমন খলিফার অভাব মুসলিম জগতে এই প্রথম দেখা দেয়।

১২৬০ সালে হালাকু উত্তর সিরিয়া আক্রমণে উদ্যত হন। এখানে তিনি হামা, হারিম ও আলেপ্পো দখল করেন। শেষোক্ত শহরে ৫০ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ আসে। কাজেই দামেস্ক বিজয়ের জন্য সৈন্য পাঠিয়ে তিনি পারস্যে ফিরে আসেন। তাঁর ফেলে-আসা সৈন্যরা দামেস্ক অধিকার করে। কিন্তু তারপর ১২৬০ সালে নাজারেথের নিকট তারা বায়বার্সের হাতে বিধ্বস্ত হয়। বায়বার্স আরব জগতের শেষ উল্লেখযোগ্য বংশ মামলুকদের কৃতী সেনাপতি ছিলেন।

হালাকুই প্রথম ইল-খান উপাধি গ্রহণ করেন ১২৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে হযরত মুহম্মদের (সঃ) ধর্ম আবার এক মহোজ্জ্বল বিজয় লাভ করে ঃ সপ্তম খান ইসলামকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন। যেমন মামলুকদের বেলায়, তেমনি মঙ্গোলদেরও বেলায় মুসলমানদের বাহু-বল যেখানে পরাজয় মানে, ইসলাম সেখানে জয়লাভ করে।

ইতিমধ্যে দূর পশ্চিম প্রান্তে ইসলাম আর এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এ সঙ্কটের ফলে আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় পৃষ্ঠা যুক্ত হয় এবং ইসলামের এক মহত্তম সেনানী ও বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে। এ ছিল ক্রুসেড—আর সালাহ্উদ্দীনের যুগ।

ক্রুসেড

ইতিহাসের দূর অতীত হতে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়, ক্রুসেড তারই মধ্যযুগীয় অধ্যায়। ট্রোজান ও পার্সীয়ান যুদ্ধগুলি ছিল সূচনা। পশ্চিম ইউরোপের এ যুগে এই সাম্রাজ্য বিস্তার তার আধুনিকতম পরিণতি।

আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা চলে যে, ৬৩২ সাল হতে মুসলিম-এশিয়া সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, স্পেন ও সিসিলী প্রভৃতি ভূভাগে যে আক্রমণমূলক সংগ্রাম পরিচালনা করে, ক্রুসেড তারই বিরুদ্ধে খৃস্টান ইউরোপের প্রতিক্রিয়া। ক্রুসেডের পরিপোষক আরো কতকগুলি পূর্ববর্তী কারণ ছিল; যেমন : টিউটনিক সম্প্রদায়গুলির যাযাবর জীবন ও সংগ্রাম প্রবণতা; ইতিহাসে প্রথম আবির্ভাব কাল হতে এরা ইউরোপের মানচিত্র বদলিয়ে দেয়; ১০০৯ সালে একজন ফাতেমীয় খলীফা কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দেসের গীর্জা ধ্বংস;—এখানে হাজার হাজার ইউরোপীয় তীর্থে যেত এবং ৮০০ সালে এর চাবি বায়তুল মোকাদ্দেসের প্রধান পুরোহিত শার্লেমেনকে আশীর্বাদরূপে পাঠান; আর এশিয়া মাইনরের ভিতর দিয়ে যাওয়া কালে তীর্থযাত্রীদের প্রতি জুলুম। কিন্তু ক্রুসেডের আশু কারণ ছিল, বাইজেন্টাইন সম্রাট আলেকসিয়াস কমনেনাস-এর যুদ্ধ-আবেদন। সালজুকদের দ্বারা তাঁর এশিয়াস্থ মর্মরার উপকূল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। তারা কন্সটানটিনোপলের উপর পর্যন্ত হামলা করতে ব্রতী হয়। এই অবস্থায় সম্রাট ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবানের নিকট আবেদন করেন। মনে হয়, পোপ এই আবেদনের সুযোগ নিয়ে গ্রীক চার্চ ও রোমক চার্চের মধ্যে ঐক্যবিধানের আশা পোষণ করছিলেন; কারণ, উভয়ের ভিতরকার মতবাদমূলক বিভেদ ইতিপূর্বেই ১০০৯ ও ১০৫৪ সালের মাঝখানে দূরীভূত হয়েছিল।

১০৯৫ সালের ২৬ নভেম্বর পোপ আরবান দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের ক্লারমন্ট নামক স্থানে যে বক্তৃতা দেন, জগতের ইতিহাসে অমন কার্যকরী বক্তৃতা বোধহয় আর কেউ কখনো দেন নাই। তিনি ধার্মিকদের সম্বোধন করে পবিত্র জেরুজালেমের পথে অগ্রসর হয়ে সে স্থানকে পাপিষ্ঠ জাতির হাত হতে উদ্ধার করে নিজেদের অধীনে আনতে আহ্বান জানান। 'এ যুদ্ধ ঈশ্বর চান'—এই ধ্বনি

দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ছোট বড় সবাইকে উন্মত্ত করে তোলে। পরবর্তী বছর বসন্তকালে দেড়লক্ষ লোক এ আবেদনে সাড়া দেয় এবং কন্সটানটিনোপলে একত্র হয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ফিরিঙ্গী (ফ্রাঙ্ক) ও নর্মান। এদের সবাই নিজ নিজ পোশাকে ক্রুস চিহ্ন বহন করত; তাই এদের অভিযানের নাম হয় ক্রুসেড। এইরূপে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়।

যারা ক্রুস বহন করে যাত্রা করে, তাদের সবাই যে ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অগ্রসর হয়, এমন নয়। বোহেমন্ড-এর মত কতিপয় নেতা নিজেদের জন্য ছোট-খাটো রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। পিসা, ভেনিস ও জেনোয়ার সওদাগরগণ ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজতে বের হয়; দুঃসাহসী ও ধর্মোম্মাদগণ নতুন কর্মক্ষেত্রের অনুসন্ধানে গৃহ ত্যাগ করে এবং পাপীরা এই পথে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। ফ্রান্স, লোরেইন, ইটালী এবং সিসিলীর দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণ ক্রুসেডে যাওয়াকে ত্যাগ স্বীকার মনে না করে বরং লাভজনকই মনে করত।

ক্রুসেডকে সাত হতে নয় সংখ্যায় বিভক্ত করার যে সনাতন নীতি চলে আসছে, তা সন্তোষজনক নয়। মোটের উপর এ ছিল এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ; কাজেই এদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা টানা কঠিন। তবে একে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে : প্রথম—বিজয়ের যুগ (১১৪৪ সাল পর্যন্ত); দ্বিতীয়—মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার যুগ এবং সালাহ্উদ্দীনের বিরাট বিজয়; তৃতীয়—ছোট ছোট ঘরোয়া যুদ্ধের যুগ (১২৯১ পর্যন্ত)—এ সময় তারা সিরিয়ার মূলভূমি হতে শেষ ঘাঁটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। বিজয়ের যুগ সম্পূর্ণরূপে তথাকথিত দ্বিতীয় ক্রুসেডের (১১৪৭—১১৪৯) আগে পড়ে এবং তৃতীয় যুগ মোটামুটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাথে মিলে যায়। এই শেষোক্ত যুগের একটি ক্রুসেড পরিচালিত হয় কন্সটানটিনোপলের বিরুদ্ধে (১২০২—১২০৪), দুইটি মিসরের বিরুদ্ধে (১২১৮—১২২১), একটি তিউনিসের বিরুদ্ধে (১২৭০)। এ সব অভিযান নিষ্ফল হয়।

প্রথম ক্রুসেডারগণ কন্সটানটিনোপল হতে এশিয়া মাইনরের পথে যাত্রা করে। সম্রাট আলেকসিয়াস অধিকাংশ ক্রুসেডীয় নেতার নিকট হতে তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। ক্রুসেডারগণ তাদের বিজয় পথে এশিয়া মাইনরের অর্ধভাগের উপর বাইজেন্টাইন প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন করে এবং তুর্কদের ইউরোপ আক্রমণ সাড়ে তিনশ' বছর পিছিয়ে দেয়।

১০৯৪ সালের মধ্যেই ক্রুসেডারগণ ইডেসা, টারসাস, এনটিওক এবং আলেপ্পা অধিকার করে। যে 'পবিত্র বর্শা' ক্রুসোপরি যীশুখৃস্টের দেহকে বিদ্ধ করে এবং যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত এনটিওকের একটি গীর্জার তলে সমাহিত ছিল, ক্রুসেডারদের দ্বারা সেই বর্শা আবিষ্কৃত হওয়ায় তাদের উৎসাহ শতগুণে বেড়ে

যায়। ১০৯৯ সালের ৭ জুন প্রায় বিশ হাজার নিয়মিত সৈন্যসহ চল্লিশ হাজার ক্রুসেডার জেরুজালেমের সম্মুখে গিয়ে হাজির হয়। এখানে মিসরীয় সৈন্য দলের সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। জেরিকোর দেয়াল যেমন ধ্বসে পড়েছিল, জেরুজালেম দেয়ালও তেমনি ধ্বসে পড়বে — এই ভরসায় ক্রুসেডাররা খালি পায় শিঙ্গা ধ্বনি করতে করতে চারপাশ ঘুরে আসে। ১৫ জুলাই আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করে এবং নর-নারী ও আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নগরবাসিগণকে কতল করে। শহরের অলিতে-গলিতে ও ভ্রমণ স্থানে স্তূপীকৃতভাবে মানুষের মাথা, হাত ও পায়ের পাতা পড়ে থাকতে দেখা যায়।' ক্রুসেডারদের অনেকে তাদের ব্রত সাধিত হয়েছে ভেবে জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যায়।

ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কাউন্ট ছিলেন তোলোঁর রেমন্ড। তিনি ও বোহেমন্ড, বলডুইন, গডফ্রে এবং ট্যানক্রেডের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা সিরিয়া ফিলিস্তিনে তিনটি ছোট ল্যাটিন রাজ্য স্থাপন করে এবং আরো রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু এসব রাজ্য বেশী দিন টিকে নাই। তাদের কলহ-কোন্দলের বিবরণ আরব ইতিহাসের অঙ্গ নয়—ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায়। তবে স্থানীয় লোক এবং ইউরোপীয় আগন্তুকদের মধ্যে যে শান্তি ও বন্ধুত্বময় সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তা উল্লেখযোগ্য।

খৃস্টানরা 'পবিত্র ভূমিতে' এই ধারণা নিয়ে আসে যে, তারা স্থানীয় লোকদের চেয়ে বহু গুণে উন্নত; স্থানীয় লোকেরা প্রতিমা পূজক, তারা হযরত মুহম্মদকে (সঃ) আল্লাহ্‌, জ্ঞানে পূজা করে। প্রথম সাক্ষাতেই তাদের এ ভুল ভেঙ্গে যায়। খৃস্টানরা আরবদের মনে যে ধারণা রেখে আসে, তা একজন আরব ঐতিহাসিকের কথায় পাওয়া যায় ঃ 'ইউরোপীয় লোকগুলি জন্তু; তবে তাদের সাহস ও লড়াইয়ের ক্ষমতা—এই দুই গুণ আছে; আর কিছুই নাই।' স্থানীয় ও আগন্তুকদের মধ্যে যুদ্ধের চেয়ে শান্তির সময় দীর্ঘতর ছিল। এই সময়ে তারা বাধ্য হয়ে পাশাপাশি থাকে; কিন্তু এই বাধ্যতামূলক প্রতিবেশিত্বের ফলে তারা পয়গম্বরকে জানাবার সুযোগ পায়; ফলে তাদের পরস্পরের প্রতি আগের মনোভাব বহুলাংশে বদলে যায়। ক্রমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফিরিঙ্গীরা বিশ্বাসভাজন স্থানীয় লোককে ক্ষেত-খামারের কাজে নিযুক্ত করতে থাকে। তারা যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রবর্তন করে, আস্তে আস্ত তা স্থানীয় ভূমি-ব্যবস্থায় স্থান করে নেয়। তারা তাদের সঙ্গে ঘোড়া, বাজ ও কুকুর নিয়ে যায়। অল্পকাল মধ্যেই চুক্তি হয়ে যায় যে, শিকারীদল আক্রমণের বিপদ হতে মুক্ত থাকবে। পথিক ও সওদাগরদের জন্য রক্ষী বদলা- বদলী হত এবং সাধারণতঃ উভয় পক্ষই সত্য রক্ষা করত। ফিরিঙ্গীরা ইউরোপীয় পোশাক ছেড়ে দিয়ে দেশীয় লোকের অধিকতর আরামজনক পোশাক গ্রহণ করে। খাওয়া-খাদ্য ব্যাপারে—

বিশেষ করে চিনি ও মসলাযুক্ত খাদ্যের দিকে তাদের নতুন রুচি গড়ে ওঠে। প্রাচ্য ফ্যাশনের বড় বড় কোঠা ও প্রবহমান পানির উৎস-যুক্ত বাড়ীই তারা পছন্দ করতে শুরু করে। কেউ কেউ স্থানীয় লোকের মধ্যে বিয়ে-শাদী করে। এমন ঘরের ছেলে-মেয়েকে বলা হত 'পুলেইন'—'বকরীর বাচ্চা' অথবা কেবল 'বাচ্চা'। মুসলমান ও ইহুদী উভয়ে ভক্তি করে এমন কোন কোন তীর্থস্থানকে তারা ভক্তি করা আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে কলহের অন্ত ছিল না। সে সব কলহে তারা কখনো কখনো 'বিধর্মী'দের সাহায্য চাইত; মুসলমানরাও তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সাহায্য চাইত।

খৃস্টানরা সিরিয়া এবং মিসরের অধিকাংশ স্থান জয় করে নেয়। মুসলিম জগতে ১১২৭ হতে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। আর তারই ফলে রঙ্গ-মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে আবির্ভূত হন এক অসাধারণ বীর পুরুষ—সালাহ্উদ্দীন আল-মালিক আল-নাসির আস সুলতান সালাহ্উদ্দীন ইউসুফ। সিরিয়ার এক কুর্দ পরিবারে এর জন্ম হয় ১১৬৯ সালে। ইনি মিসরের উজীরের পদে কাজ করেন। তারপর ইনি মিসর হতে শীয়া মতবাদ উৎসাদনে এবং ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে জেহাদে নিজকে উৎসর্গ করেন।

ছয়দিন অবরোধের পর ১১৮৭ সালের ১ জুলাই সালাহ্উদ্দীন টাইবেরিয়াস দখল করেন। এরপর এল সন্নিহিত হিত্তিনের লড়াই। এ লড়াই শুরু হয় শুক্রবারে; সালাহ্উদ্দীনের লড়াই শুরু করার এই-ই ছিল একটি প্রিয় দিন। আর ফিরিঙ্গীদের জন্য এ ছিল এক বিষাদময় দিন। তারা সংখ্যায় প্রায় বিশ হাজার ছিল; পিপাসায় কাতর অবস্থায় তারা প্রায় সকলেই দুশমনের হাতে বন্দী হয়। সম্ভ্রান্ত বন্দীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভিজাত ছিলেন জেরুজালেমের রাজা গাই-ডি-লুসিগনান। বীর সুলতান ক্ষুণ্ন রাজাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গী চ্যাটিলনের রেজিনাল্ডের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত ল্যাটিন নেতার মধ্যে রেজিনাল্ডই বোধহয় সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী এবং সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তিনি সবচেয়ে ভাল আরবী বলতে পারতেন। তিনি কারাক (ল্যাটিনে) 'ক্রাক' শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে একাধিকবার নিকটবর্তী পথে নিরীহ কাফেলা লুণ্ঠন করেন। তিনি একটি নৌবাহিনী নিয়ে হজযাত্রীদের উপর আক্রমণ দ্বারা হেজাজের পবিত্র উপকূলে উৎপাত করেন। সালাহ্উদ্দীন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি নিজ হাতে এই সন্ধি ভঙ্গকারীকে হত্যা করবেন। এইবার তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের সুযোগ আসে। আরবের মেহমানদারীর সনাতন রীতি অনুযায়ী কোন লোককে কিছু খেতে দিলে আর তার উপর অস্ত্র ধারণ করা চলে না। সেই সুযোগ নেওয়ার মতলবে রেজিনাল্ড সালাহ্উদ্দীনের তাঁবু হতে এক গেলাস পানি চেয়ে খান। কিন্তু এ পানি

সালাহ্‌উদ্দিন নিজে খেতে দেন নাই; কাজেই দুইয়ের মধ্যে মেজবান ও মেহ্‌বান সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে নাই। রেজিনাল্ডকে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জান দিতে হল। টেম্পলার ও হস্পিটালার নামীয় যোদ্ধাদের সবাইকে প্রকাশ্য স্থানে হত্যা করা হয়।

হিট্টিনের বিজয়ে ফিরিঙ্গীদের কপাল ভাঙ্গে। এক সপ্তাহের অবরোধের পর জেরুজালেম ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর আত্মসমর্পণ করে। আকসা মসজিদে খৃস্টানদের ঘণ্টা-ধ্বনির স্থলে মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনি শুরু হয় এবং প্রস্তর গম্বুজের উপর যে সোনার ক্রুস ছিল, সালাহ্‌উদ্দীনের সৈন্যরা তা ছিঁড়ে নামিয়ে আনে।

ল্যাটি রাজ্যের রাজধানী দখল হওয়ায় সিরিয়া-ফিলিস্তিনের বেশীর ভাগ ফিরিঙ্গী শহরই সালাহ্‌উদ্দীনের হাতে আসে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত কয়েকটি অভিযানে তিন বাকী দুর্গগুলি দখল করে নেন। দেশ হতে ফিরিঙ্গীদের সমূলে উচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কয়েকটি ছোট ছোট শহর ও কেল্লাসহ কেবল এনটিয়ক, ত্রিপলী এবং টায়ার তাদের হাতে থাকে।

জেরুজালেমের পতন ইউরোপকে জাগিয়ে তোলে। রাজায় রাজায় কলহ তারা ভুলে যায়। জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড কোর-ডি-লায়ন এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ক্রুস ধারণ করে তলোয়ার খোলেন। পশ্চিম ইউরোপে এরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যেশ্বর এবং এঁদেরই নিয়ে শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯ —১১৯২)। এঁদের সৈন্যসংখ্যা ছিল বিপুল। এ ক্রুসেডের ময়দানে একদিকে সালাহ্‌উদ্দীন, অন্যদিকে কোর-ডি-লায়ন (সিংহ-হৃদয়)-এই দুই দুর্দোণ্ডপ্রতাপ প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে কত কাব্য কাহিনীই না রচিত হয়েছে।

ফ্রেডারিক সকলের আগে যাত্রা করেন ও স্থল পথে অগ্রসর হন; কিন্তু পথি-মধ্যে সিসিলীর একটি নদী পার হওয়ার সময় ডুবে মারা যান। তাঁর অনুচরদের বেশীর ভাগই দেশে ফিরে যায়। যাওয়ার পথে রিচার্ড সাইপ্রাস অধিকার করেন। পরবর্তীকালে এই সাইপ্রাসই মূল-ভূমি হতে বিতাড়িত ক্রুসেডারদের শেষ আশ্রয় স্থল হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে জেরুজালেমের ল্যাটিনরা সাব্যস্ত করে যে, তাদের হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে একার চাবিকাঠির কাজ করতে পারে। সুতরাং, তাদের সমস্ত সৈন্য-বল একত্র করে তারা একারের পানে যাত্রা করে। ফ্রেডারিকের বাকী সৈন্য দল ও ফ্রান্সের রাজার কয়েক দল যোদ্ধা এসে এদের সঙ্গে যোগ দেয়। রাজা গুই সালাহ্‌উদ্দীনের হাতে বন্দী ছিলেন। তিনি আর কোনদিন সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না —এই শর্তে সুলতান তাঁকে কিছুকাল আগে মুক্তি দেন। সেই

গুই এসে একার আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আক্রান্ত নগর পুনরুদ্ধার করার জন্য পরদিনই সালাহ্উদ্দীন এসে হাজির হন ও দুশমনদের শিবিরের অপর দিকে তাঁবু গাড়েন। জলে-স্থলে সংগ্রাম চলতে থাকে। রিচার্ডের আগমনে ক্রুসেডাররা উল্লসিত হয়ে ওঠে ও খুশীতে বাজী পোড়ায়। অবরোধকালে বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে এবং আরবী ও ল্যাটিন উভয় ভাষাতেই তার মনোরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়। সালাহ্উদ্দীন এবং রিচার্ডের মধ্যে উপহার আদান-প্রদানও চলে; তবে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় নাই। শহরের দেয়াল হতে প্রত্যেক পাথর খুলে আনার জন্য রিচার্ড প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন। ফলে পুরুষ ও নারী অনেকেই অসাধারণ সাহসের পরিচয় দেয়। কেউ কেউ এই অবরোধকে মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান সামরিক অভিযান বলে মনে করেন। দীর্ঘ দুই বছর পর্যন্ত অবরোধ চলতে থাকে—১১৮৯ সালের ২৭ আগস্ট হতে ১১৯১ সালের ১২ জুলাই পর্যন্ত। ফিরিঙ্গীদের সুবিধা ছিল, তাদের নৌ-বাহিনী আর অবরোধের আধুনিক যন্ত্রপাতি—মুসলমানদের সুবিধা ছিল, তাদের এক নেতৃত্ব। শেষ পর্যন্ত কেল্লার পতন হয়।

দুটি শর্তে কেল্লা আত্মসমর্পণ করে ঃ পয়লা শর্ত— ২ লক্ষ দিনারের বদলে কেল্লার সমস্ত সৈন্যকে ছেড়ে দেওয়া হবে; দ্বিতীয় শর্ত—পবিত্র ক্রুস খৃস্টানদের ফেরত দেওয়া হবে। এক মাসের মধ্যেও মুক্তি-মূল্য আদায় না হওয়ায় রিচার্ডের আদেশে সাতাইশ শ' বন্দীকে হত্যা করা হয়। সালাহ্উদ্দীন যখন জেরুজালেম জয় করেন, তখন সেখানকার বন্দীদের প্রতি তাঁর যে ব্যবহার, তার সঙ্গে রিচার্ডের এ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কি শোচনীয় পার্থক্য! তিনিও বন্দীদের কাছে মুক্তি-মূল্য চেয়েছিলেন। কয়েক হাজার গরীব তাদের মুক্তি-মূল্য দিতে অসমর্থ হয়। সালাহ্উদ্দীনের ভাইয়ের সুপারিশে তিনি এদের এক হাজার জনকে ছেড়ে দেন। প্রধান পুরোহিতের অনুরোধে আরো একদলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর সুলতান ভাবেন—'ভাই আর পুরোহিত তো তাদের কর্তব্য পালন করলেন, এখন আমাকেও তো কিছু করতে হয়।' তখন তিনি নারী ও শিশু-সহ বহু বন্দীকে বিনা মূল্যে আযাদী দিয়ে দেন।

জেরুজালেমের নেতৃত্ব এখন থেকে এস্তুকারে কেন্দ্রীভূত হয় এবং দুই প্রতিদ্বন্দী যোদ্ধাদলের মধ্যে শান্তির জন্য অনবরত প্রস্তাব চলতে থাকে। রিচার্ডের মন রোমাঞ্চকর কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সালাহ্উদ্দীনের ভাইয়ের সঙ্গে তার বোনের বিয়ের প্রস্তাব করলেন—তারপর বিয়ের যৌতুক স্বরূপ নব দম্পতিকে জেরুজালেম উপহার দানের কথা ঘোষণা করলেন। এইভাবে তিনি খৃস্টান ও মুসলমানদের এ যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পথ প্রশস্ত করতে চাইলেন। ১১৯২ সালের ২৯ মে তিনি তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে পরিপূর্ণ উৎসবের মধ্যে নাইটের

মর্যদায় ভূষিত করেন। অবশেষে ১১৯২ সালের ২ ডিসেম্বর এই শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, উপকূলের শহরগুলি ল্যাটিনদের হাতে থাকবে, আর ভিতরের সমস্ত এলাকা থাকবে মুসলমানদের হাতে এবং পবিত্র শহরের তীর্থযাত্রিগণের উপর কোন রকম জুলুম করা হবে না। সালাহ্উদ্দীন বেশীদিন এ শান্তি ভোগ করতে পারেন নাই। ১১৯৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী দামেস্কে তাঁর জ্বর হয় এবং এর বারো দিন পর পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। উমাইয়া মসজিদের পার্শ্বে এক অনাড়ম্বর সমাধি শয্যায় তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তিনি কেবল একজন যোদ্ধা ও সুন্নি আদর্শের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না; তিনি আরো কিছু ছিলেন। তিনি বিদ্বানদের সাহায্য করেন, ধর্ম-শাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ দেন, অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ , খাল খনন, মাদ্রাসা ও মসজিদ তৈরী করেন। তাঁর স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে কায়রোর কেল্লা আজো টিকে আছে। ১১৮৩ সালে তিনি এই কেল্লা ও শহরের দেয়াল নির্মাণ শুরু করেন এবং এ কাজে তিনি ছোট ছোট পিরামিডের পাথর ব্যবহার করেন। তাঁর স্বধর্মীদের মধ্যে হারুণ ও বায়বার্স-এর উপরে তাঁর স্থান। ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ডে তিনি চারণ ও ঔপন্যাসিকদের কল্পনা বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেন এবং এখনো তাঁকে আদর্শ নাইট হিসেবে গণ্য করা হয়।

এরপর একশ বছর পর্যন্ত মাঝে মাঝেই লড়াই চলতে থাকে; কিন্তু তার ফলে কোন পক্ষেরই কোন সুনির্দিষ্ট লাভ হয় নাই। ল্যাটিনরা মোটামুটি তাদের অধিকার রক্ষা করে চলে। ইতিমধ্য ফ্রান্সের নবম লুই ও তাঁর বীর যোদ্ধারা ষষ্ঠ ক্রুসেড শুরু করেন। ইতিহাসে এ রাজা সাধু লুই নামে বিখ্যাত। ইনি ১২৪৯ সালে মিসরের অন্তর্গত দিমিয়াত শহর দখল করেন। এরপর তাঁর সৈন্যরা এক জলাভূমির ভিতর দিয়ে কায়রো অভিমুখে মার্চ করতে শুরু করে। তখন নীলনদে পূর্ণ বর্ষা; জলাভূমিতেও বহু আঁকাবাঁকা খাল ছিল। এই অবস্থায় লুইয়ের সৈন্যদলে বিষম মড়ক দেখা দেয়। সৈন্যদের যাতায়াতের পথ একদম বন্ধ করে দেওয়া হয়; সমস্ত সৈন্যদল ধ্বংস হয়ে যায়; রাজা লুই তাঁর অধিকাংশ আমীর-রইসসহ বন্দী হন। একমাস কারাগারে থাকার পর উপযুক্ত মুক্তি-মূল্য ও দিমিয়াত ফেরত দেবার শর্তে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ১২৭০ সালে লুই তিউনিসে আর একটি ক্রুসেডীয় বাহিনী নিয়ে অভিযান করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ক্রুসেডকারী সমস্ত নেতার মধ্যে তাঁর চরিত্র মহত্তম ছিল।

এই সময় মিসরের মামলুক দাস-বংশে বায়বার্স নামে এক অসম সাহসী যোদ্ধার আবির্ভাব হয়। তিনি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসক বংশ ক্রুসেডারদের উপর চরম আঘাত হানেন। ১২৬৩ সালে বায়বার্স করক অধিকার করে নাজারেথের গীর্জা ভূমিসাৎ করেন। তাঁর দুর্বার আক্রমণের ফলে সিজারীয়া, জাফফা ও

এনটিয়কের পতন ঘটে। এনটিয়কের কেল্লায় ১৬ হাজার সৈন্য ছিল; তাদের হত্যা করা হয় এবং ১ লক্ষ নর-নারী বালক-বৃদ্ধকে বন্দী করে বাজারে গোলাম রূপে বিক্রি করা হয়। লুণ্ঠনের জিনিস ভাগ করার সময় মুদ্রা পেয়ালায় ওজন করা হয়। এ ক্ষয়-ক্ষতির ফলে এনটিয়ক আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নাই।

বায়বার্সের উত্তরাধিকারীদের আমলে একার অবরুদ্ধ হয়; বিরানব্বুইটি অবরোধ-স্তম্ভ হতে দুর্গ প্রাকারের উপর প্রস্তর-বর্ষণ হতে থাকে এবং ১২৯১ সালে এর দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়। এর টেম্পলার রক্ষীরা নিহত হয়। মুসলিম বাহিনী সেই বছরই টায়ার, সিডন, বৈরুত এবং আন্তাতাস দখল করে। ক্রুসেডারগণ বিতাড়িত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইরূপে সিরিয়ার ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

ক্রুসেড উপলক্ষে বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় এর ঐতিহাসিক মূল্য অতিরঞ্জিত হয়েছে। প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য জগত এর দ্বারা অনেক বেশী উপকৃত হয়; সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চেয়ে চারু-কলা, শিল্প ও বাণিজ্য-সভ্যতার বিস্তার ঘটে। এরই সঙ্গে ক্রুসেডাররা সিরিয়ায় রেখে আসে নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংসের লীলা এবং সমগ্র নিকট প্রাচ্যময় ছড়িয়ে আসে খৃস্টান মুসলমানের মধ্যে এক বিষময় বিদ্বেষ। আজো সে বিদ্বেষের চিহ্ন মুছে যায় নাই।

ক্রুসেডের যুগের আগেই প্রাচ্যের মুসলিম তমদ্দুনে ভাটা শুরু হয়। দর্শন, চিকিৎসা, সঙ্গীত ও অন্যান্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের মশাল তখন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সিরিয়া ইসলাম ও পাশ্চাত্য খৃস্টান ধর্মের সাক্ষাৎ-কেন্দ্র ছিল। কিন্তু অতঃপর প্রধানতঃ প্রাচ্য ইসলামের সাংস্কৃতিক অবনতির জন্যই সিরিয়া আরব প্রভাব বিস্তারের কাজে স্পেন, সিসিলী, উত্তর সিসিলী, উত্তর আফ্রিকা, এমনকি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেরও পেছনে পড়ে যায়। একথা সত্য যে, ক্রুসেডারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ মারফত সিরিয়ায় ইসলাম পাশ্চাত্য খৃস্টান ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে; আর সেই প্রভাব সমগ্র পাশ্চাত্যের উপর আংশিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাণিজ্য-পথ ধরেও এ প্রভাব পাশ্চাত্যের বুকে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তবে সিরিয়া ক্রুসেডারদের উপর যে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে, তা নগণ্য। অন্যদিকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ক্রুসেডারদের সাংস্কৃতিক মান আক্রান্ত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মানের চেয়ে নিম্নতর ছিল। ক্রুসেডারদের মধ্যে বহু দেশের বহু রকমের মানুষ এসে এলোমেলোভাবে জমা হয়। তারা দেশের অভ্যন্তরে কেল্লায় কেল্লায় বাস করে ও প্রধানতঃ স্থানীয় কৃষক ও কারিগরদের সংস্রবে আসে; বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্যে আসার সুযোগ তারা পায় না। এর উপর

ছিল জাতি ও ধর্মগত কুসংস্কার; তার ফলে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত জাতিসমূহের মধ্যে ভাবের যথেষ্ট আদান-প্রদান হতে পারে নাই। ফিরিঙ্গীদের পক্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে স্থানীয় লোকদের কিছুই শিক্ষা দিবার ছিল না। সমসাময়িক আরব ঐতিহাসিকরা ফিরিঙ্গীদের চিকিৎসা-জ্ঞান সম্বন্ধে হাস্যকর উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করে; তারা বিদ্রূপের ভাষায় এ কথাও উল্লেখ করে যে, 'ফিরিঙ্গীদের আইন-শাস্ত্র অদ্ভুত, তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও পানির সাহায্যে অপরাধ নির্ণয় করে।'

দ্বাদশ শতাব্দী হতে সমগ্র ইউরোপে আমরা মুসাফিরখানা ও হাসপাতাল—বিশেষ করে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হচ্ছে দেখতে পাই। স্পষ্টতঃই নিয়মিত হাসপাতাল স্থাপন মুসলিম-প্রাচ্যের প্রভাবেরই ফল। মুসলমানদের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই ইউরোপে সরকারী গোসলখানা প্রবর্তিত হয়। এক সময়ে রোমকরা এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং খৃস্টানরা বিরোধিতা করত।

সাহিত্যে ক্রুসেড ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। 'পবিত্র মধ্যপাত্র' বিষয়ক উপকথায় নিঃসন্দেহ রকমে সিরিয় উপাদান বিদ্যমান আছে। ক্রুসেডারগণ নিশ্চয়ই 'বিদপাই' ও আরব উপন্যাসের কাহিনী শুনে তা তাদের দেশে নিয়ে যায়। চসারের 'স্কোয়ারের কাহিনী' আসলে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী বিশেষ। বোকাশিয়ো মুখে মুখে প্রাচ্য কাহিনী শুনে তা তাঁর 'ডেকামিরন' নামক গ্রন্থের শামিল করেন। আরবী ও অন্যান্য ইসলামী ভাষা অনুশীলনে উৎসাহ বৃদ্ধিও ক্রুসেডারদেরই প্রভাবের ফল।

যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে ক্রুসেডের প্রভাব আরো সুস্পষ্ট। যুদ্ধে ঘোড়া, গায় ভারী জেরা ও বর্মের নীচে তুলার গদী ব্যবহার—এসব ক্রুসেডেরই প্রত্যক্ষ অবদান। সিরিয়ায় ফিরিঙ্গীরা যুদ্ধের বাজনায় মৃদঙ্গ ও দামামা ব্যবহার শুরু করে; আগে তারা কেবল শিঙ্গা ও তুর্য ব্যবহার করত। যুদ্ধের খবর আদান-প্রদানের কাজে কবুতর ব্যবহার ক্রুসেডাররা আরবদের নিকট শিক্ষা করে। আরবদের নিকট হতেই তারা বিজয় উৎসবে আলোক-সজ্জা ও টুরনামেন্ট নামক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, শিভালরী প্রতিষ্ঠানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য সিরিয়াতেই গড়ে ওঠে। মুসলিম-যোদ্ধাদের সংস্পর্শের ফলেই ইউরোপে সমরাস্ত্র ও অভিনব সামরিক পরিচ্ছেদের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ক্রুসেডাররা অবরোধ সংক্রান্ত কায়দা-কানুনের অনেক উন্নতি বিধান করে। নানা রকম বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহার তাদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। বারুদ চীন দেশে আবিষ্কৃত হয় বলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তবে সেখানে ইহা কেবল আগুন জ্বালানোর কাজেই ব্যবহৃত হতে থাকে। মঙ্গোলরা বারুদ চীন হতে নিয়ে

ইউরোপে প্রবর্তন করে। বারুদের সাধারণ ব্যবহার হতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ইউরোপে আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবন হয়। ইউরোপ ভূখণ্ডে মার্ক নামক একজন গ্রীকের ১৩০০ সালের কাছাকাছি লিখিত একখানি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সর্বপ্রথম বারুদ প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনা পাওয়া যায়; বেকনের বারুদ তৈরীর বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের চেয়ে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য জগতে ক্রুসেড অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। ক্রুসেডের মারফতই পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে নতুন নতুন শস্য ও ফল গাছের আবাদ প্রসার লাভ করে। এ গুলির মধ্যে তিল, জোয়ার, ধান, লেবু, তরমুজ, খুবানী, গন্ধ-পিঁয়াজ প্রভৃতি অন্যতম। লেমন (লেবু) শব্দের মূল আরবী 'লেমুন'; শেলট অথবা স্কেলিয়ন (গন্ধ-পিঁয়াজ) শব্দের মূল মানে ছিল এস্কালনের পিঁয়াজ। এ শব্দের উদ্ভব স্থান ফিলিস্তিন। বহুকাল পর্যন্ত খুবানীকে দামেস্কের আলুবোখারা বলা হত।

সিরিয়ার বাজার গন্ধদ্রব্য, মসলা, মিঠাই এবং আরব ও ভারতের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যে ভরপুর থাকত। প্রাচ্য দেশে অবস্থানকালে ফিরিঙ্গীরা এইসব দ্রব্যের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তাদের এই রুচি ইটালী ও ভূমধ্যসাগরীয় শহরগুলির বাণিজের পৃষ্ঠপোষকতা করে। আরবের ধূপ-ধুনা, দামেস্কের গোলাব, গন্ধ-দ্রব্য বহু রকমের সুগন্ধ তেল এবং পারস্যের আতর সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। ফিটকিরির সঙ্গেও এই সময় পাশ্চাত্য-জগত পরিচিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে লবণ ও গোল মরিচ জাতীয় সুগন্ধি মসলা প্রবর্তিত হয়। এই সময় হতে পাশ্চাত্য জগতে মসলাওয়ালা রান্না ছাড়া ভোজনের কোন আয়োজনই পূর্ণ বিবেচিত হত না।

ক্রুসেডাররা তাদের রান্নায় আদা (জিঞ্জার—আরবী শব্দ) খেতে শিখে মিসরে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল চিনি (সুগার—আরবী শাককর) খাওয়া শিক্ষা। এ যাবতকাল পর্যন্ত ইউরোপীয়রা তাদের খাদ্যবস্তু মিষ্টি করার জন্য মধু ব্যবহার করত। লেবানন ও সিরিয়ার উপকূলবর্তী স্থানে এখনো বালক-বালিকাদের আখ চিবাতে দেখা যায়। এইখানেই ক্রুসেডাররা আখের সঙ্গে পরিচিত হয়। তারপর হতেই আখ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও চিকিৎসা-ব্যবস্থায় কি গুরুত্বপূর্ণ স্থানই না অধিকার করে আসছে। পাশ্চাত্য জগতে প্রবর্তিত বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে চিনিই প্রথম এবং তারা আর কোন কিছু খেয়েই এত মজা পায় না। চিনির সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে যায় শরবত, গোলাব পানি, নানারকম ফুল, সমস্ত রকম মিছরী (ক্যান্ডী—আরবী শব্দ হতে উদ্ভূত) এবং মিঠাই। মসলীন, দেমাস্ক, আতলাস ও সাটিন প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যে আরব-প্রাচ্য হতে আমদানী হয়, এসবের নামেই তার পরিচয় মিলে।

প্রাচ্যের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ইউরোপীয় বাজারের সৃষ্টি এবং তীর্থযাত্রী ও ক্রুসেডারদের চলাচলের প্রয়োজনের তাগিদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত প্রসার লাভ করে যে, রোমক শাসনের পর অমন আর দেখা যায় নাই। সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে এবং ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে মার্সাই ইটালীর সিটি রিপাবলিকগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে। নতুন পরিস্থিতির আর্থিক তাগিদে মুদ্রার ব্যাপকভাবে উৎপাদন ও দ্রুততর প্রবহনের প্রয়োজন হয়। এ কারণেই এরকম ক্রেডিট নোটের উদ্ভাবন হয়। জেনোয়া ও পিসায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং লেভান্টে খোলা হয় তার শাখা। টেম্পলাররা হুণ্ডীর কারবার শুরু করে।

ক্রুসেড উপলক্ষে দ্রুত ও ব্যাপকতর জাহাজ-চলাচলের প্রয়োজন হতে কম্পাসের আবিষ্কার ঘটে। চুম্বক কাঁটার দিক নির্ণয়ক গুণ সম্বন্ধে বোধহয় প্রথম অবহিত হয় চীন দেশ। কিন্তু মুসলমানরা বহু আগে পারস্য উপসাগর ও দূর প্রাচ্যের সমুদ্রসমূহের মধ্যে বাণিজ্য করত এবং সেই সময়ই তারা জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে চুম্বক কাঁটার যথাযথ প্রয়োগ শুরু করে। তারপর তারা তাদের এই আবিষ্কার ইউরোপে পাঠিয়ে দেয়।

এই যুগে সামগ্রিকভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যে সংকোচন শুরু হয় আর মুসলিম মানসে স্থবিরতা দেখা দেয়। আর ঠিক এসময়ই আকস্মিকভাবে সম্প্রসারিত জগতের প্রতি ইউরোপীয়দের দৃষ্টি প্রসারিত হতে শুরু করে। মুসলমানদের এই সাম্রাজ্যের অবসানের আগে সিরীয়-মিসরীয় মামলুক বংশ তার পুনরুজ্জীবনের জন্য শেষ চেষ্টা করে।

শেষ শাসক বংশ

মধ্যযুগীয় আরব-জগতের সর্বশেষ বংশ মামলুকরা সবদিক থেকে অসাধারণ ছিল। মুসলিম-ইতিহাসে ছাড়া এমন একটি জাতির উত্থান ও প্রসার কল্পনার অতীত ছিল বলেই মনে হয়। মামলুক শব্দের মানে 'অধিকৃত।' মামলুকরা দাস বংশীয় লোক ছিল ঃ বহু গোষ্ঠীর, বহু জাতির বহু গোলাম পরদেশে এসে এক সম্মিলিত সামরিক শাসক-শক্তি গড়ে তোলে। বহু শতাব্দী হতে আরব সমাজ-জীবনে যে অনাচার অব্যাহত গতিতে চলে আসছিল, এদের সৃষ্টি তারই অনিবার্য ফল। কিন্তু এরা কীর্তিমান লোক ছিল এবং বিলীয়মান আরব সাম্রাজ্যের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে স্থান পাওয়ার এরা যথার্থ অধিকারী।

মামলুকরা তাদের সিরীয়-মিসরীয় রাজ্য হতে বাকী ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করে। তারা হালাকু ও তৈমুরের দুর্দান্ত লুণ্ঠনপ্রবণ অনুচরদের অগ্রগমন চিরদিনের তরে রুদ্ধ করে দেয়; নইলে মঙ্গোলরা সমগ্র মিসর ও পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রবাহ-পথ সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দিতে পারত। সিরিয়া ও ইরাকের উপর যে ধ্বংসের প্লাবন নেমে আসে, এদেরই জন্য মিসর সে প্লাবনের হাত হতে বেঁচে যায় এবং আরবের বাইরে সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের ব্যাপারে যে নিরবচ্ছিন্নতা আর কোন রাজ্য ভোগ করে নাই, মিসর তা-ই ভোগ করে। প্রায় পৌণে তিন শতাব্দী (১২৫০—১৫১৭) পর্যন্ত মামলুকরা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক অশান্ত একটা এলাকার উপর আধিপত্য করে এবং সব সময়েই নিজেদের গোষ্ঠিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। সত্য বটে, তারা মোটামুটি রক্তপিপাসু ছিল, তথাপি চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের প্রসারে তাদের অবদান যেকোন সভ্য বংশের পক্ষে গৌরবের কথা হতে পারত। তাদেরই জন্য আজো মুসলিম জগতের মধ্যে সৌন্দর্য নিকেতন হিসেবে কায়রো একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অবশেষে ১৫১৭ সালে ওসমানীয় বংশের সলীম তাদের উৎখাত করলে আরব খিলাফতের ধ্বংস্তূপ হতে উত্থিত বংশাবলীর শেষ বংশের দীপ নিভে গেল—আর পথ খোলাসা হয়ে গেল এক অনারব খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য। এরা ওসমানীয় তুর্ক।

মামলুক সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃতপক্ষে সে বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বায়বার্স। মিসর-শাসক এই ক্ষুদ্র বংশ বাগদাদের

খলীফাদের অনুসরণে বিদেশী গোলাম এনে নিজেদের দেহরক্ষী নিযুক্ত করে এবং এর ফলও-পরিণামে একই হয়। মনিবের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, অধিকতর কর্মঠ গোলামেরা সেনাপতি হয় এবং এরপর তারা দখল করে সুলতানের সিংহাসন। বায়বার্স আসলে এক তুর্ক গোলাম ছিলেন। পদোন্নতি হওয়ার পর সুলতানের দেহরক্ষীদের এক দলের নেতা হন। তারপর সেই পদে কাজ করে শেষ পর্যন্ত মিসরে সর্বোচ্চ পদ অধিকার করেন। অবশ্য ও পদে উন্নীত হতে তাঁকে অনেক শক্তি প্রয়োগ, অনেক খুন-খারাবী করতে হয়; তবে পতনমান আরব সাম্রাজ্যে প্রতিভার সামনে যে পথ খোলা, তিনি তা-ই গ্রহণ করেন। এই মামলুক বংশে উত্তরাধিকারের কোন নীতি ছিল না; অমন নীতি আছে বলে কোন দাবীও ছিল না। সর্বাপেক্ষা যে শক্তিশালী, সে-ই টিকে যেত; কিন্তু প্রায় তিনশ' বছর ধরেই এই শক্তিশালীরা হয় গোলাম, না হয় গোলামের বংশধর ছিল। বায়বার্স নিজে ছিলেন লম্বা, গায়ের রঙে কালো, গলার আওয়াজে শক্তিমান—সাহসী, কর্মঠ—নেতৃত্বের প্রকৃত গুণের অধিকারী।

ফিলিস্তিনে মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি প্রথম যশ অর্জন করেন; কিন্তু তাঁর আসল যশ প্রধানতঃ নির্ভর করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের উপর। আমরা আগেই বলেছি, এই সব অভিযানই ফিরিঙ্গী দুশমনদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে নেয়। ইতিমধ্যে তাঁর সেনাপতিরা তাঁর আধিপত্য পশ্চিমে বার্‌বার এলাকা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে নুবীয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এইরূপে এ দুটি ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে মিসরের সুলতানের অধীনে আসে।

সামরিক নেতা ছাড়া বায়বার্সের আরো অনেক কৃতিত্ব ছিল। তিনি কেবল যে সৈন্যদল সংগঠন করেন, নৌবাহিনী পুনর্গঠিত করেন এবং সিরিয়ার দুর্গমালা দৃঢ়তর করেন এমন নয়, উপরন্তু তিনি বহু খাল কাটেন, বন্দরসমূহেরও উন্নতি সাধন করেন এবং কায়রো ও দামেস্কের মধ্যে দ্রুতগামী ঘোড়ার ডাক বসান। ফলে মাত্র চারদিনের মধ্যেই ডাক চলাচল করতে পারত। প্রত্যেক মঞ্জিলে ডাক বদলানোর জন্য ঘোড়া তৈরী থাকত। সুলতান একই সপ্তাহে উভয় রাজধানীতে পলো খেলতে পারতেন। সাধারণ ডাক ছাড়া মামলুকরা কবুতরের বংশ পরিচয় পাকা খাতায় লেখা থাকত। বায়বার্স জনহিতকর কাজে উৎসাহ দেন, মসজিদের সৌন্দর্য বিধান করেন এবং ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর কীর্তিসমূহের মধ্যে তাঁর নামীয় বিরাট মসজিদ ও মাদ্রাসা উভয়ই বেঁচে আছে। নেপোলিয়ন মসজিদটিকে দুর্গে পরিণত করেন এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ সৈন্যরা এতে রসদ-সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। মিসরে সুলতানদের মধ্যে বায়বার্সই প্রথম চার মাজহাবের জন্য চারজন হাকিম নিযুক্ত করেন এবং মিসরীয় হজযাত্রীদের জন্য স্থায়ী এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ধর্মে তাঁর

অটল বিশ্বাস ও উৎসাহ এবং জেহাদে তিনি ইসলামের যে গৌরব ফিরিয়ে আনেন, উভয় মিলে তাঁকে হারুনর রশীদের সমতুল্য করে তোলে। উপকাহিনীতে সালাহ্উদ্দীনের চেয়েও উচ্চতর কীর্তির অধিকারী হিসেবে তাঁকে বর্ণিত করা হয়। তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর বিচিত্র কাহিনী এবং প্রাক-ইসলামী আন্‌তার আখ্যান আর-প্রাচ্যে আজো আরব্য-উপন্যাসের চেয়ে অধিকতর লোকপ্রিয়।

মঙ্গোল ও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন তাঁর শাসনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। সুলতান হওয়ার পরই তিনি ভল্গা উপত্যাকার মঙ্গোলদের প্রধান খানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। আনজু'র চার্লস, সিসিলীর রাজা, আরাগনের জেমস্ ও সেভিলের আলফন্‌সো'র সঙ্গে তিনি বাণিজ্যিক সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন।

বায়বার্সের রাজত্বের একটি অভিনব দিক ছিল, তাঁর পক্ষ হতে কয়েকজন আব্বাসীয় খলীফা নির্বাচন। এঁরা নামে মাত্র খালীফা ছিলেন—কিন্তু খলীফা পদের ক্ষমতা তাঁদের কিছুই ছিল না। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে সত্যিকার সুলতান বলে স্বীকার করে নেওয়া, লোক-চক্ষে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিভাত করা এবং শীয়াদের ষড়যন্ত্র পথে বাধা জন্মানো। কারণ, ফাতেমীয় খলীফাদের আমল হতে মিসরে এদের ষড়যন্ত্রের আর অন্ত ছিল না। শেষ আব্বাসীয় খলীফার এক পিতৃব্য বাগদাদের ধ্বংসানুষ্ঠান হতে রেহাই পেয়েছিলেন। ১২৬১ সালের জুন মাসে বায়বার্স এঁকে দামেস্ক হতে আসতে দাওয়াত করে পাঠান এবং মহাধূমধামে তাঁকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করেন। পেনশন-ভোগী ভাবী খলীফাকে দামেস্ক হতে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে আনয়ন করা হয়; এমনকি খৃষ্টান পুরোহিতগণ বাইবেল ও ইহুদী পুরোহিতগণ তৌরাত উঁচু করে ধরে সঙ্গে আসে এবং আইনজ্ঞ আলিমরা অনুসন্ধান করে ভাবী-খলীফার খান্দান সম্বন্ধে অনুকূল সনদ দেন। প্রতিদানে ক্রীড়ানক খলীফা যথারীতি সুলতানকে মিসর, সিরিয়া, হেজাজ, ইয়ামন ও ইউফ্রেতীস অঞ্চলের উপর শাসন-কর্তৃত্ব দান করেন। এর তিন মাস পর বায়বার্স তাঁর খলীফাকে বাগদাদে গদীনশীন করার উদ্দেশ্যে কায়রো হতে বের হন; কিন্তু দামেস্কে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর খলীফাকে বাগদাদ অভিযানের ব্যাপারে তাঁর অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেন। বাগদাদের মঙ্গোল গভর্নর হতভাগ্য খলীফাকে মরুভূমিতে আক্রমণ করে। তারপর সে খলীফার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একের পর এক এমনি নামকাওয়াস্তে খলীফা আড়াইশ' বছর পর্যন্ত খলীফার গদীতে বসেন। দেশের মুদ্রায় তাঁদের নাম থাকত আর মিসর ও সিরিয়ার জুমার খোত্‌বায় তাঁদের নাম উল্লিখিত হত; এতেই তাঁরা তুষ্ট থাকতেন। ১৫১৭ সালে ওসমানীয় বংশের সুলতান সলীম যখন মামলুকদের হাত হতে মিসর কেড়ে নেন, তখন তিনি এ বংশের শেষ খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

যে গর্বিত বিজয়-দৃপ্ত শাসকেরা সিরিয়া হতে ফিরিঙ্গী আধিপত্যের নাম-নিশানা মুছে ফেলেন এবং সাফল্যের সঙ্গে মঙ্গোল প্লাবনের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ান, তাঁদেরই অধীনে মিসরের ইতিহাস শুরু হয়। যুগের শেষ ভাগে সামরিক চক্রের শাসন, প্রবল সম্প্রদায়সূহের মধ্যে কলহ, গুরু কর-ভার, ধন-প্রাণের নিরাপত্তার অভাব, ঘন ঘন প্লেগ, দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহ—সমস্ত মিলে মিসর ও সিরিয়ার সর্বনাশ সাধনের বেশি কিছু বাকী ছিল না। নীলনদের উপত্যকায় কুসংস্কার ও ভোজবাজি বিশেষ রকমে প্রবল ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া ধর্ম-মতও জয়লাভ করে। এই অবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন উচ্চ-শ্রেণীর সাধনাই সম্ভবপর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, অষ্টম শতাব্দী হতে আরব জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তা হারিয়ে ফেলে। সর্বত্রই এ দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অনেক যুগব্যাপী কঠোর সাধনা এবং প্রভুত্ব সম্পদ জাত নৈতিক অধঃপতন মনে ক্লান্তির সঞ্চার করেছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের পর আরবরা বিজ্ঞানের মাত্র দুটি শাখায় তাদের পূর্ব নেতৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় : গ্রহ-বিজ্ঞান, গণিত (ট্রিগনোমেট্রী বা ত্রিকোণমিতি সহ) এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র—বিশেষ করে চক্ষু-চিকিৎসা বিজ্ঞান। চিকিৎসা জগতে এ যুগে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইবনুল নাফিস। ইনি দামেস্কে অধ্যয়ন. করেন এবং কায়রোর একটি হাসপাতালে দীর্ঘকাল প্রধান চিকিৎসকের কাজ করে ১২৮৯ সালে দামেস্কেই ইন্তিকাল করেন। দেহে রক্ত চলাচল পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় পর্তুগীজ পণ্ডিত সার্ভেটাসকে; কিন্তু তাঁর তিনশ' বছর আগে ইবনুল নাফিস এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আমরা এখন যাকে যৌন-সাহিত্য বলি, এ যুগে এই শ্রেণীর প্রচুর পুস্তক লিখিত হয়। আরবী সাহিত্য বরাবরই প্রধানতঃ পুরুষের সাহিত্য; এ সাহিত্যে এমন অজস্র উপাখ্যান, ব্যঙ্গ এবং মন্তব্য আছে, যা আজকে আমাদের কানে অশ্লীল শোনায়।

মামলুকরা প্রায়শঃ খুন-খারাবীতে লিপ্ত থাকত; অথচ সত্যি এ এক অপূর্ব বিস্ময়, তাদের আমলে যে উচ্চাঙ্গের চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্প প্রভূত পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, টলেমীয় ও ফেরাউনীয় যুগের পর মিসরের ইতিহাসে তার আর তুলনা নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে মসুল, বাগদাদ ও দামেস্ক হতে বহু মুসলমান শিল্পী ও কারিগর মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের সংস্পর্শে মামলুক স্থাপত্য রীতি সিরীয়-ইরাক আদর্শ নবভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ক্রুসেড শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার উত্তরে পাথর নির্মিত ইমারতের প্রাধান্য লাভের সুযোগ ঘটে এবং গম্বুজ তৈরীর কাজে ইটের বদলে পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। হাল্কা গম্বুজ অপূর্ব সাজে সজ্জিত হতে থাকে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন ও বিচিত্র বর্ণে পাথর সাজিয়ে দালান-কোঠার সৌন্দর্য বর্ধন এ যুগের এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। স্থাপত্য শিল্পে

জ্যামিতিক রেখা ও কুফী হরফের আলঙ্কারিক প্রয়োগ এ সময় বিশেষ বিকাশ লাভ করে। (মুসলমানদের সকল যুগেই স্পেন ও পারস্যের তুলনায় মিসর ও সিরিয়ায় জীব-জন্তুর চিত্র কম ব্যবহৃত হয়েছে।) সুখের বিষয়, মামলুক স্থাপত্য-রীতির প্রকৃষ্টতম নমুনা আজো টিকে আছে এবং পণ্ডিত ও ভ্রমণকারী উভয়ের জন্যই সে নমুনা এক পরম আকর্ষণের বস্তু।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে মামলুকদের কাহিনী সিরীয়-মিসরীয় ইতিহাসের শোচনীয়তম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সুলতানদের কয়েকজন ছিলেন বিশ্বাসঘাতক ও রক্তপিপাসু; কয়েকজন ছিলেন অকর্মন্য—অধঃপতিত, আর বেশির ভাগই ছিলেন অমার্জিত। ১৪১২ হতে ১৪২১ সাল পর্যন্ত সুলতান ছিল মাতাল। তাঁকে এক সার্কেশীয়ার ব্যবসায়ীর নিকট হতে খরিদ করা হয়েছিল। ইনি কতকগুলি চরম দুর্নীতির কাজ করেন। অন্য এক সুলতান আরবী ভাষা জানতেন না। তিনি তাঁর এক কঠিন ব্যারাম ভাল না করতে পারার জন্য তাঁর দুই জন চিকিৎসকের শিরচ্ছেদ করেন। ১৪৫৩ সালে যিনি রাজত্ব করেন, তিনি লিখতেও জানতেন না—পড়তেও জানতেন না। সরকারী দলীল-পত্রে তাঁর সেক্রেটারী তাঁর নাম লিখে দিত; তিনি তার উপর হাত ঘুরাতেন। তাঁর চরিত্রগত জঘন্য দোষের কথা বলাবলি হত। আব্বাসীয়দের কুখ্যাত গিল্‌মান প্রথা মামলুকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এক খলিফা কেবল নিরক্ষর ছিলেন না, পাগলও ছিলেন। আর এক খলীফা (যাঁকে পঞ্চাশ দিনার দামে খরিদ করা হয়েছিল) এক আলকিমিয়াবিদ্‌ বাজে ধাতুকে সোনা করে দিতে পারে নাই বলে তার চোখ তুলে এবং জিভ কেটে ফেলেন।

সুলতানদের স্বার্থ-প্রণোদিত নীতির ফলে দেশের আর্থিত অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। যেমন এক সুলতান পাক-ভারত হতে মসলা আমদানী বন্ধ করে দেন; তারপর বাজারের সমস্ত মসলা নিজে সস্তা দরে কিনে তাঁর প্রজাদের মধ্যেই চড়া দরে বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হন। তিনি চিনির একচেটিয়া ব্যবসায় শুরু কনে এবং অতিরিক্ত লাভের আশায় কিছুকাল আখের আবাদ পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। তাঁর আমলে মিসর ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এক ভয়াবহ প্লেগ দেখা দেয়। এই ব্যারামের ঔষধের জন্য চিনির প্রচুর চাহিদা হয়। 'কালো মৃত্যুর' মত সর্বগ্রাসী না হলেও এ প্লেগে তিন মাসের মধ্যেই নাকি এক রাজধানীতেই তিন লক্ষ লোক মারা যায়। মানুষের পাপের জন্য এ প্লেগের আবির্ভাব ঘটেছে —এই মনে করে তিনি মেয়েদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন এবং খৃস্টান ও ইহুদীদের উপর নতুন কর বসিয়ে কাফ্‌ফারা আদায়ের চেষ্টা করেন।

রাজ-শোষণ কেবল অমুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কর ধার্যের কোন বিধিবদ্ধ নীতি না থাকায় সুলতানরা তাঁদের অভিযান, জমকালো দরবারের

অতিরিক্ত খরচ এবং বড় বড় স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ প্রভৃতির জন্য প্রজাপুঞ্জের নিকট হতে জোর-জুলুম করে টাকা আদায় করতেন আর সেই সব সরকারী আমলাদের কাছ থেকেও অর্থ আদায় করা হত, যারা প্রজাদের শোষণ করে স্ফীত হয়েছে। মরুর লণ্ঠনপরায়ণ বেদুঈনরা মাঝে মাঝে নীল উপত্যাকার কৃষকদের উপর হানা দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করত। প্লেগের মত মাঝে মাঝে পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব হত। দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব প্রায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় এবং নীলনদে বান কম হওয়ার দরুন প্লেগ ও জলাভাব দেখ দিলে দুর্ভিক্ষ রুদ্র মূর্তি ধারণ করত। হিসেবে দেখা যায়, মামলুকদের যুগে মিসর ও সিরিয়ায় তিন ভাগের দুই ভাগ লোক কমে যায়।

এ যুগের শেষভাগে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার দেশের দারিদ্র্য ও দুঃখ বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। ১৪৯৭ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে পাক-ভারতে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করেন। সিরীয়-মিসর সাম্রাজ্যের পক্ষে এ ছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর হতে কেবল যে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে মুসলমানদের জাহাজ পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নৌবাহিনী কর্তৃক ঘন ঘন আক্রান্ত হতে থাকে এমন নয়, আস্তে আস্তে পাক-ভারত ও আরবে উৎপন্ন মসলা ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়ের বেশীর ভাগেরই সিরিয়া ও মিসরের বন্দরে চালান বন্ধ হয়ে যায়। এইরূপে জাতীয় সম্পদের একটা বড় উৎস চিরতরে শুষ্ক হয়ে পড়ে।

মামলুকরা অত্যাচারী ছিল। কিন্তু তাদের চেয়েও এক বড় বর্বর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিরিয়ার উপর নিপতিত হয়। ১৩৩৬ সালে ট্রান্স অকশিয়ানাতে তৈমুরলংয়ের জন্ম হয়। তাঁর একজন পূর্বপুরুষ চেঙ্গীজ খাঁর পুত্রের উজীর ছিলেন; কিন্তু তৈমুরলংয়ের পরিবার স্বয়ং চেঙ্গীজের বংশধর বলে দাবী করত। একজন লেখক বিদ্রূপ করে বলেন যে, তৈমুর এক রাখালের ছেলে ছিলেন এবং প্রথম বয়সে লুটপাট করে খেতেন। একবার একটি ভেড়া চুরির সময় তিনি পায় আঘাত পেয়ে ন্যাড়ো (লং) হন; এই জন্য তাঁর নাম হয় তৈমুর লং। ১৩৮০ সালে তৈমুর তাঁর তাতার বাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হন এবং আফগানিস্তান, পারস্য, ফারিস ও কুর্দীস্তান দখল করেন। ১৩৯৩ সালে তিনি বাগদাদ অধিকার করেন এবং পর বছর মেসোপটেমিয়া তাঁর পদদলিত হয়। সালাহ্উদ্দীনের জন্মস্থান তাক্‌রিতে। তিনি নিহতদের মাথার খুলি দিয়ে এক পিরামিড নির্মাণ করেন। ১৩৯৫ সালে তিনি ভল্‌গা নদী অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং মস্কো অধিকার করে এক বছর শাসন করেন। তিন বছর পর তিনি উত্তর-ভারত লুণ্ঠন করেন এবং দিল্লীর ৮০ হাজার বাসিন্দাকে হত্যা করেন।

১৪০১ সালে তৈমুর দুরন্ত তুফানের মত সিরিয়ার উত্তর ভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনদিন পর্যন্ত আলেপ্পোকে লুণ্ঠনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

এর ২০ সহস্রাধিক মুসলিম বাসিন্দার মাথা দিয়ে তৈমুর দশ হাত উঁচু ও বিশ হাত পরিধির একটি টিপি তৈরী করেন। টিপিতে মাথাগুলির মুখ বাইরের দিকে ছিল। শহরের স্কুল ও মসজিদের অমূল্য ইমারতসমূহ বিধ্বস্ত করা হয়; আর কখনো এগুলি পুনর্ণির্মিত হয় নাই। ক্রমে হামা, হিমস ও বালাবেকের পতন হয়। মিসরীয় সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে দামেস্ক দখল করা হয়। দামেস্কোর কেল্লা মাসেক কাল শহর রক্ষা করে। তৈমুরের বাহিনী শহর লুটপাট করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তৈমুর নামে মুসলমান ছিলেন। শীয়া মতের দিকে তাঁর সামান্য ঝোঁক ছিল। তিনি আলেমদের ডেকে এক ফতোয়া আদায় করেন যে, তাঁর কাজ শরীয়ত সঙ্গত। উমাইয়া মসজিদের দেয়াল ছাড়া তার আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। ইতিমধ্যে তৈমুর বাগদাদে তাঁর কয়েকজন আমলার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দামেস্ক হতে বাগদাদ পানে ধাবিত হন এবং সে শহরের বুকে এ বর্বর বিজেতা মানুষের মাথা দিয়ে একশ' পঁচিশটি স্তম্ভ তৈয়ার করেন।

পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে তৈমুর এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন এবং ১৪০২ সালের ২১ জুলাই আঙ্কারার ময়দানে ওসমানীয় বাহিনীকে পরাজিত করে সুলতান প্রথম বায়াজীদকে বন্দী করেন। ব্রুসা ও স্মার্না তাঁর অধিকার আসে। মামলুক রাজ্যের সৌভাগ্যক্রমে এর দুই বছর পর চীন বিজয়ের পথে তৈমুরের মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধরগণ আত্মকলহে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওসমানীয় তুর্করা আরব-সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানে। ওসমানীয় তুর্কদের আদি বাসভূমি ছিল মঙ্গোলিয়া; তারা মধ্য এশিয়ায় ইরানী কওমদের সঙ্গে বিয়ে-শাদী করে তাদের সঙ্গে মিশে পড়ে। তারপর এশিয়া মাইনরে এসে তাদের জাতি ভাই সালজুকদের ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত করে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একটি রাজ্য স্থাপন করে। ১৪৮১ সালে মিসরীয় সুলতানদের পক্ষে ওসমানীয় সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে। এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সীমান্তে উভয়েরই সামান্ত রাজা ছিল। এদের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়, তাতেই এ দুই শক্তির ভিতরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে বেড়ে চলে এবং অবশেষে ১৫১৬ সালের ২৪ জানুয়ারি আলেপ্পোর সন্নিকটে উভয় শক্তির মধ্যে রণ-দামামা বেজে ওঠে। মামলুকরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তুর্কী সৈন্যরা কামান, বন্দুক ও অন্যান্য দূর-পাল্লার অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। মামলুক বাহিনীতে বেদুঈন ও সিরীয় যোদ্ধা ছিল; তারা এসব অস্ত্র ব্যবহারকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। কিছুকাল আগ হতেই তুর্করা বারুদ ব্যবহার করে আসছিল; কিন্তু সিরীয় মিসরীয়রা বাবা আদমের আমলের বিশ্বাসই আকড়ে ধরে বসেছিল যে, যুদ্ধে ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্যই জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। ওসমানীয় সুলতান সলীম বিজয়ী বেশে আলেপ্পোতে

প্রবেশ করেন। তাঁকে মামলুক জুলুম হতে মুক্তিদাতা হিসেবে অধিবাসী অভ্যর্থনা জানায়। সিরিয়া তুর্কদের হাতে চলে যায়। সিরিয়া হতে তুর্কবাহিনী মিসরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক বছরের মধ্যে মামলুক রাজ্যের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে যায়। সুলতান সালাহ্উদ্দীনের সময় হতে কায়রো প্রাচ্য ইসলামের কেন্দ্র এবং আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল; এখন সে কায়রো সামান্য প্রাদেশিক নগরে পরিণত হয়। মক্কা ও মদীনা স্বভাতঃই ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে পড়ে। মিসরের ইমামরা জুমার নামাজের খোতবায় নিম্ন ভাষায় সুলতান সলীমের জন্য দোয়া করেন ঃ

"হে প্রভু! তুমি আমাদের সুলতানকে রক্ষা করো ঃ ইনি সুলতানের পুত্র সুলতান, উভয় মহাদেশ ও উভয় সমুদ্রের শাসক, উভয় বাহিনী উৎখাতকারী, উভয় ইরাক বিজেতা, উভয় পবিত্র শহরের খাদেম—বিজয়ী সম্রাট সলীম শাহ্। হে প্রভু! তাঁকে তোমার অমূল্য সাহায্য মঞ্জুর কর। হে দো-জাহানের মালিক! তুমি তাঁকে গৌরবময় বিজয় লাভে সাহায্য কর।"

শেষ ক্রীড়নক খলীফা সত্যিই তাঁর খিলাফত-পদ তুর্ক সুলতানের নিকট হস্তান্তর করেছিলেন কিনা, তার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। তবে তিনি সে পদ দিয়ে থাকুন আর না-ই থাকুন, এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কন্সটানটিনোপলের তুর্ক সম্রাট ধীরে ধীরে খলীফা-পদের সমস্ত সুযোগ এবং অবশেষে খলীফা উপাধি আত্মস্থ করেন। সলীমের পরবর্তী সুলতানদের কেউ কেউ নিজেদের খলীফা বলে পরিচয় দিলেও এবং অন্যরা তাঁদের এই নামে সম্বোধন করলেও, তাঁদের খলীফা শব্দের ব্যবহার কেবল সম্মানসূচক ছিল এবং তাঁদের রাজ্যের বাইরে তাঁরা খলীফা বলে স্বীকৃত হতেন না। ১৭৭৪ সালে সম্পাদিত রুশ-তুর্ক সন্ধি-পত্রই প্রথম জ্ঞাত আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় দলীল, যাতে ওসমানীয় সুলতানকে খলীফা ও মুসলিম-জগতের ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করা হয়েছে।

কন্সটানটিনোপলের সুলতান-খলীফা ইসলামের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন; কেবল বাগদাদের নয়, বাইজেন্টিয়ামের সম্রাটদেরও তিনি উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। মামলুক-শক্তির পতন এবং বসফরাসের উপর ওসমানীয়দের আধিপত্য স্থাপনের ফলে ইসলামী শক্তির কেন্দ্র পশ্চিমে স্থানান্তরিত হয়। ঠিক এই সময়ই আমেরিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার এক নবযুগের সূচনা করে। আরব খিলাফতের ইতিহাস এবং আরব সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ হতে মধ্যযুগে যে সব মুসলিম বংশের অভ্যুদয় হয়, তাদের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। আরব-জগতে ওসমানীয় আধিপত্য শুরু হয়।

বর্তমান জগতে আরব-ভূমি

মধ্যযুগে অন্ধকারের রাজত্ব ছিল বটে, তবু সে যুগে আরব-ভূমির সামনে অন্ধকারের যবনিকা টেনে রাখে নাই—কিন্তু আধুনিক যুগ তা করেছে। ১৫১৭ সাল হতে শুরু করে ওসমানীয় আধিপত্যের চারশ' বছর পর্যন্ত আরব-প্রাচ্য বরাবর রাহু-গ্রস্ত থাকে। ওসমানীয় তুর্করা মুসলিম-জগতের একটি বিপুল শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তারা কেবল আরব-ভূমিসমূহ জয় করে নাই, উপরন্তু ককেশাস হতে ভিয়েনার নগর দ্বার পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের উপর তাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছে—তাদের রাজধানী কন্সটানটিনোপল হতে তারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর আধিপত্য করেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চি ইউরোপীয় রাষ্ট্র-নায়করা তাদের সমীহ করে চলেছে। ইতিমধ্যে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল মদীনা, দামেস্ক, কায়রো বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়—অথচ একদা এগুলি পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ও মহোজ্জ্বল সংস্কৃতি কেন্দ্রস্থল ছিল। এসব এখন কন্সটানটিনোপল হতে প্রেরিত প্রাদেশিক গভর্নরদের বাসস্থান ও সৈন্যদের কেল্লা হয়ে দাঁড়ায়। দামেস্ক ও বাগদাদের দুর্জয় বাহিনী অতীতে চার চার বার এই রাজধানী আক্রমণে উদ্যত হয়। এখন হতে এই শহরের উপর সকলের নজর পড়ে।

সুলতান-খলীফাদের সাম্রাজ্যে আরবদের ছাড়া নানা জাতির, নানা ভাষার, নানা ধর্মের আরো বহু শ্রেণীর লোকের বাস ছিল; একমাত্র তলোয়ারের জোরে এদের একত্রে রাখা হত। পরাজিত জাতিসমূহের সবারই এক ভাগ্য ছিল ঃ অতিরিক্ত কর-ভার অত্যাচারমূলক শাসন। এমন অবস্থার ভিতর আরবী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে যদি কোন সৃজনশীল অবদান সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চার্যের কিছুই নাই।

আরব-প্রাচ্য বিজেতার পুত্র মহান সুলায়মান (১৫২০—১৫৬৬)-এর আমলে তুর্ক সাম্রাজ্যের মহিমার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই এর পতন শুরু হয়। পতনের যুগ দীর্ঘ ও জটিল ছিল। ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা দখল করার নিষ্ফল প্রয়াসের পর তুর্ক-শক্তিতে আক্রমণের পালা খতম হয়ে আত্মরক্ষার পালা শুরু হয়। শান্তির বদলে প্রধানতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য

সাম্রাজ্যের সংগঠন, সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তৃতি, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে হাজারো রকমারি, ধর্মীয় সংস্থাকে স্বায়ত্তশাসনের প্রচুর সুবিধা দান, মুসলিম তুর্ক আর মুসলিম আরবের মধ্যে বিভেদ, চূড়ান্ত ক্ষমতা সুলতান-খলীফার হাতে কেন্দ্রীভূতকরণ এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা—সাম্রাজ্যের সংস্থাপনায় এগুলি ছিল অন্তর্নিহিত দুবর্লতা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশীয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার মত বিভিন্ন শক্তি তুর্ক সাম্রাজ্যের নানা অংশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হানতে এবং তুরস্ক সম্বন্ধে বিশেষ নীতি অবলম্বন করতে শুরু করে। এর ফলে সাম্রাজ্যের পতনের স্রোত দ্রুততর হয়ে পড়ে। আরব-জগত এককালে পারস্য হতে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ক্রমে সে বিশাল সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে আসে। পারস্য ভাষা ও জাতীয়তা এর আগেই তার নিজস্ব আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার ঘোষণা করে। তুর্করা কন্সটানটিনোপল অধিকার (১৪৫৩) করার আগেই স্পেন কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে যায়। উত্তর আফ্রিকা, মিসর, খাস আরব এবং আরব-হেলাল—আটলান্টিক হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক অখণ্ড অঞ্চল—তাদের আরবী ভাষা ও ইসলামী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে— যেমন আজো তারা করছে। মরক্কো ছাড়া এসব দেশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের আগ পর্যন্ত তুর্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গ ছিল। একমাত্র লেবাননই বরাবর তার বাসিন্দাদের মধ্যে খৃষ্টান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রক্ষা করে এসেছে।

আরব দেশসমূহের মধ্যে আলজিরীয়াকে সর্বাগ্রে তুর্ক সাম্রাজ্য হতে খসিয়ে নেওয়া হয়। ১৮৩০ সালে এদেশ ফ্রান্স দখল করে এবং পরে একে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৮৮১ সালে তিউনিসীয়া ফ্রান্সের কবলে আসে। ১৯১২ সাল পর্যন্ত ইউরোপের তিনটি ল্যাটিন শক্তি—ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালী মরক্কো হতে লিবীয়া পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা সবার আগে আরব মুসলিম-জগত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্য প্রভাবের অধীন হয়; এ ভূভাগ মুসলিম-জগতের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত; এর বাসিন্দাদের মধ্যে অনারবের সংখ্যা প্রচুর ছিল। এই সমস্ত কারণ হেতু এ ভূভাগের বাসিন্দারা জাতীয়তা হারিয়ে স্বতন্ত্র পথে চলে। পশ্চিম এশিয়া এবং মিসরই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের হৃদয় এবং কেন্দ্রভূমি। ভূগোলের দিক দিয়ে মিসর আফ্রিকার একাংশ হলেও ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে একে পশ্চিমে এশিয়ার অঙ্গ মনে করা যেতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মিসরসহ এই বিশাল ভূখণ্ড নামে বা প্রকৃতপক্ষে তুর্ক-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৮২ সাল হতে মিসর ইংরেজদের কবলে ছিল; এই মহাযুদ্ধকালে মিসর তুরস্কের শেষ বন্ধন ছিন্ন করে।

এই সুযোগ মক্কার শরীফ হোসেনও তুর্কদের অধীনতা অস্বীকার করে বসেন। তিনি মহানবীর অন্যতম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি মক্কাকে কেন্দ্র করে নতুন খিলাফত স্থাপন করে নিজেই খলীফা পদে সমাসীন হবেন—এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে অন্যান্য আরবগণকে বিদ্রোহী হতে উৎসাহ দেন। ১৯২৪ সালে যখন মুস্তফা কামাল তুর্ক-খিলাফতের বিলোপ সাধন করেন, তখন এই 'আরব রাজাস্তু' নিজেকে 'মুসলমানদের খলীফা' ঘোষণা করেন। তুর্ক-সাম্রাজ্য হতে খসে এনে আধুনিক আরব-সাম্রাজ্য স্থাপনের এ ছিল দ্বিতীয় চেষ্টা। এর আগের শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে মিসরের রাজ-প্রতিনিধি মুহম্মদ আলী প্রথম এমনি একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ দেড়শ' বছর টিকে থাকে। দুটি চেষ্টাই উপযুক্ত সময়ের আগে করা হয়। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উপর এর বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাছাড়া, এ উভয় চেষ্টা নিকট প্রাচ্যে বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির স্বার্থের বিরোধী ছিল। শেষ পর্যন্ত শরীফ হোসেন নিজ পৈত্রিক রাজ্য হতেও ইবনে সউদ কর্তৃক বিতাড়িত হন। ইবনে সউদ নজ্‌দের রক্ষণশীল ওয়াহ্‌হাবীদের বিজ্ঞ ও সুদক্ষ নেতা ছিলেন। ১৯০০ হতে ১৯২৫ সালের মধ্যে এই সুচতুর মরু-নেতা পারস্য উপসাগর হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। মহানবীর পর আরব উপদ্বীপে এত বড় রাজ্য আর কেউ স্থাপন করতে পারে নাই। ১৯৩২ সালে 'সউদী আরব' নামে এ রাজ্যের নাম বিঘোষিত হয়। সউদী আরবের লাগ দক্ষিণে ইয়ামন অবস্থিত। ইয়ামনের ধর্মীয় শাসনকর্তা ইমাম ইয়াহীয়া প্রথম মহাযুদ্ধ কালে নিজ দেশকে তুরস্কের অধীনতা হতে মুক্ত করেন। প্রাসাদ-চক্রান্ত ও পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ফলে ইমাম ইয়াহীয়া ১৯৪৮ সালে নিহত হন। তাঁর পুত্র সায়েফুল ইসলাম এখন ইয়ামনের সুলতান। এদিকে সউদী আরবের ইবনে সউদও ইন্তিকাল করেন ও তদস্থলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইবনে সউদ উপাধি গ্রহণ করে পিতার সিংহাসনে আসীন হন। বর্তমানে এই দ্বিতীয় ইবনে সউদ এবং সায়ফুল ইসলামই সমগ্র আরবে সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসনকর্তা। উপদ্বীপের বাকী অংশ স্থানীয় শেখ ও সুলতানদের দ্বারা শাসিত হয়। এরা সবাই বৃটেনের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ। ইয়ামন এবং অনেকাংশে সউদী আরবও পাশ্চাত্য প্রভাবের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। দুনিয়া জোড়া আধুনিকতায়নের জোয়ার কি জানি কেমনে এদের উপকূল বাদ দিয়ে গেছে। বিগত সিকি শতাব্দী কালের মধ্যে সউদী আরব, কুয়ায়েত এবং বাহরায়েনে যে অপর্যাপ্ত তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যে দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে খনিজ সম্পদ কাজে লাগান হচ্ছে তাতে এই সব স্থানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে গেছে; আর সংশ্লিষ্ট দেশগুলিও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিরিয়া ও লেবাননকে ফ্রান্সের অছি রাজ্যে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ দুই দেশ ফরাসী গোলামীর জিঞ্জির ভাঙ্গতে পারে নাই। ফিলিস্তিনকে বৃটিশ অছি রাজ্যে পরিণত করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির বাধা দান সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনকে নিয়ে 'ইসরাইল' রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। ট্রান্স-জর্দান বৃটিশ অছি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৯৪৬ সালে একে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এ রাজ্যের সুলতান হন শরীফ হোসেনের ছেলে এবং আমীর ফয়সলের বড় ভাই আবদুল্লাহ্। আমীর ফয়সল কয়েক দিনের জন্য সিরিয়ার সিংহাসনে বসেন। পরে ফরাসীরা তাঁকে তাড়িয়ে দেয়; অতঃপর ১৯২১ সালে বৃটিশ-শক্তি তাঁকে নব সৃষ্ট রাষ্ট্র ইরাকের সিংহাসনে বসায়। অছি রাজ্যগুলির মধ্যে লেবাননই প্রথম নিজকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করে। ইরাক সংস্কৃতির দিক দিয়ে সিরিয়ার পেছনে থাকলেও সবার আগে অছি-রাজ্যের বন্ধন কেটে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৩০ সালে ইরাকের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ইংরেজের সঙ্গে একটা সন্ধি হয়, যেমন এর ছয় বছর পর মিসরও সন্ধি করে। এই সন্ধিসূত্রে ইংরেজকে স্বতন্ত্র সুবিধা দান করা হয়।

এসব দেশের মধ্যে মিসরই সর্বাগ্রে নব-জীবনের চাঞ্চল্য অনুভব করে। সাড়াটা আসে পশ্চিম থেকে ঃ উপলক্ষ ছিল ১৭৯৮ সালের নেপোলিয়নের আক্রমণ। ফরাসী বিজেতা ভ্যাটিকান থেকে একটা আরবী প্রেস লুণ্ঠন করেছিলেন; মিসর অভিযানকালে তিনি অন্যান্য উপকরণের মধ্যে এই প্রেসখানি সঙ্গে আনেন এবং তাঁর নিজের পণ্ডিতদের সমবায়ে ও সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-সংস্থা গঠন করেন। নীলনদের উপত্যকায় উপরোক্ত প্রেসখানিই ছিল সর্বপ্রথম মুদ্রা-যন্ত্র। ক্রমে-'বুলাগ্ ছাপাখানা' নামে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়। আজো এ প্রতিষ্ঠানটি বেঁচে আছে।

নেপোলিয়নের পরে আসেন আধুনিক মিসরের জন্মদাতা মুহম্মদ আলী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই অবিচ্ছিন্ন সাক্ষাতের মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তিনি এগিয়ে চলতে সংকল্প করেন। তিনি ইউরোপে বিভিন্ন ছাত্র মিশন পাঠান এবং তাঁর দেশের অফিসার ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ইউরোপীয়—বিশেষ করে ফরাসী মিশন দাওয়াত করে আনেন।

১৮৩১ সালে যখন মুহম্মদ আলী তাঁর আরব-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন সফল করার উদ্দেশ্যে সিরিয়া বিজয়ের জন্য অভিযান করেন, তখন তিনি ভূমধ্যসাগরের সমস্ত পূর্ব সীমান্তে পশ্চিম ইউরোপীয় সাংস্কৃতির প্রভাবের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করে

দেন। এই সময়ে প্রটেস্‌টেন্ট মিশনারীরা—প্রধানতঃ আমেরিকান—দলে দলে এসে এসব অঞ্চলে স্থায়ীভাবে কাজ শুরু করেন। লেবাননের বর্তমান রাজধানী বৈরুতে ১৮৩৪ সালে আমেরিকান প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবেক সিরিয়ায় এই-ই ছিল প্রথম উন্নত-ধরনের প্রেস। তিন বছর পর স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রটেসটেন্ট গীর্জা সংগঠিত হয়। অনেক দিন পর জেসুইট সম্প্রদায়ের খৃস্টান পাদ্রীরাও এই সময় লেবাননে ফিরে আসেন। ১৮৫৩ সালে বৈরুতে তাদের ইমপ্রিমেরী ক্যাথলিক স্থাপিত হয়। দুটি প্রেসই এখনো চালু আছে; সাজসরঞ্জামে এগুলি অতি উন্নতমানের প্রেস। আধুনিক আরবীতে বাইবেলের দুটি অনুবাদ এই ছাপাখানা দুটি হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আরবীতে বহুসংখ্যক ইংরাজী ও ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং সে সব তরজমা লোক-প্রিয় হয়ে ওঠে। আমেরিকান মিশনারীরা অবশেষে ১৮৬৬ সালে সিরীয় প্রটেস্‌টেন্ট কলেজ স্থাপন করেন; বর্তমান 'বৈরুত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়' এই কলেজেরই রূপান্তরিত পর্যায়। আট বছর পর শহরের অপর প্রান্তে 'সেন্ট জোসেফ বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এই দুটি প্রতিষ্ঠানই নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে আছে। ইতিমধ্যে—বিশেষ করে লেবাননে স্থানীয় লোকের দ্বারা অসংখ্য স্কুল, ছাপাখানা, খবরের কাগজ, মাসিক কাগজ এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমুদ্রতীরবর্তী এই পার্বত্য অঞ্চলকে সুদূর অতীতের ফিনিশীয়, রোমক ও বাইজেন্টাইন আমল হতে পাশ্চাত্য অভিমুখী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফখ্‌রুদ্দীন-আল-মা'নী (১৫৯০—১৬৩৫) এবং বশীরুল শিহাবী (১৭৮৬—১৮৪০) লেবাননের দুই কৃতী সন্তান ছিলেন। এদের অধীনে লেবানন ওসমানীয় শাসন হতে অর্ধ স্বাধীনতা লাভ করে। ইটালীয়, ফরাসী ও বৃটিশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে এই সময় লেবাননের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ঘটে। মুহম্মদ আলীর বহু আগে ফখ্‌রুদ্দীন ইউরোপীয়—বিশেষ করে ফ্রান্স ও ফ্লোরেন্সের সওদাগরগণকে লেবাননের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন এবং টাস্‌কেনী হতে কৃষি মিশন দাওয়াত করে আনেন। তিনি এবং বশীর উভয়ই তুর্ক সুলতান কর্তৃক স্বদেশ হতে নির্বাসিত হন এবং ইস্তাম্বুলে ইন্তিকাল করেন। ফখ্‌রুদ্দীনকে হত্যা করা হয়।

তুর্ক শাসকদের উস্কানীতে দ্রুজ ও ম্যারোনাইটদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ দেখা দেয় এবং সেই অজুহাতে ১৮৬০ সালে তুর্ক কর্তৃপক্ষের আদেশে এক নির্মম নরহত্যার অনুষ্ঠান হয়। তখন ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ মিলে লেবাননকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সেই নিশ্চয়তার ফলে একজন খৃস্টান গভর্নর

লেবানন শাসন করতে থাকেন। স্বায়ত্তশাসনের এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম ইউরোপ হতে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে নব নব, ভাব ও সে ভাবের প্রয়োগ-জ্ঞান দেশে আসতে শুরু হয়। পার্বত্যাঞ্চলের বাসিন্দারা বেশীর ভাগই খৃস্টান থাকায় তারা নতুন ভাবধারা গ্রহণে অধিকতর উৎসুক ছিল। তাদের পূর্বপুরুষদের মত তাদের সন্তানেরা অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সভ্য জগতের বিভিন্ন অংশে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিল আমেরিকা। লেবানন ও সিরিয়ার এই ঔপনিবেশিকেরা আমেরিকা হতে তাদের পুরোনো বাসভূমিতে নব ভাব প্রেরণের জন্য নতুন পথ সৃষ্টি করে। সুতরাং, অল্পকালের মধ্যেই আধুনিকায়ন ও ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যবস্থার রূপায়ণের ব্যাপারে লেবানন তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের এই অভিঘাত আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাপার। পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে তার স্থলে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—আর সেই দ্রুত ক্রম-বিকাশেরই অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নতুন জীবন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য আজও অনেক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য জগত হতে যে সব নতুন ভাবধারা প্রাচ্যে আমদানী হয়, তার মধ্যে জাতীয়তা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। জাতীয়তার আদর্শকে বরণ করে নেওয়ার ফলেই শুরু হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ফলে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র অনেকাংশে ছিন্ন হয়ে যায়।

আরব জাতীয়তার জাগরণের আরম্ভ ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানাত্মক আন্দোলন হিসেবে। যাঁরা এ জাগরণের অগ্রদূত, তাঁরা বেশীরভাগই ছিলেন সিরিয়ার বুদ্ধিজীবী—বিশেষ করে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লেবানীজ খৃস্টান। এরা মিসরে বসে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। এ আন্দোলনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ছিল প্রাচীন আরবী সাহিত্যের চর্চা এবং ইসলামী ইতিহাসের গবেষণা। আরব সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব-মহিমা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরব জাতির অতীত কীর্তি ও অবদান—এসবের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে শিক্ষিত মহলের চিত্তে এক গর্বিত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। পিছনের দিকে চেয়ে তারা সামনের দিকে চাইতে শিখে। জ্ঞানাত্মক জাগরণের পরেই আসে রাজনৈতিক জাগরণ এবং একটা পুনর্জীবিত ও পুনর্মিলিত আরব-সমাজের জন্য উদগ্র আকাঙ্খা বহুজনের বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অবসাদের স্থানে রাজনৈতিক কর্ম-চাঞ্চল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ আরব জাতীয়তার ভিত্তি-ভূমি ব্যাপক। এর মূলনীতি এই যে, ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত আরব ভাষাভাষী জাতি এক ঃ তারা এক ভাষা এবং এক সাধারণ সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। এ প্রচেষ্টা এগিয়ে চলে প্যান-ইসলামের পথে নয়—প্যান-আরবত্বের পথে। এ আন্দোলনের অগ্রগমনের পথে জটিল স্থানীয় সমস্যা এসে সামনে দাঁড়ায়; ফলে আন্দোলন মূল পথ হতে সরে আসে। মিসরে এ আন্দোলনের পথে প্রথম বিরাট বাধারূপে এসে উপস্থিত হয়, ১৮৮২ সালে 'ইংরেজের মিসর অধিকার।' অতঃপর বৃটিশ শাসনের বিরোধিতাতেই মিসরের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। এই সময় হতেই মিসরীয় জাতীয়তাবাদ প্যান-আরবত্ব হতে ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে। মিসরীয় আন্দোলনে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগে মিসরবাসী এই প্রথম উপলব্ধি করে যে, সে মিসরীয়। "মিসর মিসরীয়দের জন্য" —এই হয়ে দাঁড়ায় সংগ্রাম-ধ্বনি।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে আরব-জগত আরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আরব জাতীয়তাবাদও আরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সিরিয়াতে এর শক্তি প্রথম নিয়োজিত হয় তুর্কীকরণ নীতির বিরুদ্ধে; সিরিয়ার ঘাড়ে ফরাসী অছি শাসন চাপিয়ে দেওয়া পর এ-শক্তি নিয়োজিত হয় ফরাসী-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এইরূপে ফিলিস্তিনে স্থানীয় জাতীয়তার শক্তি প্রথম প্রযুক্ত হয় বৃটিশ অছিগিরির বিরুদ্ধে; তারপর প্রযুক্ত হয় ইসরাইলের বিরুদ্ধে। লেবানন প্রথমে অছি-শাসনের পক্ষে ছিল; পরে এর তীব্র বিরোধিতা করে পূর্ণ আজাদী অর্জন করে। লেবানন ও সিরিয়ার বুক হতে অছিবাদের শাসনের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলা হয় ১৯৪৩ ও ১৯৪৫-এর মধ্যে। আরব অর্ধচন্দ্রের পূর্ব শৃঙ্গে ১৯২০ সালের দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিতার বিরুদ্ধে এক ইরাকী জাতীয়তা গড়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ট্রান্সজর্দান ইতিপূর্বে কোন কালেই স্বাধীন ছিল না; ইংরেজরা এ জনপদকে ১৯২১ সালে সিরিয়া হতে ছিন্ন করে এনে আমীর আবদুল্লহর অধীন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিণত করে।

এইরূপে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরব-অঞ্চলসমূহ দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ইহুদীবাদের অভ্যুদয় এই বিচ্ছিন্ন অংশসমূহকে আবার একত্র হওয়ায় সাহায্য করে। ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদের প্রতিষ্ঠাকে আরবরা সর্বত্রই অন্যায় অনুপ্রবেশ মনে করে আসছে। সাধারণ স্বার্থের তাগিদ এবং ক্রমবর্ধমান সংহতি-বোধ চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে আরব-লীগের সংগঠনে। ১৯৪৫ সালে কায়রোতে এই ঐক্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আরব-লীগের বর্তমান সদস্য সংখ্যা

দশ; মিসর, ইরাক, সউদী আরব, ইয়ামন, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান, লিবীয়া, মরক্কো এবং সুদান। শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়ে এ মধ্যে *ইরাক, জর্দান এবং লিবীয়া নির্বাচনভিত্তিক পার্লামেন্ট সহ নিয়মানুগ রাজতন্ত্র; মিসর, সিরিয়া এবং লেবানন রিপাব্লিক। এ সমস্ত রাষ্ট্রই এখন জাতিসংঘের সদস্য এবং বেশীর ভাগেরই লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে কূটনৈতিক প্রতিনিধি আছে।

তৃতীয় একেশ্বরবাদমূলক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে পূর্ববর্তী ধর্ম দুটির অবদান ভাগী, প্রতীচ্যের সঙ্গে গ্রীকো-রোমান ঐতিহ্যের অংশীদার, সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী মুক্ত-জ্ঞানের মশালধারী, ইউরোপীয় রেনেসাঁর মহানুভব দাতা—আরবী-ভাষী জাতিরা এসবই ছিল। মাঝখানে তারা পেছনে পড়ে গিয়েছিল। এবার তারা জগতের অগ্রগমন-রত গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের মধ্যে স্থান গ্রহণ করেছে। আমরা আশান্বিত হৃদয়ে ভাবছি ঃ আবার তাদের অবদানে বিশ্বের প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ সুগমতর হয়ে উঠেবে।

---

* সম্প্রতি (১৪ জুলাই, ১৯৫৮) এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে ইরাকের বাদশাহ্ ফয়সল নিহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সামরিক-বিপ্লবের নায়ক ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাসেম ইরাকের সর্বাধিনায়ক।

পরিশিষ্ট

স্যার ফিলিপ কে. হিট্টির জগদ্বিখ্যাত বই 'The History of the Arabs.' এটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের কাছে আরব জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে এর মূল্য অপরিসীম। পঞ্চাশের দশকে হিট্টির এই বৃহৎ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত (abridged) সংস্করণ প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক থেকে। ইবরাহীম খাঁ সেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটির বাংলা অনুবাদ করেন। আরব জাতির ইতিহাস শিরোনামে তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে। ঢাকস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকশন্সের সহযোগিতায় ইসলামিক একাডেমীর পক্ষে মুহিউদ্দীন খান, আশ্বিনপুর, নায়েব গাঁ ত্রিপুরা (ঢাকা অফিস ১৫, কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা) হতে প্রকাশিত এবং মুহম্মদ হোসেন, দি স্টার প্রেস, ২১/১ শেখ সাহেব বাজার লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ + ২১৫। মূল্য চার টাকা।

হিট্টির ইতিহাস অনেকটা কাব্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষায় লিখিত। ইবরাহীম খাঁ অনুবাদে সে মেজাজ অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার এদেশীয় স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান পাঠকের বোধগম্যকরণের দিকেও ছিল তাঁর সচেতন দৃষ্টি। ফলে এটি একটি অনবদ্য অনুবাদে পরিণত হয়।

জীবনপঞ্জি

নাম : ইবরাহীম খাঁ। ডাকনাম খাজা বা খাজা মিয়া। খাজা ছদ্মনামে তাঁর বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ নামেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

জন্ম : ১৮৯৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে 'এক বৃহস্পতিবার বার বেলা'য় বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর থানার অন্তর্গত বিরামদী (বর্তমানে শাবাজনগর) গ্রামে ইবরাহীম খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। পিংনা হাইস্কুলের ভর্তি রেজিস্ট্রারে তাঁর জন্ম তারিখ দেখানো হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫।

বংশ : টাঙ্গাইল শহরের মাইল সাতেক পূর্ব-দক্ষিণে বাসাইল গ্রামে পাঠান বংশের কয়েক গোষ্ঠী খাঁ পরিবার বাস করতেন। এঁরা ইবরাহীম খাঁর পূর্বপুরুষ। তাঁর ছ পুরুষ আগে এ বংশের দুভাই বিরামদীর পাশে ফশলান্দী গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। ইবরাহীম খাঁর পিতা শাবাজ খাঁ থেকে বিরামদী গ্রামে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত। মাতা রতন খানম। ছয় ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ– (১) আবদুল করীম খাঁ, (২) শাহে বানু, (৩) আবদুস সোবহান খাঁ, (৪) কাজিম উদ্দীন খাঁ, (৫) এবাদত আলী খাঁ, (৬) ইবরাহীম খাঁ ও (৭) লুৎফর রহমান খাঁ।

শিক্ষা : বাড়িতে বড় ভাইয়ের কাছে বাংলা, মুনশির কাছে আরবি পড়ায় ইবরাহীম খাঁর হাতেখড়ি। ফশলান্দীর পাঠশালা থেকে নিম্ন প্রাইমারী এবং লোকের পাড়া পাঠশালা থেকে উচ্চ প্রাইমারি পাস। ১৯০৬ সালে হেমনগর হাইস্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাসের পর ১৯০৭ সালে পিংনা হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ঐ স্কুল হতে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন ১৯১২ সালে। তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ হতে ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৬ সালে কলিকাতার সেন্ট পলস্ কলেজ হতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। ১৯১৭ সালে আইনের প্রিলিমিনারী, ১৯১৮ সালে ল-ইন্টার, ১৯১৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে প্রাইভেট এম. এ. এবং ১৯২৩ সালে আইন পাস করেন।

সংসার : ১৯১৭ সালের ১ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের বড় বাশালিয়া গ্রামের রঈছ মমতাজউদ্দীন খাঁ ওরফে নয়ামিয়ার কনিষ্ঠা কন্যা আনজুমান নেছার সঙ্গে ইবরাহীম খাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের প্রথম সন্তান শামসুজ্জামান খাঁ তুলামিয়া আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র মরহুম আসাদুজ্জামান খাঁ সুজা মিয়া বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ-এর শ্বশুর। একমাত্র কন্যা বেগম খালেদা হাবিব সমাজসেবী এবং শিক্ষাবিদ। কাকলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তৃতীয় পুত্র আমিনুজ্জামান খাঁ (আমিন) ভূয়াপুর থানা (উপজেলা) পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন, বর্তমানে বিলেতে বসবাসরত। ১৯৭৬ সালের ১১ নভেম্বর ইবরাহীম খাঁর স্ত্রী মারা যান।

কর্ম : ১৯১৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইবরাহীম খাঁ করটিয়া হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষকতা ত্যাগ করে তিনি ময়মনসিংহ শহরে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২৫ সাল অবধি ওকালতি ব্যবসায় থাকার পর ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি পুনরায় হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকপদে যোগ দেন এবং আটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চাঁদ মিয়ার সৌজন্যে সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রিন্সিপাল হন এবং একটানা ২২ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসাম ও অবিভক্ত বাংলায় সা'দত কলেজ মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ এবং ইবরাহীম খাঁ ছিলেন প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল। ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর সরকারের আমন্ত্রণে তিনি পূর্ববাংলা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ সালের ১৪ জুলাই অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে ভূয়াপুর কলেজ (বর্তমানে ইবরাহীম খাঁ মহাবিদ্যালয়) এবং পরবর্তীকালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সহযোগিতায় বাংলা কলেজ (বর্তমানে ঢাকায় মীরপুরস্থ সরকারি বাংলা কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ; সাধারণ সম্পাদক ইবরাহীম খাঁ এবং অধ্যক্ষ প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতিরি সভাপতি ছিলেন ইবরাহীম খাঁ। তিনি ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায়, পাকিস্তান গণপরিষদে এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে তিনি দলীয় রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে এবং বাংলা একাডেমীর প্রথম দুই কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত সদস্য

ছিলেন। তিনি আন্তপার্লামেন্টারী মত বিনিময় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ও চীন সফর করেন। তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পুরস্কার ও সম্বর্ধনা : ১৯৩৮ সালে ইবরাহীম খাঁ 'খানবাহাদুর' উপাধি পান, পরাধীন দেশে এই খেতাব তিনি গ্রহণ করেন নি এবং ১৯৪৩ সালে তা বর্জন করেন। ১৯৪৪ সালের ১৯ মার্চ পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সংসদ তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা প্রদান করে। নাট্যসাহিত্যে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৩ সালেই তিনি সরকারি খেতাব 'তমঘায়ে কায়েদে আজম' লাভ করেন এবং ১৯৭১ সালে দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তা বর্জন করেন। ১৯৭৫ সালের ৩১ মে বাংলা একাডেমীতে বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের আয়োজনে জাতীয় সম্বর্ধনা লাভ করেন তিনি। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'একুশে পদক' প্রদান করেন। কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিশ তাঁর গণসম্বর্ধনার আয়োজন করে ১৯৭৭ -এর ১৫ মে।

মৃত্যু : ২৯ মার্চ, ১৯৭৮ সকাল সাড়ে দশটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ। পরদিন ভূয়াপুর কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।